# আত্মজীবনী ও স্মৃতি-তর্পণ

জলধর সেন

সম্পাদনা : ড. বারিদবরণ ঘোষ

জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-১৯

প্রথম জিজ্ঞাসা এ. লি.
মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
প্রকাশন বিভাগ
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯
১৭১।১।১বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০১৯

মুদ্রক
চণ্ডীচরণ পাইন
সত্য প্রেস
১০/২এ, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রদ্ধাস্পদেষু

# আত্মজীবনী ও স্মৃতি-তর্পণ

১২৬৬ সালের ১লা চৈত্র, (ইং ১৩ই মার্চ ১৮৬০) মঙ্গলবার আমার জন্মদিন। আমি পিতামাতার প্রথম পুত্র, প্রথম সন্তান নই। আমার পূর্বে দুটী ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড়দিদি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর পরের মেয়েটি ছ-মাসের হয়ে মারা যায়। তার পরেই আমার জন্ম। আমার কথা বলবার আগে আমার বংশ পরিচয় একটু দি।

আমাদের বাড়ী নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে। আমি যখন জন্মাই, তখন আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল না, পাবনা জেলায় ছিল। আমার বয়স যখন আট কি নয় বৎসর, তখন নূতন ক'রে জেলা গঠন হয়, সেই থেকে আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলাভুক্ত হয়। আমার বেশ মনে আছে—আমার মেজদাদা পাবনায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। আর তার কিছুদিন পরে আমার বড়দাদা কৃষ্ণনগরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন।

আমার পিতামহের নাম ৺গদাধর সেন। আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। আমার প্রপিতামহ কুমারখালির ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম-কুঠীর দেওয়ানীর কাজ পেয়ে কুমারখালিতে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হয়ে পড়েন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ-পরগণার বারাসতের নিকট দেগঙ্গ গ্রামে। তাই আমরা এখনও পরিচয় দি, আমরা দেগঙ্গের সেন, আমরা অনন্তের সন্তান। দেগঙ্গে বা অন্য কোন স্থানে আমাদের জ্ঞাতি কেহ আছেন কি না, তা' আমি মোটেই জানতাম না। অল্পদিন হ'ল কথা-প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে, প্রসিদ্ধ শিল্পী আমার সোদরোপম শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার সেন আমাদেরই জ্ঞাতি। এমন জ্ঞাতি হয়ত অনেক স্থলে আরও আছেন, সে খোঁজ আমি রাখিনি।

আমার পিতামহের দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রামতনু সেন, তিনি আমার জেঠামহাশয়। আর কনিষ্ঠ পুত্র হলধর সেন, তিনিই আমার পিতৃদেব। আমার পিতামহ তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে যথাসর্বস্ব ব্যয় ক'রে সত্য সত্যই একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন। আমার জেঠামহাশয়ের কাছে শুনেছি, সেই শ্রাদ্ধের নাম দ্বিজদম্পতি শ্রাদ্ধ। তাতে বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি ত করতেই হয়েছিল, তা' ছাড়া এক ব্রাহ্মণকুমার ও এক ব্রাহ্মণকুমারী এনে বিবাহ দিয়ে, ভূসম্পত্তি দান ক'রে তাদের সংসারে প্রতিষ্ঠা ক'রে দিতে হয়েছিল। এই শ্রাদ্ধেই আমার পিতামহ একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়েন। তাঁর যা'

কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, সমস্তই তিনি এই শ্রাদ্ধে ব্যয় ক'রে ফেলেছিলেন। সেই থেকেই আমাদের এই দারিদ্র্যের সূত্রপাত।

পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় না দেখে, আমার জেঠামহাশয় রাজসাহী জেলার গালিমপুরের ওয়াটসন কোম্পানীর রেশমের কি নীলের কুঠীর গোমস্তাগিরি চাকুরী নিয়ে চলে যান। সেই চাকুরী তিনি অনেকদিন করেছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গালিমপুর থেকে ফিরে এসে, আর তিনি চাকুরীতে যান নি।

আমার পিতা সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখে এবং হিসাবকিতাবে দুরস্ত হয়ে, আমাদেরই গ্রামের রামমোহন প্রামাণিকের কাপড়ের দোকানে সামান্য চাকুরীতে প্রবেশ করেন। প্রথম প্রথম তাঁর কাজ ছিল, দোকানে যারা কাপড় কিনতে আসত, তাদের তামাক সেজে দেওয়া আর দোকানে গোমস্তার ফরমায়েস মত তাকের উপর থেকে কাপড় নামিয়ে দেওয়া। তখন তিনি মাসে বেতন পেতেন দেড় টাকা, আর প্রত্যহ এক পয়সার জলখাবার। সকালে উঠে' হাত-মুখ ধুয়ে তিনি দোকানে যেতেন, ১১৷৷০—১২টায় বাড়ী ফিরতেন, তারপর আহারাদি শেষ করে' দুটার সময়ে দোকানে যেতেন, ফিরতে রাত্রি ৮৷৯টা বেজে যেত। কখন কখনও ১০টা হ'ত। পূজার সময়ে বেচাকেনার ধূম পড়ে' গেলে, সারা রাত্রি দোকানে থাকতে হ'ত।

এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর দেশে বিলাতী কাপড়ের আমদানী সুরু হ'ল। এর পূর্বে আমাদের দেশের কাপড়ের দোকানগুলিতে মোটেই বিলাতী কাপড় বিক্রী হ'ত না। বাবা যে দোকানে কাজ করতেন, সেই দোকানের মালিক রামমোহন প্রামাণিক মহাশয় যখন শুনতে পেলেন যে, কলকাতার বাজারে বিলাতী কাপড় আমদানী হচ্ছে, তা' সস্তা, তখন তিনি বিলাতী কাপড় আমদানী করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু সে সময় রেল হয় নি, আমাদের দেশ থেকে কলকাতায় যেতে হ'লে নৌকায় যেতে হয়, আর সেও একদিন দু'দিনের পথ নয়। আমাদের গ্রাম থেকে কলকাতায় পৌছতে গেলে তখন ১৪৷১৫ দিন সময় লাগত, আর পথেও নানা বিপদের সম্ভাবনা ছিল। শুধু সম্ভাবনা কেন, অতি কম নৌকাযাত্রীই চোরডাকাতের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ ক'রে যেতে পারতেন। রাণাঘাটের বিশ্বনাথবাবু প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল। তার দলের ডাকনাম ছিল বিশে ডাকাতের দল। বিশে বাগ্দীর দক্ষিণহস্ত ছিল বদ্যিনাথ। তাদের এমন দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল যে, রাণাঘাটের চুর্ণীনদীর

ভিতর দিয়ে যেতে অনেকেরই সর্বনাশ হয়েছে। এই ভয়ে তখন কার দিনে আমাদের গ্রাম থেকে কলকাতায় যেতে কেউ বড় একটা সাহস করতেন না।

তখন আমাদের গাঁয়ের লোক মোটেই কলকাতায় ছিল না, এমন নয়। তারও একটু ইতিহাস আছে। আমাদের গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং অন্যান্য জাত অনেক থাকলেও, সংখ্যায় বেশী ছিল এবং এখনও আছে তিলিজাতি। এঁদের সবায়েরই ধান-চালের কারবার ছিল—এখন যদিও অনেকে জমিদার হয়েছেন, বড় বড় চাকুরে হয়েছেন, ডাক্তার হয়েছেন। আগে কিন্তু আমাদের গাঁয়ের এই জাতের কেউ অপরের চাকুরী করত না। যাকে নিতান্তই চাকুরী করতে হ'ত, সে স্বজাতীয় কারও আড়তে বা মোকামে চাকুরী করত। এই তিলি মহাশয়দের ধানচালের মোকাম ছিল রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায়। এসব জেলায় যে চাল হ'ত এবং এখনও হয়, তার নাম মুগীচাল। কলকাতার হাটখোলা, কুমারটুলীতে এই মুগীচালের অনেক আড়ত ছিল। যাঁরা ধনী মহাজন, তাঁরা কখনও কলকাতায় আসতেন না। চোর-ডাকাত এবং পথের কষ্টের জন্য তাঁরা কর্মচারীদের উপরই কলকাতার আড়তের ভার দিয়ে রাখতেন। কলকাতার এই সব আড়তে আসল ধনীর নাম প্রচারই হ'ত না। যিনি প্রধান কর্মচারী বা গদীয়ান থাকতেন, তারই নাম চলত, তাঁদেরই মান-সম্ভ্রম-পশার প্রতিপত্তি হ'ত। আমাদের গ্রামের যে কযটা আড়ত সে সময়ে কলকাতায় ছিল, সেগুলির গদীয়ান আমাদেরই গ্রামেরই লোক ছিলেন। তাঁরা গোড়ায় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানের মোকামে কাজ করে' প্রবাসী হতে অভ্যস্ত হয়ে, তবে কলকাতায় আসতেন। তাঁরা প্রায়ই ২।৪।৫ বছর অন্তর দেশে আসতেন।

আমার পিতার মনিব রামমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের মাথায় যখন বিলাতী কাপড়ের ব্যবসার খেয়াল ঢুকল, তখন তিনি প্রথমে মনে করেছিলেন, কলকাতায় যে সব গদীয়ান আছেন, তাঁদেরই মারফতে কাপড় আনাবেন। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলেন যে, তা' হলে ব্যবসার সুবিধা হবে না। কারণ এ সকল গদীয়ানের একটা অখ্যাতি ছিল। তাঁরা মনিবের লাভ যে দেখাতেন না তা' নয়, কিন্তু নিজের লাভ ষোল আনা দেখতেন। তাই অনেকেই ৫।৭ বছর গদীয়ানী করে' ২০।২৫ হাজারের মালিক হয়ে বসতেন। কি করে' যে এ ব্যাপার হত, তা' খুলে না লেখাই ভাল। রামমোহন প্রামাণিক মহাশয় পাকা ব্যবসাদার ছিলেন। তিনি শেষে স্থির করলেন যে, নিজেদের লোক

পাঠিয়ে, তাকে কলকাতায় রেখে বিলাতী কাপড়ের কারবার আরম্ভ করবেন। কিন্তু এই বিপদসঙ্কুল পথে জীবন হাতে করে' কলকাতায় আসতে কেউ রাজি হয় না। আমার বাবা পাঠশালায় লেখাপড়া শিখলেও, কায়েতের ছেলে ত বটে; শরীরেও তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল, বিপদ্-আপদও তিনি বড় একটা গ্রাহ্য করতেন না। তিনি তাঁর মনিবকে বললেন, "আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি কলকাতায় যেতে রাজি আছি।" প্রামাণিক মহাশয় প্রথম একটু ইতস্তত: করেছিলেন; কায়েতের ছেলে ব্যবসা বোঝে না, তারা কেরাণীগিরি, গোমস্তাগিরির উপযুক্ত, জমাখরচই তারা লিখতে পারে। তাই আমার বাবাকে পাঠাতে প্রথমত: ইতস্তত: বোধ হয়েছিল। শেষে আর লোক না পেয়ে তিনি বাবাকেই কলকাতা পাঠান স্থির করলেন। বেতন স্থির হ'ল ১০১ টাকা বছরে। তা' ছাড়া যাতায়াতের খরচ পাবেন, আর কলকাতায় যা বাসাখরচ লাগবে, তা' সরকার থেকে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন আমার জেঠাইমার মুখে শুনেছি, আমাদের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে' গেল। বাড়ীর কর্তা জেঠামহাশয় তখন বিদেশে—গালিমপুরে। বাড়ীতে বাবার ওপর কথা বলার লোক কেউ ছিল না। আমার মা, জেঠাইমা বা পিসীমা, এঁদের কারও এমন সাহস ছিল না যে বাবাকে নিষেধ করেন। কাজেই বাবা যা' স্থির করলেন, তাই হ'ল। শুনেছি, বাবার কলকাতা যাত্রার দিন স্থির হ'লে, তার পূর্বের ক'দিন তিনি আর বাড়ীতে খেতে পান নি। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে বিদায়ভোজ খেয়ে বেড়াতে হয়েছিল। তারপর তাঁর যাত্রার দিন যেদিন উপস্থিত হ'ল, সেদিন সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে তিনি কলকাতায় যাত্রা করলেন।

বাবার ভ্রমণকাহিনী পারি ত আর এক সময়ে সুবিধা মত ব'ল্ব। এখন আমাদের বাড়ীর আর সকলের পরিচয় দি। আমার বাবার এক ভগিনী ছিলেন, তাঁর বিবাহ হয়েছিল যশোর জেলার বহির্গাছি। তিনি দুটী ছেলে নিয়ে যখন বিধবা হলেন, তখন আমার জেঠামহাশয় তাঁকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপরে পিসীমা আর কখনও শ্বশুরবাড়ী যান নি, জীবনান্ত পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে বাস করেছিলেন। তাঁর দুটী ছেলের নাম বঙ্কুবিহারী ব্রহ্ম ও রাসবিহারী ব্রহ্ম। তাঁরাই আমাদের বড় দুই ভাই। তারপরে আমার জেঠামহাশয়ের দুই ছেলে আর এক মেয়ে। মেয়েটি সর্ব-জ্যেষ্ঠা ছিলেন, তিনি আমাদের বড়দিদি, তাঁর নাম ছিল মুক্তাসুন্দরী। তিনি আমার মায়েরও বড়। জেঠ্‌তুত ভাই দুটির নাম দ্বারকানাথ সেন ও কৃষ্ণনাথ সেন। পিসতুত ভায়েরা আমাদের একান্নভুক্ত হলেও এবং সকলের বড় হলেও, দ্বারকানাথই আমাদের বড়দাদা, আর কৃষ্ণনাথই আমাদের মেজদাদা। কাজেই আমি বাড়ীর সেজবাবু। আমার ছোট আর একটি ভাই ছিল, তাঁর নাম শশধর সেন।

এই ছয় ভাই নিয়ে আমাদের সংসার। আমারও একটি বড়দিদি ছিলেন, তাঁর নাম সুসারসুন্দরী।

এইবার আমার কথা সুরু করি। যেদিন আমার জন্ম হয়, শুনেছি, সেদিন ঘটনাক্রমে বাবা ও জেঠামশায় দুজনেই বাড়ীতে ছিলেন। বাবার তখন খুব প্রসারপ্রতিপত্তি। পূর্বেই বলেছি, ১৮৲ টাকা বার্ষিক বেতনে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপার্জন খুব হ'ত; শুনেছি, নানা রকমে তিনি বছরে ২।৩ হাজার টাকা রোজগার করতেন। নানা রকমটা গোপনের কিছুই প্রয়োজন নেই। সে সময়ে আর সকলে যেমন ক'রে উপার্জন করতেন, তিনিও তাই করেছিলেন, সদুপায় অসদুপায়ের কোন বিচার করেননি। তবে সে সময়ে আমাদের গ্রামে ধার্মিক ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। কারণ, পূজাপার্বণ, ঠাকুর-বাড়ীতে দানধ্যান এসব তিনি খুব করতেন। আমাদের গ্রামে সর্বপ্রধান বিগ্রহ মদনমোহন দেব। রথযাত্রা ও গোষ্ঠবিহারের সময়ে মদনমোহন যখন তাঁর মন্দির ছেড়ে একটু দূরে রথে উঠতে যেতেন, তখন আমাদের বাড়ীতে তাঁকে বিশ্রাম করতে হ'ত এবং সে উপলক্ষে পূজা, অর্চনা, ব্রাহ্মণভোজন, বৈষ্ণবভোজন এসবই মহাসমারোহে হ'ত। সুতরাং বাবার উপার্জনের কথা কেউ ভাবতেন না, তিনি পরম ধার্মিক বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আরও একটা কথা গোপন ক'রে কোন লাভ নেই। কলকাতায় তিনি চাকুরী করতেন, এক বা দেড় বছর অন্তর বাড়ীতে আসতেন, উপায়ও কম করতেন না। সুতরাং সেখানে তাঁর একজন সেবাদাসী ছিল, তাতে তাঁর অনেক খরচা হ'ত। আমি শুনেছি এবং স্বচক্ষেও দেখেছি, এই রকম সেবাদাসী বা সাধুভাষায় উপপত্নী সে সময়ে অবস্থাপন্ন লোকের যেন একটা গৌরবেরই বিষয় ছিল। কেউ তাতে লজ্জাবোধ করতেন না। সমাজেও তা' নিয়ে কোন কলঙ্ক-রটনা হ'ত না। যাক্ সে কথা।

আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করলুম, সেদিন বাবা আর জেঠামহাশয় দুই হাতে পয়সা খরচ করেছিলেন, কাঙ্গালীও যথেষ্ট বিদায় করেছিলেন। ছেলে ভবিষ্যতে কাঙ্গাল হবে, এই কথা ভেবেই বোধ হয় তাঁদের সেদিন দুঃখী কাঙ্গালীর খবর নিতে ইচ্ছে হয়েছিল। তবে শুনেছি, এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন আমার ভবিষ্যতের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, জীবন-পথের একমাত্র পথপ্রদর্শক, পরলোকগত সাধকপ্রবর হরিনাথ মজুমদার, যিনি এখন বাঙ্গালীর নিকট কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত। আরও শুনেছি, সাধক হরিনাথ বাড়ীর সকলকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, এ ছেলে যেদিন আঁতুড় থেকে বেরুবে, সেদিন কেউ একে আগে কোলে করতে পারবে না, আমি কোলে করব। তাঁর সে আদেশ কেউ অমান্য করে নি, আঁতুড় থেকে বেরিয়েই প্রথম আমি তাঁরই কোলে স্থান পেয়েছিলুম। আর, সেই দিনই যখন আমাদের গৃহবিপ্র মধুসূদন আচার্য আমার এক প্রকাণ্ডকায় কোষ্ঠী প্রস্তুত ক'রে এনে কাঙ্গাল হরিনাথকে বললেন—কাকা, আমার এ দাদা-

ভায়ের রাশিনাম যোগেন্দ্রনাথ কোরো, এর ডাক-নাম তুমি এখন ঠিক কর। তিনি তখনই না ভেবে চিন্তে বলে' বস্‌লেন—হলধর কাকার ছেলের নাম আবার কি হবে, জলধর হবে। বুঝেছ ভাই নরেন, এ নামটা যে কাঙ্গাল হরিনাথ সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' থেকে ধার করেন নি, তার প্রমাণ এই যে, তখনও দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটক প্রকাশিত হয় নি। নামের মিল রাখতে গিয়ে তিনি হলধরের পুত্রকে জলধর নাম দিয়েছিলেন এবং তারপর আমার ছোট ভাই জন্মগ্রহণ করলে, তারও নামকরণ কাঙ্গালই করেছিলেন শশধর। তারপর তখনই আমার কোষ্ঠীর ডাকনামের যে জায়গাটা মধুসূদন আচার্য মহাশয় ফাঁক রেখেছিলেন, আমাদের বাড়ীতে বসেই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হ'ল, আমার এই নিরাকার নাম দিয়ে এবং আমার কোষ্ঠীপত্রেও দেখেছি, সে নামটা কাঙ্গাল হরিনাথেরই স্বহস্ত-লিখিত। কোষ্ঠীখানি হারিয়ে গিয়েছে, নইলে আমার পরমারাধ্য কাঙ্গালের হাতের লেখাটা ঠিক ঠিক ছাপিয়ে দিতাম। এইখানেই আমার রাশিচক্রটা তুলে দি, তার থেকে সকলে আমার অদৃষ্ট বিচার করুন।

| | | |
|---|---|---|
| প্র ১২°<br>বৃ ২৩° | শু ১০° | র ৭½°<br>বু ২০°<br>ব ৪½° |
| কে ১৭°<br>শ ২৮½° | | রা ১৭° |
| | লং | ম ৪½°<br>চ ২২½° |

১৭৮১।১১।০।১০।২৩

১লা চৈত্র মঙ্গলবার ১২৬৬ রাত্রি ১০টা ২২ মিঃ। ইং ১৩ই মার্চ্চ ১৮৬০।

দেখ শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ, যে ভাবে বলতে আরম্ভ করেছি, এমন ক'রে বল্‌লে জীবনের বাকী কয়টা দিনেও আমার বাকী কথা শেষ হবে না। তার বদলে ছেলেবেলার কথাটা একটু ডিঙ্গিয়ে চলা যাক।

আমার বয়স যখন তিন বছর, আমার ছোট ভাই শশধরের বয়স যখন ছ' মাস, সেই সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন শিয়ালদহ থেকে পূর্ববঙ্গ রেলপথ কুষ্টিয়া অবধি খুলেছিল। এই রেলপথ কবে খোলে, তার সন-তারিখ আমার মনে নেই। এই রেলপথ খুলতে বাবা একবার বাড়ীতে এসে, আমার পিস্‌তুতো বড় ভাই বঙ্কুবিহারী ব্রহ্মকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এক চাউলের মহাজনের আড়তে চাকরি ক'রে দেন। নির্বান্ধব স্থানে অন্ততঃ ভাগ্নেটা কাছে থাকে, এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। আমার পিসীমার ছোট ছেলে রাসবিহারী ব্রহ্মও তখন আমাদেরই গ্রামে এক মহাজনের চাকরিতে নিযুক্ত হন। আমার বড়দাদা, অর্থাৎ আমার জেঠতুতো ভাই শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন তখন আমাদের গ্রামে ইংরাজী স্কুলে পড়েন, আর তাঁর ছোট ভাই কৃষ্ণনাথ সেন বাঙ্গলা স্কুলে পড়েন। জেঠা-মশায় তখন রাজসাহী জেলার গাসিমপুরে চাকুরী করেন। এই সময়ে একদিন কোন সংবাদ না দিয়ে আমার পিসতুতো ভাই বাবাকে বাড়ী নিয়ে এলেন। কলকাতায় বাবার জ্বর হয়ে গায়ে দুটো একটা বসন্ত বেরুতেই আমার পিসতুতো ভাই বুদ্ধি খাটিয়ে কাপড়-চোপড় ঢাকা দিয়ে, জ্বর হয়েছে বলে তাঁকে রেলে কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকে নৌকা ক'রে আমাদের বাড়ীর ঘাটে এসে পৌঁছান। নদী থেকে আমাদের বাড়ী দূর ছিল না। কিন্তু বসন্তরোগী ব'লে বেহারারা ভাড়া নিতে চাইল না। শেষে কোনরকম ক'রে খাটে শুইয়ে তাঁকে বাড়ীতে আনা হ'ল। বাড়ীতে এসে তিনি এগারদিন বেঁচে ছিলেন। আমার বড়দিদি অর্থাৎ আমার জাঠতুতো বড় ভগ্নী দিন-রাত তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতেন। আমাদের গ্রামের মধুসূদন মালাকর সে সময়ে আমাদের অঞ্চলে সর্বপ্রধান বসন্ত-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। জেঠামহাশয়কে বাড়ী আসবার জন্য চিঠি লেখা হ'ল। কিন্তু তখন ত আর একালের মত ডাকের সুবিধা ছিল না, টেলিগ্রাফের ব্যবস্থাও হয় নি, এবং যাতায়াতেরও সুবিধাও ছিল না। কাজেই বাবার মৃত্যুর দুদিন পরে জেঠামহাশয় বাড়ী এলেন।

বাবা যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরে বড়দিদি ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। বড়দিদির কাছে পরে আমরা শুনেছি, মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে বাবা

সর্বদাই বলতেন, ওরে তোরা কিছু ভাবিস্ নি, আমি তোদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি না, দাদা আসুন কোথায় কি আছে সব ব'লে যাব। ক্রমেই যখন অবস্থা খারাপ হ'তে লাগল তখন একদিন বড়দিদি জিজ্ঞাসা করেছিরেন, কাকা, বাবা ত আজও এলেন না, তুমি ত কিছুই বলছো না, এদের নিয়ে কি শেষে ভিক্ষা ক'রে খাব! তাতে বাবা উত্তর দিয়েছিলেন—তোদের ভয় নেই রে, দ্বারকানাথের এখানকার পড়া শেষ হ'লে বিলেত যাবার জন্যে পনের হাজার টাকা রেখে দিয়েছি, তাকে আমি হাকিম করব, সুসারের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা রেখে দিয়েছি। আর এদিক ওদিক ছড়ানও দশ-পনের হাজার আছে। তোরা ত সব বুঝবি নে, সে সব কাগজপত্র বন্ধুর কাছে আছে, দাদা এলেই বুঝিয়ে দেব। সে বোঝান আর হ'ল না, বাবার মৃত্যুর দুদিন পরে জেঠামশায় বাড়ী এলেন। আমার পিস্তুতো ভাই জেঠামশায়কে বললেন —ছোটমামা কোথাও কিছু রেখে যান নি, বরঞ্চ আমার মনে হয়, তাঁর কিছু ধারই আছে। কিন্তু বড়দার মুখে শুনেছি, সেদিনও তিনি বলতেন—"কাকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে এসে, সেই রাত্রিতে আমাদের পিস্তুতো দুই ভাই একটা ঘরের মধ্যে দোর দিয়ে অনেক কাগজ পত্র পুড়িয়েছিলেন। আমার ঘুম হচ্ছিল না, কাগজ পোড়ার গন্ধ পেয়ে উঠে গিয়ে দোরের ফাঁক দিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি, অনেক দলিলপত্র, অনেক হিসাবেরর খাতা তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।" সুতরাং আমার পিতার মৃত্যুর পর আমরা শুধু পিতৃহীন হলাম না, পথের ভিখারী হয়ে পড়লুম।

২

বাবা মারা যাবার দু'দিন পড়ে জেঠামশায় বাড়ীতে এলেন। তিনি আর চাকরীতে গেলেন না। কিন্তু এমন কিছু সম্পত্তি ছিল না, যার উপর নির্ভর করে' বাড়ী বসে' থাকা যেতে পারে। সুতরাং এত বড় পরিবারটা চেপে পড়ল আমার দুই পিসতুতো ভাইয়ের ওপর। তাঁরাই আমাদের সকলের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই জেঠামশায় বুঝতে পারলেন যে, এ ভার বইতে তাঁর ভাগ্নেরা সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নন, অথচ একথা মুখ ফুটে বলতেও পারেন না। জেঠামশায় তাঁদের ভার কিঞ্চিৎ লঘু করবার অভিপ্রায়ে আমাদের গ্রামের জমিদার ঠাকুরবাবুদের তহশীলদারী গ্রহণ করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারও হলেন। আমাদের গ্রামে

তখন ফৌজদারী ও মুনসেফি আদালত ছিল। কুমারখালি তখন একটা সবডিভিশান। কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হলে, এই কুমারখালি সবডিভিশানই গোয়ালন্দে চলে, যায় এবং আমাদের গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত হ'য়ে, কুষ্টিয়া সবডিভিশানভুক্ত হয়। এই সবডিভিশানের কথা পরে আরও বলতে হবে, এখন সে কথা থাক।

জেঠামশায় যখন আমাদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করতে লাগলেন, তখন আমার যে পিস্তুতো ভাই কলকাতায় চাকরী করতেন, তাঁকে আর মাসে মাসে বাড়ীর খরচ পাঠাতে হ'ত না। জেঠামশায়ই নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। আমার সেই পিস্তুতো ভাই তখন প্রস্তাব করলেন যে, বড়দাদাকে তিনি কলকাতায় নিয়ে পড়াবেন। তিনি বলেছিলেন, ছোট মামার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, দ্বারিককে ভাল রকম ইংরেজী লেখাপড়া শেখাবেন। গাঁয়ের ইংরাজি স্কুল থেকে কলকাতায় স্কুল অনেক ভাল, আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যাই—এই ব'লে তিনি বড়দাদাকে কলকাতায় নিয়ে গেলন এবং সেখানে ডাফ কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন। সেইবারই বড়দাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ হ'তে পারেননি। তারপরের বছরও তিনি পাঠ আরম্ভ করেন। মেজদাদাও তার পূর্বে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ ক'রে ইংরাজি স্কুলে পাঠ আরম্ভ ক'রে দেন। আমিও তখন বাঙ্গলা স্কুলে যাই-আসি; কিন্তু আমার আর পড়া হয় না। ছ'মাস পড়তে পাই আর ছ'মাস পড়া বন্ধ। এই পড়া-বন্ধের ইতিহাসটা বলে' নি।

আমার বয়স যখন ছয় কি সাত বছর, তখন বুঝতে পারা গেল যে, আমার চোখের কিছু একটা অসুখ হয়েছে। তখন আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত ডাক্তারের ছড়াছড়ি ছিল না, হাতুড়ে কবিরাজই একমাত্র সম্বল ছিল। সুতরাং আমার চোখে যে কি অসুখ হ'ল, তা আমাদের গ্রামের কবিরাজ হরিমোহন সেন ধরতেই পারলেন না। সেই সময়ে হালিসহর থেকে প্যারিমোহন গুপ্ত নামক একটী ভদ্রলোক এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করবার জন্যে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনিও আমার চোখ দেখে কিছু ঠাহর করতে পারলেন না। অনেক টোটকাটুট্‌কি ব্যবহার করা হ'ল, তাতে উপকার না হয়ে অপকারই হ'ল। শেষে এই হ'ল যে, বৈশাখ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত এই ৫।৬ মাস আমি মোটেই চোখে দেখতে পেতুম না। একবারে অন্ধ হয়ে যেতুম। চোখের ভেতরে একটা সাদা পরদা উঠে সেটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে, আমার

চোখের তারকা ঢেকে ফেলত দৃষ্টিশক্তির লোপ হয়ে যেত। আবার শীত পড়তে না পড়তেই সে পরদাটা স'রে যেত, আমারও দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত। সুতরাং আমি সে সময়ে ৬ মাস অন্ধ, ৬ মাস চক্ষুষ্মান্। সে জন্যে আমার লেখাপড়াও আধাআধি মত হ'ত।

বাঙ্গলা স্কুলে আমি বাঙ্গলা সাহিত্যে খুব কৃতী হয়ে উঠলুম। অবশ্য সেটা আমার নিজের গুণে যত না হউক, কাঙ্গাল হরিনাথের আশীর্বাদে আর তাঁর শিক্ষার গুণে। আমি যখন বাঙ্গালা স্কুলে প্রথম ভর্তি হই, সেই সময়েই হরিনাথ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বঙ্গবিদ্যালয়ের ভার তাঁর কৃতী ছাত্র পুলিনচন্দ্র সিংহের ওপর দিয়ে, আমাদের গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার ভার নিয়েছিলেন এবং সেই বিদ্যালয়েরই শিক্ষকতাকার্য গ্রহণ করেছিলেন। সে-সব কথা পরে বিশেষ করে' বলতে হবে; কারণ আমার ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনের কথা, কাঙ্গাল হরিনাথের জীবন-কথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং তার বিস্তৃত বিবরণ প্রয়োজন। আমার বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের বৎসরের ছ'মাসের শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই যে, আমি সে সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করলেও, বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু বাঙ্গলা স্কুল কেন, ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণেরও অগ্রগণ্য ছিলাম। সব গোল বাধিয়েছিল ঐ অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্কবিদ্যায় আমার মত গাধা গ্রামের স্কুলে কেন, গ্রামের সীমানার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব আর পাটীগণিত, এই দুটো কিছুতেই আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করত না, অথচ সে সময়ে সকলেই বলতেন যে, আমার দেহের গঠনের অনুপাতে মাথাটা নাকি বড় ছিল। সে মাথার ভেতর বোধ হয় বাঙ্গলা সাহিত্যই সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছিল। আর তার জোরেই একবার যখন স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে যান, সে সময়ে কি যেন কি একটা করুণ রসাত্মক আবৃত্তি ক'রে তাঁর চোখের জল টেনে বার করেছিলুম, আর তাঁর কাছ থেকে তিনখানা বাঙ্গলা বই তখনই পুরস্কার আদায় করেছিলুম।* এই চাপরাসের জোরে, আর কাঙ্গাল হরিনাথের আদরে আমি প্রতি বছরে ক্লাস প্রমোশন পেতাম। কিন্তু কোনবারও অঙ্কের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫ নম্বর পেয়েছি কিনা, সন্দেহ। আর এখন হয়ত দাগ মিলিয়ে যেতে পারে. কিন্তু সে সময়ে আমাদের দ্বিতীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণপ্রবর কেদারনাথ জোয়ারদার মহাশয়ের এমন দিন যায় নি, যেদিন একখানি খেজুরের ডাল বেত্ররূপে পরিণত হয়ে আমার পৃষ্ঠে তার উদ্ভিজ্জীবন

পরিসমাপ্তি করে নি। এত যে মার খেতাম, তবুও পাটীগণিত আর ক্ষেত্রতত্ত্ব আমার বেত্রাঘাত-যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে মাথার বাহিরে দাঁড়িয়ে হাসত।

চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি, ল্যাপল্যাণ্ড দেশে নাকি ছ'মাস রাত্রি থাকে, ছ'মাস দিন হয়। ভগবান বোধ হয় আমাকে সেই ল্যাপল্যাণ্ড দেশে পাঠাবার জন্যে গড়েছিলেন, এমন সময়ে আমার মা-বাপের কাতর প্রার্থনায় তাঁর আসন টলেছিল, তাই আমাকে ল্যাপল্যাণ্ডে না পাঠিয়ে একবারে বাঙ্গালাদেশে পাঠিয়েছিলেন। এমন করে' প্রতি বৎসর ছ'মাস অন্ধ হয়ে বসে' থাকলে, বড় মানুষের ছেলের হয়ত চলতে পারে, কিন্তু আমার মত কপর্দকহীন গরীব কায়স্থের ছেলের ভরণপোষণ নির্বাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দেশে যতটুকু চিকিৎসা হ'তে পারে, তা' করে'ও যখন কোন ফলই হ'ল না, তখন জেঠামহাশয় হাল ছেড়ে দিলেন, মা ও জেঠাইমা কান্না সুরু করলেন। সকলেরই আশঙ্কা হ'ল যে, ছ' মাসের অন্ধত্ব বাড়তে বাড়তে বারমাসে গিয়ে পৌছবে। আমি চিরজীবন অন্ধ হয়েই থাকব।

সেই সময়ে কয়েক দিনের জন্যে আমার পিস্‌তুতো ভাই বঙ্কুবিহারী বাড়ী এসেছিলেন। মা ও জেঠাইমা তাঁকে ধরে' বসলেন যে, আমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একবার ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দুটো পরীক্ষা করাতে হবে। আমার পিস্‌তুতো ভাই কি করেন, বাড়ীর সকলের কাতর অনুরোধে তিনি আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে স্বীকার করলেন। চোখের চিকিৎসা হউক না হউক, অন্ধত্ব ঘুচুক না ঘুচুক, রেল চড়া হবে, কলির সহর কলকাতা দেখা হবে, এই আনন্দ আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল। কোনদিন বাড়ী ছাড়া হইনি, দূরদেশে যেতে হবে, সেখানে মা-বোন কেউ নেই, হয়ত কত কষ্ট হবে—এসব কিছুই আমার মনে হ'ল না। আমি কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। শুভ দিনে আমার সেই পিস্‌তুতো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে' এলুম। সেটা কোন সাল, তা' আমি পুঁথিপত্র না দেখে মুখে-মুখেই বলতে পারচি নে। যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা সালটা 'ঠিক ক'রে নেবেন' কারণ সেই সালেই হাইকোর্টের বিচারপতি নর্মান সাহেবকে আবদুল্লা নামে এক পাঠান টাউন-হলের সিঁড়ির মধ্যে খুন করে। তখন নূতন হাইকোর্ট-বাড়ী হয় নি, টাউনহলেই হাইকোর্ট বসত। আর তার অব্যবহিত পরে ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপে একজন দায়মালী বন্দী সিয়ার আলির হাতে নিহত হন। আর এইটুকু মনে আছে, সেদিনটা সরস্বতী পূজার আগের দিন। কারণ

সরস্বতী পূজার দিন জোড়াসাঁকো শ্যাম মল্লিকের বাড়ী আমার পিস্তুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে অনেক গানবাজনা, আমোদপ্রমোদ হ'বে ব'লে দাদা সন্ধ্যার সময়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্যাম মল্লিকের বাড়ী গিয়ে দেখি সব নিস্তব্ধ, পূজা-প্রাঙ্গনে অল্প কয়েকটী আলো জ্বলছে। তখন জানতে পারা গেল, আন্দামানে বড়লাট সাহেব খুন হয়েছেন, তাইতে সহরের সরস্বতীপূজার আমোদ, আনন্দ, সমারোহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি ছেলেমানুষ, সবে কলকাতায় এসেছি, সাতপুকুরের বিখ্যাত বাগানের মালিক শ্যাম মল্লিকের বাড়ী কত নাচ গান দেখব শুনব, সে সব কিছুই হ'ল না। সেই নৈরাশ্যের কথাটা এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত আমার মনে আছে।

তখনকার কলকাতার কথাও একটু বলি। তখন গঙ্গার ধারে রাস্তা হয়নি, হাবড়ার পোল তখন তৈরী হচ্ছে। সহরের অলিগলিতে তখন শিয়াল ডাকত। মিউনিসিপ্যালিটীর এমন সুবন্দোবস্ত ছিল না। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্কী ছাড়া যানবাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। জলের কল তখন সবে হয়েছে, কি হব-হব হয়েছে, ঠিক আমার মনে নেই। ব্রাহ্মসমাজের কেশব সেন অগ্র-পশ্চাৎ সেই সময়েই বোধহয় বিলেত থেকে ফিরে এসেচেন। মোছোবাজারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হয়েচে। একথাটি বলচি এই জন্য যে, আমার সেই পিসতুতো ভাই কেশব সেনের চেলা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে যেতাম। কেশববাবু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরবাবু, গৌরগোবিন্দবাবু ও আরও বড় বড় ব্রাহ্ম আমাকে ভাল বাসতেন। দাদার সঙ্গে আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজেও গিয়েছি। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও গায়ক বিষ্ণুবাবুর সম্মুখে আমি পড়েছিলুম। দাদা আমাকে তাঁর ছোট ভাই বলে' পরিচয় করে' দিলে, আমি তাঁদের দু'জনকেই প্রণাম করেছিলুম। মহর্ষি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্বাদের কথা আমি এখনও ভুলিনি।

সে কথা থাক, যে জন্য কলকাতায় এসেছিলুম, সেই কথাটাই বলেনি।

সেটা আমার চোখের চিকিৎসার কথা। চোরবাগানের পরলোকগত লালমাধব মুখোপাধ্যায় সে সময়ে কলকাতায় একজন বেশ বড় চিকিৎসক ছিলেন। চক্ষুরোগের চিকিৎসায় তাঁর বেশ সুযশ ছিল। প্রথম মাসখানেক তিনিই চিকিৎসা করলেন। কোনই সুফল হ'ল না। আমি যেমন অন্ধ তেমনই থাকলাম। তখন কলিকাতার চক্ষু রোগের সর্বপ্রধান চিকিৎসক

ছিলেন Dr. Macnamara, শুনতে পাই তাঁর মত চক্ষুরোগের চিকিৎসক ভারতবর্ষে আর কখনও আসে নি। লালমাধববাবুর চিকিৎসায় যখন কোন ফল হ'ল না, তখন মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে Dr. Macnamara কে দেখানই স্থির হল। কলেজে Outdoor রোগী হয়ে দেখালে, চিকিৎসকেরা কোন রকমে ব্যাগার শোধ দেন, এ বিশ্বাস তখনও লোকের ছিল। সেইজন্য একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে মুরব্বি স্থির করার ব্যবস্থা হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার দাদার সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক পরলোকগত দুর্গাদাস কর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুর্গাদাসবাবু সমস্ত অবস্থা শুনে. নিজেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে Macnamara সাহেবের বাড়ীতে গেলেন। আমার অবস্থার কথা শুনে সাহেবের দয়ার সঞ্চার হ'ল। তিনি নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে আমার চক্ষু পরীক্ষা ক'রে বললেন যে, চোখে অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে কোন ফল হবে না। আবার তেমনি পর্দা বেড়ে চোখের ক্ষেত্র ঢেকে ফেলবে। তিনি তখন ঔষধ প্রয়োগেরই ব্যবস্থা করলেন এবং প্রতি সপ্তাহে রবিবারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। আমি গরীব ব'লে তিনি যে ছ'মাস আমার চিকিৎসা করেছিলেন, সেই ছ'মাসই প্রতি রবিবারে পরীক্ষা করার জন্যে কোন পারিশ্রমিক ত নেনই নি, ওষুধের দাম পর্য্যন্ত নেননি। ছ-মাস চিকিৎসা করে'ও যখন কিছু হল না তখন তিনি বললেন—ওষুধে বা অস্ত্র করে কিছু হবে না, বয়স একটু বাড়লে আপনিই সেরে যাবে। অত বড় চিকিৎসকের কথায়ও কিন্তু দাদা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তখন সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল।

তখনও হোমিওপ্যাথির তত পসার হয় নি। তা' না হলেও, সে সময়ে কলকাতায় যিনি প্রধান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, তাঁর পসার-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তাঁর নাম ডাক্তার বেরিনি। বেরিনি সাহেবের ডাক্তারখানা তখন লালবাজারের মোড়ের উপর ছিল। তখনও ছিল, এই অল্পদিন পূর্ব পর্যন্তও ছিল। সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে বেরিনি সাহেবকে চোখ দেখান হ'ল, তিনি চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। সে এক কৌতুকজনক ব্যাপার। এখন ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দেখি, ব্যবহারের তেমন কড়াকড়ি নেই, পথ্যেরও তেমন কঠোর বিধান নেই। কিন্তু তখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুচিবায়গ্রস্ত ছিল। সপ্তাহান্তে একদিন ক'রে সাহেবের ডাক্তারখানায় যেতে হ'ত। তিনি তাঁর বাক্স খুলে অতি সন্তর্পণে ছোট একটি শিশি বার করে, তারই

এক ফোঁটা, চার আউন্স একটা শিশিতে সমস্তটা জল ভরে' তাতে ফেলে দিতেন। তারপর ১০।১৫ মিনিট সেই শিশিটা নেড়ে চেড়ে, সেই জলের কাঁচ্চা পরিমাণ ছোট একটা কাচের গ্লাসে ঢেলে আমাকে খাইয়ে দিতেন। বাস—এই সাত দিনের ওষুধ। সাতদিনের মধ্যে আর কোন ওষুধ খেতে হ'ত না। তারপর পথ্যের কথা। নুন, লঙ্কা একবারে বাদ। মশলার মধ্যে একটু জিরে বাটা। তরকারী একবারে বন্ধ। মাছ খেতে দিতে আপত্তি নেই; কিন্তু খেতে হবে মাছ সিদ্ধ করে, একটু জিরে বাটা মেখে। মিষ্টি জিনিষের মধ্যে খুব বেশী হলে সারাদিনে এক ছটাক মিছরি, তা'ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং মোটের ওপর পথ্য দাঁড়ালো, এক বেলা দুধ-ভাত, ছোট একটুকরো মিছিরি, আর এক বেলা দুধ-সাগু। অন্য সময়ে ক্ষিদে পেলে, একটু দুধ। এই কঠোর নিয়মে পথ্য করে ছ'মাসেও চোখের অসুখ সারলো না বটে, কিন্তু আহার-সংযম অভ্যাস হয়ে গেল। সে সংযম এখন পর্যন্ত আমার আছে।

প্রায় দু-বছর এমনি করে কাটিয়ে, যখন কিছুই হ'ল না, তখন অন্ধত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলাম।

আমি যখন চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলাম, তখন আমার বড় দাদা দ্বারকানাথ সেন ডাফ কলেজে পড়তেন। তার আগের বছরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হয়ে, সেবার পুনরায় পরীক্ষা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে এমনই কাঁচা ছিলেন যে, দ্বিতীয়বারও তাঁর পাস হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। আবার ফেল হবার ভয়ে একদিন কাউকে কিছু না বলে কলকাতা থেকে পলায়ন করলেন। দাদাকে না দেখে, এই বিদেশে আমিও কেঁদে আকুল। আমার পিসতুতো ভাই সহরময় অনুসন্ধান করলেন, পুলিসে পর্যন্ত খবর দিলেন। কিন্তু বড়দাদার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। প্রায় পনের দিন পরে বাড়ী থেকে জেঠামহাশয় চিঠি লিখলেন যে, বড়দাদা পালিয়ে একেবারে রাজমহলে গিয়েছেন এবং সেখানকার ইংরাজি স্কুলে (?) হেডমাষ্টারী (?) চাকরী নিয়েছেন। সেখান থেকে মাস ছয়েক পরে, গ্রীষ্মের ছুটিতে বড় দাদা বাড়ী এলেন, আর তাঁর রাজমহলে ফিরে যাওয়া হ'ল না। আমাদের গ্রামে সবডিভিশান ছিল, তিনি সবরেজেষ্ট্রী অফিসে হেড ক্লার্কের পদ পেলেন। মাসিক বেতন ২০ টাকা। সে সময়ে আমাদের কুমারখালির সবডিভিশনাল অফিসর ছিলেন পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তার কিছুদিন পরেই আমি কলকাতায় থাকতে থাকতেই ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেল

লাইন খুলেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গাঁয়ের সবডিভিশান গোয়ালন্দে স্থানান্তরিত হ'ল। বড়দাদাও গোয়ালন্দ চলে গেলেন।

চোখের চিকিৎসায় কিছু না হওয়ায়, আমি বাড়ী ফিরে আসবার আয়োজন করছি, সেই সময়ে বাড়ী থেকে পত্র এল আমার জ্যেঠামশায় ওলাওঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেচেন। তখন আর আমার বিলম্ব সহে না, আমার পিসতুতো ভায়ের সঙ্গে বাড়ী এলুম। কোন রকমে জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। বড়দাদা গোয়ালন্দে চলে' গেলেন, মেজ দাদা তখন আমাদের গ্রামের ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তেন, সেই সময়ে কু-সঙ্গে পড়ে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে ছিলেন।

আমি বাড়ী এসে দেখলুম, আমার ছোট ভাই শশধর আমাদের গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়চে। আমি যদি তখন বাঙ্গলা স্কুলে ভর্তি হই, তা' হলে সম্ভবতঃ তার নীচের শ্রেণীতে আমায় ভর্তি হতে হয়। ছোট ভায়ের নীচের ক্লাসে বড়ভাই পড়বে, এ কি ক'রে হয়! আমি বললাম, আমাকে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করে' দাও। তাতে বাড়ীর সকলেরই আপত্তি, বিশেষতঃ বড় দাদার। তিনি নিজে ভুক্তভোগী কিনা। গোড়া থেকেই ইংরাজি স্কুলে পড়ে' তাঁর বাঙ্গলার বিদ্যে অতি চমৎকার হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাবশেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ভাল করে' বাঙ্গলা না শিখিয়ে, তিনি আমাদের দু'ভায়ের কাউকেই ইংরাজি পড়তে দেবেন না। শেষে স্থির হ'ল, আমি গোয়ালন্দে গিয়ে সেখানকার মাইনর স্কুলে পড়ব। গোয়ালন্দে তখন সবে একটা মাইনর স্কুল বসেছে।

আমি গোয়ালন্দে গেলে বড়দাদা বললেন, স্কুলে ভর্তি হতে গেলে একেবারে A. B. C. D. ক্লাসে ভর্তি হতে হবে। তার থেকে তুই যদি বাসায় আমার কাছে মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করিস, তা'হলে ছ'মাসের মধ্যে মাইনর থার্ড ক্লাসের মত ইংরাজি আমি শিখিয়ে দিতে পারব। আমিও তাই স্বীকার করলুম। কিন্তু ভয় সেই অন্ধত্ব—আর দু'মাস পরে যখন অন্ধ হয়ে পড়ব, তখন পড়ার কি হ'বে? এই কথা ভেবে আমি সত্যি সত্যিই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলুম। আমার বয়স তখন এগার বৎসর।

গোয়ালন্দে এক আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে দুই ভাই থাকি, সে অবস্থায় আমার মন যে কি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, তা' এখনও আমার মনে আছে। আমার বেশ মনে আছে, প্রতিদিন রাত্রে যখন সকলে ঘরের আলো নিবিয়ে

ঘুমুতেন, আমি তখন সেই অন্ধকারে বসে' ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম—"হে ঠাকুর, আমার চোখের অসুখ সারিয়ে দাও।" পিতৃহীন দরিদ্র সন্তানের এই কাতর আবেদন, এই আর্ত প্রার্থনা সত্য সত্যই ভগবানের চরণে পৌছেছিল, নইলে কলকাতার সর্বপ্রধান চিকিৎসকেরা যে ব্যাধি আরোগ্য হবে না বলে আমায় নিরাশ করে' ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেই ব্যাধি দূর করবার জন্যে পদ্মাতীরে দরিদ্রের কুটীরে সহসা এক চিকিৎসকের আবির্ভাব হ'বে কেন! কি আশ্চর্য্য উপায়ে আমার চোখের অসুখ চিরদিনের মত সেরে গিয়েছিল, সে কথা বলতে গেলে এখনও আমার অবিশ্বাসী হৃদয় বিশ্ববিধাতার চরণে নত হয়ে আসে, এখনও তাঁর মঙ্গল-হস্ত আমার ওপর প্রসারিত দেখতে পাই। এখনও প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা করে—

"একি করুণা তোমার ওহে করুণানিধান—
অধম সন্তানে প্রভু, এত তোমার করুণা কেন ?
আমি সতত তোমারে ছেড়ে, থাকিতে চাই দূরে দূরে
তবু তুমি প্রেমভরে কর মোরে আলিঙ্গন।"

সকালে ও রাত্রে বড় দাদার কাছে একটু একটু ইংরেজি পড়ি, পড়ায় মোটেই মন লাগে না। শুধুই মনে হয়, আর ক'দিন পরেই যখন চোখের দৃষ্টিলোপ হ'বে, তখন সেই পাঁচ ছ'মাসের অন্ধকারের মধ্যে সব ডুবে যাবে। তারপরে আবার দৃষ্টি ফিরে এলে, নূতন করে A B C আরম্ভ করতে হ'বে। এই ভেবেই পড়ায় আমার মন লাগত না। আমার বয়সের ছেলেরা কত খেলাধূলা করে, দৌড়াদৌড়ি করে, আমোদ আহ্লাদ করে, আমি তাতে যোগ দিতেই পারি না, সে ইচ্ছাই আমার করে না। আমি চুপ করে' এক স্থানে বসে থাকি। এই ভাবে কিছুদিন গেলে এক অভাবনীয় ঘটনায় আমার ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। আমরা যাঁর বাসায় থাকতাম, তিনি আমাদের স্বগ্রামবাসী। আমাদের বাড়ী আর তাঁদের বাড়ী গায়ে-গায়ে লাগা। তিনিও কায়স্থ। আমরা তাঁকে ঠাকুরদাদা বলে' ডাকতুম। তাঁর নাম ৺হরিমোহন সরকার। তিনি কণ্ট্রাক্টরী করে' অনেক টাকা উপার্জন করতেন। তা' ছাড়া তাঁর কয়েকটা নীলকুঠীও ছিল। আমাদের ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ নীলকর মিষ্টার কেনি যখন প্রজাবিদ্রোহে বিব্রত হয়ে নীলকুঠী বেচে দেশে পালিয়ে যান, সেই সময়ে তাঁর প্রধান নীলকুঠী সালঘর বুঁদিয়া আমার এই দাদামশাই ক্রয় করেন। তাহার পর কয়েক বৎসর নীলের কাজে ক্ষতি স্বীকার করে' সব বেচে ফেলেন।

তখন তিনি E. B. S. R.-এর loading unloading-এর কণ্ট্রাক্টার হন। ইতিপূর্বে রেলওয়ে লাইন নির্মাণের কণ্ট্রাক্টরী করায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও অর্থাগম হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি এই বৃহৎ কণ্ট্রাক্ট লাভ করেন। এই কণ্ট্রাক্ট কার্য উপলক্ষ্যে তাঁহাকে প্রতি মাসেই ১০।১৫ দিন গোয়ালন্দে থাকতে হ'ত। তাঁরই বাসায় আমরা থাকতাম।

একদিন সকালে আমরা তাঁর বাসার বারন্দায় বসেছিলাম, তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে একজন পশ্চিমদেশী মুসলমান সেখানে উপস্থিত হ'ল। তার পোষাকপরিচ্ছদ ভদ্রলোকের মত। মাথায় প্রকাণ্ড টুপী, পরিধানে পায়জামা ও চাপকান, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সেই লোকটি এসে ঠাকুরদার কাছে যে আত্মপরিচয় দিল, তার সারমর্ম এই যে, সে লক্ষ্ণৌএর রহেনেওয়ালা এবং সেখানকার একজন নামজাদা হেকিম। দেশভ্রমণে বাহির হয়েছে। গোয়ালন্দ স্থানটি অতি মনোহর, এখানে দিনকতক অবস্থিতি করবে, তারপর পূর্ব্ববঙ্গে চলে' যাবে। তার এই কথা শুনে' ঠাকুরদা তা'কে খুব খাতির করে' বসবার আসন দিলেন এবং দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির গল্প জুড়ে' দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরদা বললেন, হেকিম সাহেব, আমার এই নাতিটির একটা কঠিন রোগ হয়েছে আপনি কৃপা করে' যদি পরীক্ষা করেন, তবে বড় ভাল হয়। এই বলে' তিনি আমার চোখের রোগের বিবরণ আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। সমস্ত কথা শুনে হেকিম সাহেব আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বসালেন এবং অনেকক্ষণ ধরে' চোখ পরীক্ষা করে' বললেন—এ ব্যাধি অতি সামান্য, আমি অতি সহজে আরাম করে' দিতে পারব। ওষুধপত্র কিছু দিতে হ'বে না, শুধু চোখে অস্ত্র করতে হ'বে। অস্ত্র করার কথা শুনেই ঠাকুরদা ভীত হলেন। বল্‌লেন, চোখে অস্ত্র করতে দিতে সাহস হয় না, এখন তবুও ছ'মাস দেখতে পায়, অস্ত্র করে' শেষে তাও পাবে না। হেকিম সাহেব বল্‌লেন, চোখের ভেতরে অস্ত্র করা হবে না, বাইরে চোখের পাতার পাশে সামান্য একটু ছিদ্র করে' দিতে হ'বে, চোখে কোনই আঘাত লাগবে না। কথা শেষ করে' তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে অনেকগুলি কাগজ বার করলেন। সেগুলি তাঁর সার্টিফিকেট। কয়েকখানা ইংরেজিতে লেখা, কয়েকখানা হিন্দী, কয়েকখানা উর্দু। ঠাকুরদা হিন্দী ও উর্দু জানতেন, ইংরেজি জানতেন না। ইংরেজি সার্টিফিকেটগুলো আমার বড় দাদা তর্জমা করে, সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। হিন্দী ও উর্দু প্রশংসাপত্রগুলি ঠাকুরদাদা পড়ে শুনালেন।

এই সকল দেখেশুনে তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মাল যে, হেকিম সাহেব প্রকৃতপক্ষে একজন নামজাদা সুচিকিৎসক। ঠাকুরদা তখন তাঁর ফী'র কথা জিজ্ঞেস করলেন। হেকিম সাহেব হেসে বললেন, টাকাকড়ি কিছুই দিতে হ'বে না, আমি এমনিই চিকিৎসা করব। তখন স্থির হ'ল যে, সেদিন আর অস্ত্র করা হ'বে না, পরদিন প্রাতঃকালে হেকিম সাহেব অস্ত্র করবেন।

সে দিনরাত আমার যে কি দুর্ভাবনায় গেল, তা' এতকাল পরে এখনও মনে আছে। কোথাকার কে, চিনি না, জানি না, তার হাতে চোখ দুটো সমর্পণ করা বড় সহজ কথা নয়। যে অবস্থা তখন ছিল, তাতে অন্ততঃ ছ'মাস ত দৃষ্টি থাকত, এবার হয়ত চিরদিনের মত অন্ধ হ'তে হ'বে। বড়দাদাও বার বার এই কথাই আন্দোলন করতে লাগলেন। কিন্তু হেকিমের ওপর বৃদ্ধ ঠাকুরদার এতই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তিনি কোন কথাই কর্ণপাত করলেন না। বড়ই উদ্বেগে সেই দিনরাত কেটে গেল।

পরদিন প্রাতঃকালেই হেকিম সাহেব এসে হাজির হলেন, তাঁর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। তিনি বসে'ই তাঁর দীর্ঘ চাপকানের পকেট থেকে, কাগজে মোড়া লম্বামত কি একটা বার করলেন। আমার ত সেই জিনিষটা দেখেই মুখ শুকিয়ে গেল, বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগল, চোখেও জল এল। আমার সেই অবস্থা দেখে, হেকিম সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "ডরো মত, বাচ্চা, কুচ দরদ নেই হোগা।" তারপর কাগজের মোড়ক খুললেন, দেখা গেল সূচের মত তীক্ষ্ণাগ্র একখানি অস্ত্র। হেকিম বললেন, আমাকে শুতেও হ'বে না, যেমন বসে' আছি, তেমনি বসে' থাকলেই চল্‌বে। কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের দরকার হ'ল না। হেকিম আমার ডান চোখের ওপরের পাতা বন্ধ করে, নাকের ঠিক পাশে তাঁর সেই তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা সামান্য একটু বিঁধিয়ে দিলেন। সামান্য একটা কাঁটা ফুটলে যেমন বেদনা বোধ হয়, আমি ততটুকুই বেদনা বোধ করলুম। সুতরাং চীৎকার 'আহা, উহু' করতে হ'ল না। তিনি যখন শলাকাটা টেনে বার করলেন, তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু'ইঞ্চি মাপের একটা সরু শিরা বার হয়ে চোখের ওপর ঝুলতে লাগ্‌ল। সেই শিরার এক অংশ অস্ত্র করার স্থানেই আটকে রইল। হেকিম সাহেব তার পকেট থেকে একটা কৌটা বার করলেন। সেই কৌটার মধ্যে একটা মলম ছিল। ক্ষুদ্র একটু কাগজে সেই মলম লাগিয়ে ক্ষতস্থানের ওপর বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, চার পাঁচ দিনের মধ্যে ক্ষত শুকিয়ে যাবে, আর ঐ শিরাটা আপনা

হতেই পড়ে যাবে। তিন দিন স্নান বন্ধ। আহারের ব্যবস্থা হ'ল, ঐ তিন দিন ভাত চিনি, আর কিছুই নয়। হেকিম সাহেব বললেন, তিনি দু'একদিন অপেক্ষা করবেন, তার পরই ঢাকায় চলে' যাবেন। ঢাকা থেকে ফেরবার সময়ে, এখানে দু'চার দিন থেকে অপর চোখেও অস্ত্র প্রয়োগ করবেন। এই বলে তিনি বিদায় হলেন।

দিনমান ভালই গেল, কোন রকম অসুখই বোধ করলুম না। সন্ধ্যার মুখে ভয়ানক জর এল, সারারাত্রি জ্বরের জালায় ছটফট করতে লাগলুম। চোখেতে কিন্তু কোন রকম যন্ত্রণা অনুভব করলুম না। বাসার সকলে চিন্তিত হলেন, কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল। প্রাতঃকালে উঠেই বড়দাদা হেকিমের বাসায় গেলেন। তিনি ষ্টেশনের কাছে একটা দোকানে বাসা করেছিলেন। বড়দাদা সেখানে গিয়ে শুনলেন, একটু পূর্বেই যে ষ্টীমার ছেড়েছে, হেকিম সাহেব সেই ষ্টীমারে ঢাকা যাত্রা করেছেন। তিনি বাসায় ফিরে এলেন, সকলে মহাচিন্তিত হয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে বেলা ৯।১০ টার সময়ে আমার জ্বর ছেড়ে গেল। তখন হেকিমের ব্যবস্থামত ভাত ও চিনি পথ্য পেলুম। তিনদিন ঐ ভাবেই চললো। চতুর্থদিন প্রাতঃকালে সেই শিরাটা আপনা হতেই পড়ে' গেল। দেখা গেল, ক্ষতস্থানও শুকিয়ে গেছে। অত্যাশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই সময় থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্যন্ত এই প্রায় ৬০ বছরের মধ্যে আমার চোখে কোন অসুখ হয় নি, ছ মাসের অন্ধত্বও ঘুচে গেছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে চোখে অস্ত্রোপচার হয়নি, সেটারও অসুখ সেরে গেছে। তারপর থেকে অনুসন্ধান করেও সে হেকিম সাহেবের খবর মেলেনি। ঢাকা থেকে ফেরবার সময়ে আমাদের বাসায় আসবেন বলেছিলেন, সে কথাও তিনি রক্ষা করেন নি। এই অদ্ভুত উপায়ে আমার ছ-মাসের অন্ধত্ব ঘুচে গিয়েছে।

এইবার আমার লেখাপড়া শেখার কথা গোড়া থেকে বলি। আমাদের সময়ে সকল ছেলেকেই গোড়ায় পাঠশালায় পড়তে হ'ত। যেখানে ইংরেজী বা বাঙ্গলা স্কুল ছিল না এবং যেখানকার ছেলেদের অভিভাবকেরা সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না, সেখানে তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়া ঐ পাঠশালা পর্যন্তই। সেকালের পাঠশালা সম্বন্ধে এইখানে দু'একটা কথা বলতে চাই, যদিও আমি কখনও পাঠশালায় পড়িনি। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ "বর্ণ পরিচয়" হাতে করে বাঙ্গলা স্কুলেই প্রবেশ করেছিলুম, তা' হলেও আমাদের

গ্রামে যে পাঠশালা ছিল তা' আমি দেখেছি। এখনও তার চিত্র আমার স্মৃতিপথে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

আমাদের গ্রামে, আমাদের পাড়ায় একজন খুব অবস্থাপন্ন তন্তুবায় ছিলেন। গ্রামের বাজারে তাঁর দেশী কাপড়ের দোকান ছিল, বাড়ীতে ৩০।৪০ খানি তাঁত চল্‌ত। বাড়ীও বড় ছিল, দোতালা অট্টালিকা। সুন্দর পূজার মণ্ডপ ছিল। সেই তন্তুবায়ের নাম রামমোহন প্রামাণিক। তাঁর দুই ছেলে ছিল। জ্যেষ্ঠ ব্রজনাথ প্রামাণিক বিষয়কর্ম দেখতেন; কনিষ্ঠ দ্বারকানাথ প্রামাণিক গ্রামের ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়ে ডাকবিভাগে চাকরী নিয়েছিলেন। ইনি ৩৫ বছর সুখ্যাতির সঙ্গে চাকরী ক'রে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ২৫ বছর ধরে, পেন্‌সন ভোগ করে, ইংরেজি ১৯২২ সালের শেষে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের অবস্থা এখন অত্যন্তই মলিন হয়েছে। বাড়ীতে তাঁতের সম্পর্কই নেই। বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় দোকান উঠে গিয়েছে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁরা যে পাড়ায় বাস করতেন, সে পাড়ার নামই তাঁতিপাড়া ছিল। আমরা বাল্যকালে দেখেছি, এই তাঁতিপাড়ায় কম করে হলেও ১৫০ তাঁত চল্‌তো। এই পাড়া থেকে যুবক-বৃদ্ধ-বালক চার-পাঁচ শত তাঁতী বার হ'ত। এখন সে পাড়ায় একখানাও তাঁত নেই, তাঁতিপাড়া প্রায় জনশূন্য হয়েছে। দু'তিন ঘর তাঁতী কোন রকমে আছে। কেউ বা বিলাতী কাপড়ের দোকান করে; কেউ বা বিলাতী সূতা বিক্রি করে' কোন গতিকে দিন চালাচ্ছে। এই তাঁতী পাড়ার কবি-গানের দল, সঙ্কীর্ত্তনের দল আমাদের গ্রামে অপরাজেয় ছিল। অন্য পাড়ার কোন দলই এদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ত না। এখন আর সেদিন নেই, সব শ্মশানপ্রায় হয়েছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে রামমোহন প্রামাণিকের চণ্ডীমণ্ডপ এখনও অক্ষত শরীরে বিদ্যমান আছে। আর এই চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে এখনও যখন আমাদের বাড়ী যাই, তখন মানস চক্ষে সেই চণ্ডীমণ্ডপে আমার বাল্যকালের সেই পাঠশালার দৃশ্য দেখতে পাই। এই পাঠশালার যিনি গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁর নাম আমার মনে নেই। আমার অপেক্ষাও বয়সে বড় যাঁরা এখনও গ্রামে আছেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরাও আমারই মত সেই গুরুমহাশয়কে "বর্দ্ধমেনে মশায়" বলে' জানতেন ও ডাকতেন। অর্থাৎ সেই গুরুমশায়ের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামে ছিল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কি উপলক্ষে, কবে আমাদের গ্রামে বিদ্যা বিতরণের জন্য তাঁর শুভাগমন হয়েছিল, গ্রামের

ইতিহাসে তা' লেখা নেই। এখনকার মত অনুসন্ধিৎসা যদি সেকালে থাকত, তাহলে আমার পরমপূজনীয় কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই জানতে পারতুম। তাঁর যে স্বলিখিত ডায়েরী আছে, তাতেও এই "বর্দ্ধমেনে মশায়ের" উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন পরিচয় নেই। এই "বর্দ্ধমেনে মশায়" গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ ছিলেন। মাথায় প্রকাণ্ড শিখা ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। তিনি যখন বেত হাতে করে' হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, তখন আমরা দূরের কথা, অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হতেন। এই গুরুমহাশয় দুর্দ্ধর্ষ হলেও শিক্ষাদান বিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আমার না হলেও, যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁদের লেখা যে ছাপার অক্ষরের মত হ'ত, তাঁরা শুভঙ্করী ও বাজার হিসেবে সুদক্ষ হতেন, তার প্রমাণ আমাদের গ্রামে বিস্তর ছিল। তাঁর নিয়ম ছিল—শিক্ষার্থীকে প্রথমে মাটিতে 'অ-আ, ক-খ' দাগা বুলাতে হবে। একজন ছাত্র মাটিতে 'ক-খ' দেগে দিত, অন্য ছাত্ররা তারই ওপর বাঁশের কঞ্চির কলম বুলাত। এই ছিল প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলাপাতায় ও তালপাতায় 'অ-আ-ক-খ' লিখতে হ'ত। হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। মুখে মুখে শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, নামতা শিখান হ'ত। প্রথম হ'তে দু'তিন বছরের মধ্যে পাঠশালায় কোন বই পড়ান হ'ত না। যে সব ছেলেরা 'কাগজের ক্লাসে' প্রমোশন পেত, তারাই বই পড়বার অধিকারী হ'ত। পাঠশালার সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বই-এর নাম "শিশুবোধক"। এখনও বোধ হয় খোঁজ করলে কলকাতার বটতলায় সে বই পাওয়া যেতে পারে। আমি পাঠশালায় না পড়লেও, জ্যাঠামহাশয়ের কাছে শুনে শুনে "গঙ্গাবন্দনা" "দাতাকর্ণ" মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এখনও মনে পড়ে—জ্যাঠামহাশয়ের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সুর করে "গঙ্গা বন্দনা" বলতাম—

বন্দ মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি
পতিতপাবনী পুরাতনী

এখনও মনে পড়ে—পিসীমা মুখে মুখে শেখাতেন, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চার বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নবগ্রহ, দশ দিক্। সে পাঠশালার শিক্ষা এখন উঠে গিয়েছে; সে দাতাকর্ণ, সে গঙ্গাবন্দনা নেই। এখনও পাঠশালা আছে; কিন্তু সে 'বর্দ্ধমেনে গুরুমশায়'ও

নেই, সে শিক্ষাপদ্ধতিও নেই। এখন তাদের নাম হয়েছে, নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়!।

এবার আমার পড়ার কথা বলি। আমি কোন পাঠশালায় পড়িনি। খড়ি প্রভৃতি যে সকল অনুষ্ঠান শিক্ষারম্ভে করার ব্যবস্থা ছিল, সে উপলক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয় ও গৃহস্থের পুরোহিত মহাশয় কিছু পেতেন। আমার শিক্ষারম্ভে গুরু-পুরোহিত দু'জনেই ফাঁকিতে পড়েছিলেন। বোধহয় সেই জন্যই মা সরস্বতীর অকৃপায় আমার বিদ্যাও ফাঁকিতে পড়েছিল। আমি একেবারেই বিদ্যাসাগরের "বর্ণপরিচয়" হাতে করে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। সে সময়ে আমাদের গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে আমার বড় দাদা ও মেজ দাদা দু'জনেই পড়তেন। তখনকার ইংরাজি বিদ্যার মাদকতায় বিহ্বল হয়েই বোধহয় বড়দাদা আমাকে পাঠশালা ডিঙ্গিয়ে একেবারে বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা'হলেও জ্যাঠামশায় আমাকে দাতাকর্ণ, গঙ্গাবন্দনা আর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের উর্দ্ধতন সাতপুরুষের নাম কণ্ঠস্থ না করিয়ে ছাড়েন নি। এখনকার ছেলেদের কেন, যুবকদেরও জিজ্ঞাসা করলে তারা পিতামহের ওপর পর্য্যন্ত যেতে পারেন কিনা সন্দেহ! আমরা কিন্তু তখন নাম, গোত্র, এমন কি প্রবরও পর্যন্ত বলতে পারতাম! বিশেষতঃ সে সময়ে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সকলের ঘরেই হ'ত, সে উপলক্ষেও এ সকল শিক্ষা হ'ত। এখন বাৎসরিক বা পার্বণ শ্রাদ্ধ একরকম উঠেই গেছে।

যাক্ সে কথা, আমার বিদ্যারম্ভের কথাই বলি। বাঙ্গলা স্কুলেই প্রথম প্রবেশ করার অপরাধ বড় দাদার স্কন্ধেই দিলাম, বটে, কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আর এক মহাপুরুষের হাত ছিল। তিনি আর কেউ নন আমার শিক্ষাগুরু, আমার দীক্ষাগুরু আমার জীবনের আদর্শ স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয়, যিনি পরে কাঙ্গাল হরিনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আমার জীবনের কথা বলতে গেলে, কাঙ্গাল হরিনাথের কথাও বলতে হয়। সুতরাং এখানেই তাঁর জীবনের পূর্ব্বাভাস একটু দিয়ে রাখি।

কাঙ্গাল হরিনাথ অথবা হরিনাথ মজুমদার বাঙ্গলা ১২৪০ সালে [ শ্রাবণ মাসে, ইং ১৮৩৩ ] জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে তিলি ছিলেন। আমাদের গ্রামে তখনও এবং এখনও তিলি জাতি প্রধান। বিদ্যায় প্রধান না হ'লেও, ধনে-জনে তখনও তাঁরা প্রধান ছিলেন, এখনও আছেন। এই তিলিজাতীয় মজুমদার বংশে হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের গ্রামে

মজুমদার মহাশয়েরা সর্বপ্রধান না হ'লেও, বড় ধনী ছিলেন। এই ধনী মজুমদারদের এক শাখায় জন্মগ্রহণ করলেও, কাঙ্গাল হরিনাথের পিতা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। হরিনাথের বয়স যখন দু' বছর, তখন তাঁর পিতৃ-বিয়োগ হয়। তারই বছর দুই-তিন পরেই তাঁব মাতাঠাকুরাণীও মারা যান। হরিনাথের আত্মীয়স্বজন অবস্থাপন্ন হ'লেও, কেউই পিতৃমাতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করেন নি। বালক সত্যসত্যই নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়েছিলেন। কেউই তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হ'ন নি। তাঁর এক বৃদ্ধ পিতামহী ছিলেন, তিনিই এই অনাথ বালককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই বিধবারও গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ উপায় ছিল না। তিনি কষ্টসংগৃহীত অন্নের ভাগ হরিনাথকে দিয়ে, তাকে অন্নাভাবে-মৃত্যুর হাত থেকে কিছুদিন রক্ষা করেন। যার অন্নের সংস্থান নেই, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা কে করবে! সুতরাং হরিনাথের বাল্যকালে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ মোটেই হয় নি। গ্রামে গুরুমশায়ের যে পাঠশালা ছিল, তাতেই তিনি কয়েক দিনের জন্যে প্রবেশ করেন। একে অভিভাবকহীন তাতে নিঃসম্বল; কাজেই হরিনাথ পাঠশালার শিক্ষায় একেবারেই উদাসীন ছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছি, লেখাপড়ার দিকে তাঁর মোটেই মন ছিল না। এমন কি, পাঠশালায় যাবার ভয়ে একদিন তিনি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তাঁদের বাড়ীর কাছের একটা কূয়ার মধ্যে লুকিয়েছিলেন। তা'হলেও পাঠশালার যা' প্রধান শিক্ষা, তা' তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। বার বছর বয়সে তাঁর হাতের লেখা অতি সুন্দর হ'য়েছিল, আর সামান্য হিসাবপত্রও তিনি করতে পারতেন। এই সময়ে তাঁর আশ্রয়দাত্রী সেই বিধবাও মারা যান। তখন তিনি দুপুর বেলা কোন ঠাকুর বাড়ীতে গি'য়ে বসে থাকতেন। বিগ্রহের ভোগ হ'য়ে গেলে, অতিথি-অভ্যাগতেরা যখন প্রসাদ পেতো, তিনিও সেই প্রসাদ পেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি ক'রতেন। রাত্রে কেউ যদি ডেকে দিত, তা'হ'লেই তাঁর আহার হ'ত নতুবা উপবাস। তিনি আমাদের কাছে গল্প করেছেন যে, তাঁর পরার একখানি মাত্র কাপড় ছিল। সেখানি যখন এমন শতচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল যে, লজ্জা নিবারণের আর কোন উপায় নেই, তখন গাঁয়ের এক ভদ্রলোকের একখানি গ্রন্থ নকল ক'রে দিয়ে একখানি কাপড় পান, আর তাতেই তাঁর লজ্জা নিবারিত হয়।

তাঁর এই অবস্থা দেখে বাজারের এক দোকানদার তাঁকে দোকানের চাকরীতে বাহাল করেন। তাঁর বেতন স্থির হয়—প্রতিদিন দু'টো ক'রে

পয়সা। দোকানে যারা কাপড় কিন্‌তে আস্‌ত, তাদের জন্যে তামাক দেওয়া আর তাদের কাপড় গুছিয়ে দেওয়া তাঁর দিনের বেলায় কাজ ছিল। সন্ধ্যার পর যখন দোকানে কোন খরিদ্দার থাকত না, সে সময়ে তাঁকে দোকানে খাতা লিখতে হ'ত। দুপুরে ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ আর রাত্রে দু'পয়সার জলপান এই ছিল তাঁর সম্বল। কিন্তু এ চাকরীও তাঁকে বেশী দিন ক'রতে হল না। তিনি যে অনন্যসাধারণ মনস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠার জন্যে পরে বরণীয় হ'য়ে গিয়েছেন. এই বাল্যকালেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। তিনি যে দোকানে কাজ ক'রতেন, সেই দোকানদারের অপর এক লোকের কাছে কাপড়ের হিসাবে কিছু পাওনা ছিল। এই পাওনা নিয়ে উভয় পক্ষে বিবাদ হওয়ায়. দোকানদার প্রতিশোধ নিতে দোকানের খাতা জাল ক'রে অপর পক্ষের কাছে অনেক দাবী করার মতলব করেন। দোকানদার হরিনাথকে এই খাতা জাল ক'রতে বলেন। বার বছরের বালক হরিনাথ এমন মিথ্যা কাজ ক'রতে স্বীকৃত হ'ন না। তিনি আমাদের বলেছিলেন. যখন তাঁর কাছে এই প্রস্তাব ক'রলে. তখন ঘৃণায় তাঁর সর্বশরীর শিউরে উঠেছিল। তিনি তখন ভুলে গেলেন যে. ভিক্ষার অন্নে তাঁকে উদরপূর্ণ ক'রতে হয়—দোকানের এই সামান্য চাকরীটা গেলে তাঁর আর কোন উপায়ই থাকবে না। এক বেলা অনাহারেই কাটাতে হবে, কাপড়ের অভাবে দিগম্বর হ'তে হ'বে—এ কম কষ্টের কথা নয়। কিন্তু তখনই তাঁর প্রাণের মধ্যে থেকে কে ব'লে উঠল, ছি. ছি অমন কাজ কর না. জাল করা মহাপাপ। বার বছরের বালকের মনে তখন অমানুষিক বলের সঞ্চার হ'ল। তিনি সেই মুহূর্তেই দোকানের চাকরী ত্যাগ ক'রে চলে এলেন। সত্যের ওপর এই অবিচলিত শ্রদ্ধা, হৃদয়ের ভেতর দেবতার বাণী এই দিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। আর কোন দিন কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া না শিখেও, কাঙ্গাল হরিনাথ অদ্বিতীয় সাহিত্যিক ও অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন।

এইবার আমার লেখাপড়া শিক্ষার কথা বলি। পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে আমি পাঠশালার পরিবর্তে প্রথমেই বাঙ্গলা-স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের গ্রামে তখন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল ছিল। ইংরাজী স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনকার একটি গল্প ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের গ্রামের সে সময়ের সর্বপ্রধান ধনী পরলোকগত মথুরানাথ কুণ্ডু মহাশয়ের মুখে আমি শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—"আমাদের এ অঞ্চলের

মধ্যে ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষার জন্যে কোন স্কুল না থাকায়, আমি চেষ্টা করে ছোটখাট একটা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। আমাদের গ্রামের কৃষ্ণধন মজুমদার সেই সময় ঢাকা কলেজ থেকে সিনিয়ার পরীক্ষায় পাশ হ'ন, আমি তাঁকেই আমার স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করি। তখন আমাদের গৌরী নদী দিয়েই বড় বড় ষ্টীমার যাতায়াত কর্‌তো। রেলগাড়ী তখনও আমাদের দেশে আসেনি। লাটসাহেব ও বড় বড় রাজপুরুষেরা ষ্টীমারে করে পূর্ববঙ্গে যাবার সময় আমাদের গ্রামের নীচের নদী দিয়েই যেতেন। সেই সময় একদিন খবর পেলুম যে, হাত-কাটা গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ষ্টীমার করে এদিক দিয়েই যাবেন। তাঁকে পাক্‌ড়াও করবার জন্যে আমি আয়োজন করলুম। নদীর ভাঁটিতে ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে তাকে বলে দিলুম, দূরে ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখলেই সে যেন ঘোড়া জোরে চালিয়ে এসে আমাকে খবর দেয়। এদিকে আমি বারো দাঁড়ওয়ালা একখানা নৌকা সুন্দর করে সাজিয়ে নদীতীরে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার কোন অভ্যাস ছিল না। ইংরেজি ত দূরে থাক, বাঙ্গলা লেখাপড়াও আমি ভাল শিখিনি। কিন্তু আমার অতুল সাহস ছিল। আর সেই সাহসে নির্ভর করেই আমি বড়লাট সাহেবের ষ্টীমার আটক করতে গিছলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গভর্ণর জেনারেল সাহেবকে আটক করে, গ্রামে এনে, আমার ইংরাজী স্কুল দেখাতে পারবই। এই বিশ্বাসের জোরেই আমি সকালেই যতটা সম্ভব নানারকম বাঙ্গালীর খাদ্যসামগ্রী তৈরী করিয়েছিলুম।

"বেলা বারটার সময় ঘোড়সওয়ার এসে খবর দিলে—লাট সাহেবের ধুঁয়োকল আসছে। আমি তখন আমার সেই বার-দাঁড় নৌকা নিয়ে নদীর মধ্যে গেলুম। মাঝিদের উপদেশ দিয়ে রাখলুম, ধুঁয়োকল এগিয়ে এলেই ঠিক তার সামনেই যেন নৌকা নিয়ে চালিয়ে দেয়। আমি নিজে এক লাল নিশান হাতে করে নৌকার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। ধুঁয়োকল যখন নদীর বাঁক ফিরে আমাদের গ্রামের ঠিক সামনে এলো, আমি তখন মাঝ নদীতে নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে লাল নিশান দেখাতে লাগলুম। কোন বিপদের সম্ভাবনা মনে করে ধুঁয়োকল যেই থেমে গেল, অমনি মাঝিরা বারোখানা দাঁড় ফেলে ধুঁয়োকলের পাশে লাগিয়ে দিলে। ধুঁয়োকলের কর্মচারীরা ও লাট সাহেবের সঙ্গী সাহেবরা কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে, যে দিকে আমার নৌকা লেগেছিল, সেই দিকে এসে পড়লো। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে 'তোম কোন্ হ্যায়।' আমি ইংরেজি ত জানিই না, হিন্দিও জানতুম না। সাহেব যেই বল্লে 'তোম

কোন্ হ্যায়।' আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলুম 'আমি মথুর কুণ্ডু হ্যায়।' তখন আবার প্রশ্ন হো'ল 'ক্যায়া মাংতা।' আমি বললুম, 'লাট সাহেব মাংতা।' এই বলেই কোন আদেশের অপেক্ষা না ক'রে এক লাফে ধুঁয়োকলের ওপর চড়লুম। তখন একজন সাহেব ধুঁয়োকলের একটা কামরা থেকে বার হয়ে এলেন। আমি চেয়ে দেখলুম, তাঁর একখানা হাত কাটা। তখনই বুঝলুম ইনিই লাট সাহেব। আমি হাঁটু পেতে বসে দু'হাত তুলে তাঁকে সেলাম করলুম। লাটসাহেব ইংরাজীতে আমায় কি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর দিলুম—'হুজুর নো ইংলিস।' লাট সাহেব হেসে পাশের একজনকে কি বললেন। সে সাহেবটি বাঙ্গলা জানতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাও তুমি?' আমি তাকে বললুম—আমার নাম মথুর কুণ্ডু, এই পাশের কুমারখালি গ্রামে আমার বাস। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। আমার গ্রামের ছেলেরা ইংরেজি শিখতে পায় না, সেইজন্যে এক ইংরেজী স্কুল বসিয়েছি। লাট সাহেবকে সেই স্কুলে পায়ের ধূলো দিতে হবে।' সাহেবটি লাট সাহেবকে আমার প্রার্থনা জানালেন, লাট সাহেব হেসে আমার পিঠ চাপ্ড়ে বল্লেন—'ওয়েল কুণ্ডু, আই উইল গো নাউ।' তখন আর কি, লাট সাহেব ও তাঁর সঙ্গে পাঁচ ছ'জন সাহেব আমার নৌকায় উঠলেন। নৌকা এসে স্কুলের ঘাটে লাগল। সাহেব স্কুল দেখে খুসী হলেন। হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে আরও খুসী হলেন। তারপর বল্লেন, আমি কল্কাতায় ফিরে গিয়ে তোমার স্কুলের জন্যে যা করতে হয় করবো।' তখনও গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলের স্কুলের জন্যে কোন ব্যবস্থাই করেননি। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর কথা রক্ষা করে গিয়েছিলেন। তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় আমার স্কুলের কথা ভাল করে লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সেইজন্যেই লর্ড ডালহৌসির সময়ে যখন প্রথম মফঃস্বলের স্কুলে সাহায্য দেবার প্রথার প্রবর্তন হয়, তখন আমার স্কুলই প্রথম সাহায্য পেয়েছিল। আমার স্কুল দেখে লাট সাহেব যেই ষ্টীমারে যেতে প্রস্তুত হলেন, তখন আমি হাত যোড করে বল্লুম—'হুজুর একটু জলযোগ করতে হবে।' কৃষ্ণধনবাবু সেই কথা লাট সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি বললেন—'অল রাইট।' পাশের একটা ঘরেই টেবিলে নানারকম অন্ন-ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক, মিষ্টান্ন সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেব ও সঙ্গীরা এই আয়োজন দেখে মহা খুসী হলেন। যার যা ইচ্ছা খেতে লাগলেন। একটা জিনিষ লাট সাহেবের বড়ই মুখপ্রিয় হয়েছিল। একখানা থালাতে পোস্ত দিয়ে বকফুল ভেজে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেব তার তিনচারটে খেয়ে ভারী খুসী।

তিনি আমাকে বললেন—'ওয়েল মথুর কুণ্ডু, ভেরি গুড থিং।' তারপর তাঁরা চলে গেলেন। এই বকফুল ভাজা খাইয়েই আমি আমার স্কুলের জন্যে সাহায্য আদায় করেছিলুম।"

আমার পড়াশুনার কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ আমাদের গ্রামের ইংরাজী স্কুল কি রকমে আরম্ভ হ'ল তারই বিবরণ বললুম। এখন আমার বিদ্যারম্ভের কথা বলি।

আমি যখন প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন আমাদের গ্রামে একটা উচ্চ-ইংরাজী স্কুল, একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয়, আর দু' তিনটি পাঠশালা ছিল। এসব ছাড়া ৪।৫টি টোল ছিল। আমার বড়দাদা ত বাঙ্গলা স্কুলেই পড়েন নি। তাঁর শিক্ষারম্ভই ইংরাজী স্কুলে। মেজদাদা বাংলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হ'ন। আমার যখন স্কুলে পড়বার কথা হ'ল, তখন বড়দাদা ও মেজদাদার পরামর্শে জ্যাঠামশাই আমাকে পাঠশালায় না দিয়ে একেবারে বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সে সময় বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার। তিনিই পরে সাধক কাঙ্গাল হরিনাথ নামে দেশবিখ্যাত হয়েছিলেন। বাংলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে কি পড়েছিলাম না পড়েছিলাম, তা আমার মোটেই মনে নেই। আমার মনে পড়ে, যখন তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলুম। কারণ সেই সময় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়া পর্য্যন্ত আমাকে যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তা এখনও আমার মনে আছে। বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, এই তিন বিষয়ে আমি ক্লাসের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলুম। কিন্তু গোল বাঁধত অঙ্কের বেলায়। অঙ্কশাস্ত্র আমার কাছে বাঘের চেয়েও বেশী ভয়ের ব্যাপার ছিল। সে তিন বছরের মধ্যে এমন দিন যায় নি, যে দিন অঙ্কের মাষ্টারের কাছ থেকে বেতের মার বা কানমলা না খেয়েছি। এত নির্যাতনেও কিন্তু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার স্বর্গীয় কেদারনাথ জোয়ারদার আমার মাথার মধ্যে পাটিগণিত বা জ্যামিতি প্রবেশ করাতে পারেন নি। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন পূজনীয় হরিনাথ মজুমদার মহাশয় বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার ভার সুযোগ্য ছাত্র নর্মাল স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুলিনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ওপর দিয়ে নিজে বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির চেষ্টায় বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন। তা হ'লেও বাংলা-বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব ভার তাঁর ওপরেই ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার তিনিই সাহিত্যের পরীক্ষক হতেন। আমি সে সব পরীক্ষায় সাহিত্যে সকলের

চেয়ে বেশী নম্বর পেতুম। কিন্তু অঙ্কে যেবার ১০০র মধ্যে ৫ নম্বর পেতুম সেবার নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করতুম। কাঙ্গাল হরিনাথ যদি মাথার ওপরে না থাকতেন, তাহলে ঐ তৃতীয় শ্রেণীতেই আমাকে জীবন কাটাতে হ'ত। গণিতে এত বড় মুর্খকেও শিক্ষক মহাশয়েরা ওপরের শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতেন। সাহিত্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, সুতরাং হরিনথের কাছে আমার সাতখুন মাপ। এই কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমার প্রমোশন বন্ধ করতে পারেননি।

অঙ্কের শিক্ষক কেদার জোয়ারদার মশায় বেতের জোরে যা করতে পারেন নি, তা প্রধান শিক্ষক পুলিনচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের একদিনের একটা কার্যে সুসম্পন্ন হয়েছিল। তিনি একদিন আমাকে বিশেষ রকমে শাস্তি দেবার জন্যে এক সদুপায় অবলম্বন করেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে, সেদিন আমাদের ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতির পাঠ ছিল। তার আগের ঘণ্টাতেই সাহিত্য পড়া হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং আমি ক্লাসের সকলের উপরে ছিলুম। এখন স্কুলে একটা নিয়ম উঠে গেছে, কিন্তু আমাদের সময়ে সে নিয়ম ছিল! কোন ছাত্রকে শিক্ষক মহাশয় একটা প্রশ্ন করলে সে যদি উত্তর না দিতে পারে, আর তার পরেব ছাত্র সেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেয়, তাহ'লে তাকে সরিয়ে পরের ছাত্রই সেই স্থানে বস্তে পেত। এর প্রচলিত নাম ছিল ক্লাসে উঠা-নামা। অন্য দিন যখনই অঙ্কের ক্লাস আরম্ভ হ'ত তখনই আমি ভয়ে ভয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে একবাবে সকলের শেষে অর্থাৎ লাষ্ট গিয়ে বসতুম। সেদিনও তাই করেছিলুম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক যখন দেখলেন যে, আমি লাষ্ট ব'সে আছি, তিনি তখন আমার কান ধরে টেনে তুলে একবারে ফাষ্ট বসিয়ে দিলেন। সুতরাং প্রথমেই আমার ওপর জ্যামিতির প্রশ্ন হ'ল, আমি উত্তর দিতে পারলুম না। আমার পরে যে ছাত্র ছিল সে ঠিক উত্তর দিলে। তখন শিক্ষক মশায় আদেশ দিলেন যে, সে আমার দুই কান মলে ওপরে গিয়ে বসবে। এইভাবে ক্রমাগত আমার ওপর প্রশ্ন হ'তে লাগল, আর আমার নীচের ছাত্র সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার কান মলে ওপরে গিয়ে বস্তে লাগল। আমাদের ক্লাসে সেদিন আমরা ১৩ জন ছাত্র ছিলুম। ১২ জন ছাত্রের হাতে ২৪টা কানমলা খেয়ে, আমার হৃদয় মধ্যে গণিত-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সত্যিই নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সেই-দিন কানের যন্ত্রণায় আর অপমানে আমি দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করলুম, যে ক'রেই হোক আমি অঙ্কশাস্ত্র শিখবই শিখব। সত্যিই সেই কানমলা থেকেই আমার মাথার মধ্যে গণিতশাস্ত্র প্রবেশ লাভ করেছিল। তারই ফলে, পরে আমি মাইনর

পরীক্ষায় গণিতে পূর্ণ নম্বর লাভ করেছিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়ে, গণিতে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিলুম, আর এল, এ পরীক্ষার সময় জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে পূজনীয় অধ্যাপক গৌরশঙ্কর দে মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়েছিলুম। এল, এ পরীক্ষায়ও গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলুম। এখন যদিও অনেক ভুলে গিয়েছি, তবুও মনে আছে, আমি যখন জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন বাড়িতে বসে গণিতশাস্ত্র এত চর্চা করেছিলুম যে, সে সময়ের এম, এ ক্লাসের গণিতের সমস্ত পাঠ্য আমার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি তার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন তথা-কথিত সন্ন্যাস অবলম্বন করে লক্ষ্যভ্রষ্ট ধূমকেতুর মত হিমালয়ের কোলের ডেরাডুন সহরে উপস্থিত হয়েছিলুম, তখন সেখানকার Trigonometrical Survey আফিসের প্রধান Computor প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত অধুনাপরলোকগত পূজনীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় আমার গণিত-বিদ্যা পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মনে পড়ে আমার বিদ্যা পরীক্ষার জন্যে তিনি একটা জ্যামিতির প্রশ্ন আমাকে দেন, আমি ক্রমাগত তিনদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে ও তিন-শ রেখাঙ্কন ক'রে সেই উৎকট প্রশ্নের সমাধান করি।

আমার বাঙ্গলা স্কুলের পড়া আর বেশীদিন আগাল না। প্রথম শ্রেণীতে উঠেই আমার চোখের অসুখ এমন বেড়ে উঠল যে, গ্রামের ডাক্তার আমার পড়াশুনা একেবারে বন্ধ করার হুকুম দিলেন, আর যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বললেন। আমার পিসতুতো বড় ভাই স্বর্গীয় বঙ্কবিহারী ব্রহ্ম কলকাতায় থাকতেন। আমাদেরই গ্রামের নিকট-প্রতিবেশী নবকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ের কলকাতায় চাউলের কারবার ছিল, দাদা সেই আড়তের প্রধান গদিয়ান ছিলেন। আমার জেঠতুতো বড় ভাই তার আগের বছরেই গ্রামের ইংরাজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করে কলিকাতার ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে পড়তে এসেছিলেন। তখন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল লাইন কুষ্টিয়া পর্যন্ত গিয়েছিল। আর পদ্মাতীরে গোয়ালন্দ পর্যন্ত রেল লাইন করবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের যাত্রীদের কুষ্টিয়ায় নেমে নৌকো করে যেতে হ'ত। ষ্টীমার যাতায়াত তখনও হয়নি। জ্যাঠামশায় তখন বেঁচে ছিলেন, তিনি আমার পিসতুতো ভাইকে লিখে পাঠালেন। চিঠি পেয়ে বড় দাদা একদিন কলকাতা থেকে এসে আমায় সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আমি তখন বালক। কলকাতায় গিয়ে সেই বয়সে আড়তে কেমন করে থাকবো, এই

বিষয় চিন্তা করে জ্যেঠামশায় আমার পিসিমাকেও সঙ্গে পাঠাবেন, ঠিক করলেন। সেই সময়ে আমাদেরই প্রতিবেশী স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার সপরিবারে কলকাতায় থাকতেন। স্থির হ'ল যে, তাঁর বাসাতেই গিয়ে উঠবো। কোন সালের কথা তা আমার মনে নেই। আমরা একদিন বাড়ি থেকে নৌকো করে কুষ্টিয়ায় গিয়ে, সেখানে থেকে রেলে চড়ে কলকাতায় উপস্থিত হলুম। তারপর আমার চিকিৎসা আরম্ভ হ'ল। সে চিকিৎসার সব কথা পূর্বেই বলেছি।

হেকিমের চিকিৎসায় যখন আমার চোখের অসুখ সেরে গেল, তখন আবার লেখাপড়া শেখা আরম্ভ করতে হ'ল। কিন্তু এক মুস্কিলে পড়লুম। দু'তিন বছর আগে পড়াশুনা ছেড়েছিলুম, এখন দেখলুম বাঙ্গালা স্কুলে পড়া আরম্ভ করতে গেলে, আমাকে আবার তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়। আমার ছোট ভাই শশধর তখন বাঙ্গলা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছিল। আমি বড়দাদাকে বললুম, ছোট ভায়ের সঙ্গে এক ক্লাসে আমি পড়বো না। তিনি মহা ভাবনায় পড়লেন। তখন গোয়ালন্দে আমাদের বাসা ছিল না, বড়দাদাই পরের বাসায় থেকে চাকরী করতেন, সেখানে আমাকে কি রকমে রাখা যায়? শেষে স্থির হ'ল যে, গোয়ালন্দে একটা বাসা করে, বড়-বৌ আর দু' একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাহ'লে আমি গোয়ালন্দে গিয়ে নতুন মাইনর স্কুলে ভর্তি হ'তে পারি। তাতেও আর এক অসুবিধা উপস্থিত হ'ল। তখন আমার ইংরেজি বর্ণপরিচয়ও হয় নি। মাইনর স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে ভর্তি হয়ে, মাইনর পরীক্ষা দিতে গেলে, আমার বয়স ১৭।১৮ বছর হয়ে যাবে। আমি বড়দাদাকে বললুম, আপনি যদি রোজ সকালে ও সন্ধ্যার পর এক ঘণ্টা করে ইংরেজি পড়ান, তাহলে আমি দু'-মাসের মধ্যে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত ইংরাজী ভাষা শিখতে পারবো। বড়দাদা বললেন, সে কি সম্ভব, তোমার অক্ষর পরিচয় হয়নি, আর তুমি দু'-মাসের মধ্যে Moral Class Book পড়তে পারবে? আমি বললুম, নিশ্চয় পারবো। তারপর দু'মাসকাল আমি যে ইংরেজি পড়েছিলুম, সে কথা আমার এখনও মনে আছে। ঠিক দু'মাস পরে আমাকে যখন গোয়ালন্দ মাইনর স্কুলে ভর্তি করার জন্যে বড়দাদা নিয়ে গেলেন, তখন স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় আমায় ইংরেজি পরীক্ষা করে প্রশংসা করলেন ও আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই নিলেন।

তিন বছর গোয়ালন্দ স্কুলে পড়ে আমি মাইনর পরীক্ষা দিলুম ও ফরিদপুর জেলার সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে মাসিক ৫ টাকা বৃত্তিলাভ করলুম। সেই পরীক্ষায় আমি আরও একটা পুরস্কার পেয়েছিলুম। রাজবাড়ীর

রাজা সূর্যকুমার গুহরায়, ঢাকা বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় যে ছাত্র ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে তিনি একটি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে সেই পুরস্কার লাভ করেছিলুম। বড়দাদা মনেও করেননি যে আমি এমনভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ব। তিনি স্থির করেছিলেন যে কোন রকমে মাইনর পাশ করে আমি মোক্তারী পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'ব। তখন মাইনর পাশ করলেই মোক্তারী দেওয়া যেতো। সে সময়ে আমাদের যে অবস্থা, তাতে উচ্চ শিক্ষালাভের কল্পনা কারও মনে হয়নি। কিন্তু মাইনর পরীক্ষায় আমার কৃতকার্যতা দেখে বড়দাদা তাঁর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন। আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হ'ল।

পরীক্ষা দেবার আগে ফি দাখিল করবার সময়ে যে ফরম পূরণ করতে হয়, তাতে বৃত্তি পেলে কোন স্কুলে পড়বে, লিখে দিতে হয়। আমাদের হেডমাষ্টার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বসু মশায় আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই, বৃত্তি পেলে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়বো, এই লিখে দিয়েছিলেন। আর তিনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলেও আমি যে কোন স্কুলের কথা লিখে দিতে বলতুম, বলতে পারি না। কারণ আমি যে পরীক্ষায় পাশ হয়ে বৃত্তি পাবো, একথা স্বপ্নেও মনে করিনি। কোন রকমে পরীক্ষায় পাশ হ'য়ে মোক্তারী পরীক্ষা দেবো, এই আমার স্থির ছিল। সুতরাং যখন বৃত্তি পেলুম, তখন বিষম বিপদ উপস্থিত হ'ল। মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি নিয়ে ফরিদপুরের মত জায়গায় পড়ার খরচ চালান বড়দাদার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। মাসে আর তিন চার টাকা হ'লে, কোন রকমে ফরিদপুরে পড়া চলতে পারতো। কিন্তু সে তিন চার টাকা দেওয়াও বড়দাদার সাধ্যের বাইরে। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে আমাদের গ্রামের পরলোকগত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই মোহিনীবাবুই পরে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে কুষ্টিয়ায় 'মোহিনী মিল' স্থাপন করেন এবং সে মিল এখন বাঙ্গালা দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন কাপড়ের কল কয়টির অন্যতম হয়েছে। প্রথমে মনে করেছিলুম ফরিদপুরে গিয়ে তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করবো। কিন্তু একটা কারণে প্রথমে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়া হ'ল না।

গোয়ালন্দ স্কুল থেকে আমার সঙ্গে একটী ছাত্র মাইনর পাশ করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেন। তিনি বি-এ পাশ করে এখনও গোয়ালন্দেই ওকালতি করছেন। তাঁর বাবা উমেশচন্দ্র সেন তখন গোয়ালন্দের একজন বড়

উকিল ছিলেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনকে ফরিদপুরে পড়তে পাটালেন। দক্ষিণা ফরিদপুরে একটি মেসে বাসা স্থির করলেন আর আমাকে লিখলেন যে, তাঁর বাবা মাসিক তাঁর খরচের জন্যে ১৫ টাকা দিবেন ও আমার ৫ টাকা, এই ২০ টাকায় আমাদের দুই বন্ধুরই ফরিদপুরের পড়ার খরচ চলে যাবে। দক্ষিণারঞ্জনের সেই সাহায্য ও বন্ধুত্বের কথা আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও ভুলতে পারিনি। অযাচিত-ভাবে মোহিনীবাবুর গলগ্রহ হওয়ার চেয়ে বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের সাহায্য লওয়াই আমি শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম।

ফরিদপুরে গিয়ে দক্ষিণারঞ্জনের সেই মেসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, সেটা মেস নয়, ফরিদপুরের কালেক্টরীর এক কেরাণীর বাসা; তিনি কেরাণীগিরিও করেন আবার বাসার যে ঘরখানি রাস্তার দিকে, তাতে একটা মদের দোকানও খুলেছেন। পিছনদিকের তিনখানি ঘরে জনকয়েক ছাত্র আর কয়েকটী অফিসের কেরাণী নিয়ে বাসা বেঁধেছেন। বাসাটা এমন স্থানে যে, সে কথা মনে করলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়। বাসার পেছনেই বড় বেশ্যাপল্লী। একদিকে বেশ্যাপল্লী আর বামহাতেই মদের দোকান, আমার তো দেখেই চক্ষুস্থির! যখন সেখানে উপস্থিত হয়েছি, তখন হঠাৎ চলেও যেতে পারলুম না। সেখানেই রয়ে গেলুম, আর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলুম। তখন কালিদাস রায় মহাশয় ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয় শিক্ষকের নাম আমার মনে নেই, তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্রদেব রায়।

কোন রকমে দিন পনের সেই নরকে বাস করে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। মাতাল আর বেশ্যার গোলমাল অসহ্য হয়ে উঠেছিল। অন্য কোন উপায় না পেয়ে একদিন মোহিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি প্রথমে আমাকে চিনতে পারলেন না। কিন্তু যখন আমার পরিচয় দিলুম, তিনি উঠে এসে আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—"তুমি দ্বারীর ভাই, ফরিদপুরে এসেছ কেন?" আমি তখন আমার সমস্ত অবস্থা তাঁকে বল্‌লুম। তিনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন—"আরে সর্ব্বনাশ, বেশ্যাপাড়ার মধ্যে মদের দোকানে বাসা নিয়েচ! যাও, এখনি জিনিষপত্র নিয়ে এখানে চলে এস।" আমি বল্‌লুম, "এমাসের কটা দিন গেলে হয় না?" তিনি হেসে বল্‌লেন—"ওঃ বুঝেছি, বাড়ী থেকে টাকা না এলে বুঝি তাদের মেসের খরচা মিটিয়ে দিতে পারবে না বলে আসতে চাচ্ছ না? পনের দিন ত সেখানে আছ, বড় বেশী হয় তো তাদের ৪।৫ টাকা পাওনা হয়েচে।" এই কথা বলে তিনি

ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, আবার মিনিট তুই পরে বাইরে এসে আমার হাতে ১০, টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"এই টাকা দিয়ে যার যা দেনা আছে শোধ করে এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে চলে আসবে!" আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললুম—"আমার কাছে এখনও ৩।৪ টাকা আছে, তাতেই মেসের দেনা শোধ হয়ে যাবে।" তিনি বললেন—"বেশ তো, তা তোমার হাতেই থাকুক, এই টাকাটাই খরচ কর না। আজই তোমার দাদাকে চিঠি দিয়ে দাও যে, আজ থেকে তোমার এখানে পড়ার সমস্ত ভার আমি নিলুম", আমি কি বলবো ভেবে পেলুম না। তাঁকে প্রণাম করে উঠ্‌তেই, তিনি "তুমি সম্বোধন ছেড়ে বললেন—"ভাখ, তোর কোন সঙ্কোচের কারণ নেই। আমি তোর দাদা দ্বারীরও বড় ভাই। আমি তোর সাহায্য করতে বাধ্য। এটা আমার দান নয়, কর্তব্যকার্য্য।" এর ওপর আর কথা বলা চলে না। আমি তাঁকে প্রণাম করে বাসায় চলে এলুম। তখনই মেসের দেনা পাওনা শোধ করে দিয়ে, বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনকে সমস্ত কথা বলে, আমার সামান্য ক'খানি বই আর বিছানা নিয়ে মোহিনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হলুম।

মহতের আশ্রয় পেলুম বটে, কিন্তু এ আশ্রয়ে বেশী দিন থাকতে পারলুম না। মোহিনীবাবু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন হাকিমেরা কি করেন জানি না, কিন্তু সেকালে হাকিমেরা ১২।১টার আগে কেউ কাছারী যেতেন না। বিশেষতঃ মোহিনীবাবু পরমনিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, তাঁর পূজা আহ্নিক শেষ হতেই বেলা ১১টা বেজে যেত। তারপর আহারাদি সেরে তিনি কাছারী যেতেন। তাঁর বাসায় স্কুলের ছাত্র কেউ ছিল না। তাঁর বড় ছেলে শ্রীমান্ সত্যপ্রসন্ন তখন ৫।৬ বছরের বালক। সুতরাং মোহিনীবাবুর বাসায় ১০টার মধ্যে আহার করার সুবিধা হ'ত না। আমারও এমন সাহস হ'ত না যে, একটু সকাল সকাল রান্নার জন্যে তাগাদা করি। মোহিনীবাবুর গৃহিণীও সে কথা বুঝতে পারেন নি। কাজেই আহারের জন্যে অপেক্ষা করলে আমার স্কুলে যাওয়া দেরী হয়ে যেত। এই কারণে মাঝে মাঝে আমাকে অনাহারে স্কুলে যেতে হ'ত।

ঘটনাক্রমে একদিন মোহিনীবাবু এই কথা জানতে পারলেন। শুনলুম, সেদিন আহার করতে বসে তিনি বামুন ঠাকুরকে আমার ওপর দৃষ্টি রাখতে বললেন। ব্রাহ্মণ অসঙ্কোচে বলে ফেল্‌লে, "সকাল সকাল তো সব দিন রান্না হয়ে ওঠে না, তারি জন্যে স্কুলের ছেলেটিকে অনেক দিন না খেয়েই স্কুলে যেতে হয়।" এই কথা শুনে মোহিনীবাবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আর অন্ন স্পর্শ

করলেন না। অমন যে ধীর শান্ত মানুষ তাঁরও ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। তিনি চীৎকার করে বল্‌লেন—"এমন অপরাধের প্রতিবিধান না হ'লে, আমি এ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করবো না।" এই বলে তিনি বাইরে গিয়ে, অভুক্ত অবস্থায় কাছারীতে চলে গেলেন। তাঁর আর দেরী সইল না। তিনি কাছারীতে গিয়েই আমাদের হেডমাষ্টার হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখে তাঁর আরদালি পাঠালেন। আর আমাকে তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ছেড়ে দেবার জন্যে হেডমাষ্টারের অনুমতি চাইলেন। হেডমাষ্টার মশায় আমাকে লাইব্রেরীতে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—"ডেপুটী মোহিনীবাবু এখনি তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, এই আরদালির সঙ্গে এখনই যাও, আজ তোমার ছুটী।" এই কথা শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল, হঠাৎ আমকে কেন ডাকিয়ে পাঠালেন কিছুই বুঝতে পারলুম না।

গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে কাছারী বেশী দূর নয়। আমি এক রকম কাঁপতে কাঁপতে আরদালির অনুসরণ করলুম। আরদালির সঙ্গে এজলাসে ঢুকতেই মোহিনীবাবু বিচার আসন ছেড়ে নেমে এলেন। আমার হাত ধরে নিজের খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। মনের আবেগে তখন তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রথমে কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে বল্‌লেন—"দ্যাখ জলধর, তুই যে অনেক দিন না খেয়ে স্কুলে আসিস্, এ কথা একদিনও আমায় বলিস্‌নি! এ যে আমার কি অন্যায়, কত অপরাধ হয়েছে, তা তুই ছেলেমানুষ বুঝবিনি। আজই এ কথা আমি শুনচি আর তোরই মত না খেয়ে কাছারীতে এসেচি। তুই কিছু মনে করিসনি, এমন আর কখনও হবে না।"

সেই থেকে যথাসময়ে আমার আহারের ব্যবস্থা হোল। আমি কিন্তু এতে বিশেষ অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। মোহিনীবাবু দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন: তাঁর ওপর এই ভাবে আবদার করা কিছুতেই আমার মনঃপূত হোল না।

আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সেটা ইংরাজী ১৮৭৬ সাল। তখন ফরিদপুরে রেল যায় নি। ষ্টীমার ষ্টেশন ছিল কিনা ঠিক মনে নেই আর থাকলেও, আমার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ষ্টীমারের ভাড়া দিয়ে মাঝে মাঝে গোয়ালন্দে আসি। বাড়ী যাবার দরকার ছিল না; কারণ, আমার যাঁরা আপনার জন, তাঁরা সকলেই তখন গোয়ালন্দে থাকতেন। দেশের বাড়ীতে আমার পিসীমা আর পিস্‌তুতো ভায়ের স্ত্রী বাস করতেন। আমি প্রতি শনিবার ফরিদপুর থেকে গোয়ালন্দে

আসতুম, আর সোমবারে অতি ভোরে যাত্রা করে যথাসময়ে স্কুলে পৌছতুম। তখনকার গোয়ালন্দ ফরিদপুর থেকে ন' ক্রোশ রাস্তা, আমি প্রতি শনিবার স্কুলের পর ১৷৷. টার সময়ে বাহির হয়ে রাত্রি ৭৷৮ টার মধ্যে অতিক্রম করতুম। পনের বছর বয়েসের এই পথ চলার অভ্যাস, পরের কালে আমার অনেক কাজে লেগে গিয়েছিল।

এক শনিবারে গোয়ালন্দে এসে আমার অসুবিধার কথা জ্যেঠাইমা ও বৌদিদিকে বললুম। বড়দাদাকে কোন কথা বলার সাহস হ'ত না। বৌদিদি বড়দাদাকে সমস্ত কথা বলায়, তিনি আমাকে ডেকে বললেন—"ফরিদপুরে থেকে কাজ নেই, তুমি বাড়ী গিয়ে কুমারখালি স্কুলেই পড়া আরম্ভ কর। বাড়ীতে পিসীমা আছেন, তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি এইবার ফরিদপুরে গিয়েই তোমার স্কলারশিপ্ কুমারখালিতে ট্রান্সফার করবার আবেদন ক'র, আর তা মঞ্জুর হলেই চলে এসো।"

ফরিদপুরে ৩।৪ মাস থাকার পরই আমি কুমারখালিতে চলে' এলাম। তখন আমাদের গ্রামের স্কুলের অবস্থা অতি শোচনীয়। পূজনীয় কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় তখন প্রধান শিক্ষক, প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় দ্বিতীয় আর ব্রজনাথ মৈত্রেয় মহাশয় তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। যখন কুমারখালি স্কুলে ভর্ত্তি হলুম, তখন স্কুলের অবস্থা এত শোচনীয় যে তার আগের পাঁচ বছর একটি ছাত্রও প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হয়নি। স্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, সংস্কৃত পড়বার কোনই ব্যবস্থা নেই। বাংলা ভাষাতেও প্রবেশিকা দেওয়া যেত, অগত্যা আমি বাংলাই নিলুম। তার ফল যে কি বিষম হয়েছিল, তা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে' হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। সে যথাসময়ে ব'লব।

কুমারখালির স্কুলের প্রথম দু'বছর যা পড়েছিলাম, সে কথা বলে আমার পূজনীয় পরলোকগত শিক্ষক মশায়দের স্মৃতির অপমান করব না। বলতে গেলে, পড়াই হ'ত না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে হেডমাষ্টার মহাশয় মধ্যে মধ্যে এক-আধ ঘণ্টার জন্যে Translation শিখাতে আসতেন, সেইটুকুই যা শিক্ষা। হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় সেকালের Senior পাশ ছিলেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক শিক্ষক দেখেছি, কিন্তু আমার মনে হয়, ইংরাজী স্কুলে সে সময়ে তাঁর মত ইংরাজীনবীশ খুব কমই ছিল। তিনি তখন এতই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, যথাসময়ে স্কুলে আসতে পারতেন না, আর ইংরাজি সাহিত্য যা পড়াতেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করার সাহায্য করত না। তাঁর দৃষ্টি ছিল, ইংরাজি

ভাষা ও ইংরাজি লিখন পদ্ধতি শিখাবার দিকেই। তাঁর আদর্শ ছিল, Addision আর Johnson। সুতরাং তাঁর ছাত্রেরা সেকালের ইংরাজি বেশ শিখত, পরীক্ষার পাশ করার শিক্ষা মোটেই পেত না। এই কারণেই তার আগের পাঁচ বছর একটি ছাত্রও পাশ করতে পারে নি।

আমরা যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠলাম, সেই সময়ে স্কুলের একটা পরিবর্তন হ'ল। প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণধন মজুমদার মশায় অবসর গ্রহণ করলেন, আর দ্বিতীয় শিক্ষক প্রসন্নকুমার সান্যাল মশায় কমিটি পরীক্ষা পাশ করে ফরিদপুরে ওকালতি করতে গেলেন। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকেরাও অনেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তখন প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন নীললোহিত মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হলেন শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী। এঁরা ৩।৪ মাস শিক্ষকতা করেই চলে গেলেন। নীললোহিতবাবু মুনসেফি নিলেন, শ্রীনাথবাবু কুষ্টিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার হলেন। তাঁদের পরিবর্তে হেড মাষ্টার হয়ে এলেন অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে এলেন উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম। অভয়াবাবুর বাড়ী কলকাতার কাছে পানিহাটিতে। তিনি আজন্ম পশ্চিমে ছিলেন ও লক্ষ্নৌ ক্যানিং কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি দেশে চলে আসেন ও সেই সময় আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টারী পদ খালী হওয়ায় তিন বছরের এগ্রিমেণ্টে ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হ'ন। অভয়াবাবুর ইংরাজি খুব দুরন্ত ছিল। তিনি যখন ইংরাজী, হিন্দি ও উর্দ্দুতে কথা বলতেন, তখন কেউই তাঁকে বাঙ্গালী বলে মনে করতে পারতেন না। আমাদেরই সৌভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ৪।৫ মাস আগে এমন হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার পেয়েছিলাম। বলতে কি, এই ৪।৫ মাসে তাঁরা যা শিখিয়েছিলেন, তা অন্য কেউ ৪।৫ বছরেও শিখাতে পারতেন না। তাঁদেরই শিক্ষার গুণে পাঁচ বছর পরে কুমারখালি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র পাশ হ'ল। আমরা চার জন ছাত্র সেবার পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তার মধ্যে যে দু'জন পাশ করি সেই দু'জনই এখনও বেঁচে আছি। একজন শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দে, পাবনার সব জজ অফিসে সেরেস্তাদারি করে অল্পদিন হ'ল অবসর নিয়েছেন। আর দ্বিতীয় জন আমি। রাধাবল্লভ তৃতীয় বিভাগে আর আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল অতি শোচনীয় হয়েছিল। তা না হ'লে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেও, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলের ছাত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (ডি. এল. রায়ের) সঙ্গে ব্রাকেটে ১০৲

টাকা বৃত্তি পেতাম না। কুমারখালি স্কুলের ভাগ্যে ১২ বছর পরে এই বৃত্তি লাভ, আর সে সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল।

যে তিন বছর বাড়ীতে ছিলাম, সে সময় আমার অতিকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। পিস্‌তুতো ভাই কলকাতায় চাকরী করতেন, এ কথা আগেই বলেছি। বাড়ীতে তখন পিসিমা, পিস্‌তুতো ভাইয়ের স্ত্রী আর তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল। এদের খরচের জন্য আমার পিসতুতো ভাই মাসে ১৬৲ টাকা করে দিতেন। সেই ১৬৲ টাকা থেকে তাঁর স্ত্রী, আমাদের বড় বৌ, প্রতি মাসে ২।৩ টাকা করে সরিয়ে রাখতেন। সুতরাং সংসার খরচ ১৩।১৪ টাকার মধ্যে কুলাতে হ'ত। সে সময় আমার বড় দাদা বাড়ীতে কোন খরচ পাঠাতেন না, অথচ আমার পিসিমার উপরই সংসার চাপিয়ে দিলেন। অবশ্য খাবার জিনিষ চাল, ডাল, ঘি, তেল, ময়দা সবই অতি সস্তা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, আমরা ১৷৹ কি ১৲ টাকা দশ আনা মণের মোটা চাল খেতাম। তরিতরকারীও সস্তা ছিল। তা হ'লেও ঐ কটা টাকায় একটা সংসার চলে না। কাজেই আমাদের খাওয়াদাওয়ার অত্যন্ত কষ্ট হ'ত। আমার বেশ মনে আছে, রবিবার ও ছুটীর দিন ছাড়া রোজ স্কুলযাবার সময় মোটা চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে ছাড়া আর কিছুই খেতে পাইনি। অনেক দিন আবার তাও জুটত না, অনাহারে স্কুল যেতে হত। চারটার পর স্কুল থেকে ফিরে এসে দুপুরের রান্না ভাত-তরকারী খেতাম। রাত্রিতে রান্নাও হ'ত না, আমিও খেতে পেতাম না। দাদার মেয়েরা ও বড় বৌ দুপুরের রান্না ভাতই সন্ধ্যার আগে খেত। সে সময় অনেক দিন আমার একাহারই হ'ত। আমার এ কষ্টের কথা আমি কোন দিন কাউকেও জানাইনি। মা, জ্যেঠাইমা, আমার বড় দাদার স্ত্রী এঁরা এ কথা শুনলে মনে কষ্ট পাবেন ভেবে আমি নীরবেই সমস্ত সহ্য করতুম।

মাইনর পরীক্ষায় মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলাম, সে টাকারও হিসাব দিচ্ছি। যারা বৃত্তি পায় গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তাদের মাইনে দিতে হয় না। আমি ফরিদপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে মাইনা দিই না। গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মাইনা দিতে হয়। কুমারখালি স্কুলের উচ্চ তিন শ্রেণীতে তখন মাসিক ১৷৹ মাইনা ছিল। আমার বৃত্তি থেকে মাইনার জন্যে ১৷৹ খরচ হোত। আমার মা, বিধবা বোন ও ছোট ভাই তখন গোয়ালন্দে বড় দাদার কাছে থাকতেন, তাঁদের খরচ বড় দাদাই বহন করিতেন। তা হ'লেও আমি বেশ বুঝতে পারতাম, তাঁদের দু'চার পয়সা কোন কারণে দরকার হোলে বড় দাদা বা বৌদিদির কাছে চাইতে

তাঁরা সঙ্কোচ বোধ করতেন। এই কারণে আমি প্রতি মাসে বড় দাদা ও বৌদিদির অজ্ঞাতে মাকে ৩৲ টাকা পাঠিয়ে দিতাম। মা অনেকবার বারণ করেছিলেন্ কিন্তু আমি তা শুনিনি। ৫৲ টাকা বৃত্তির ৪।৹ টাকার ত হিসাব দিলাম, বাকি রইল বার আনা। আমার কেমন একটা বদ অভ্যাস ছিল, এবং এখনও আছে যে, সম্পূর্ণ নির্জ্জ নাহ'লে আমি লেখাপড়া করতে পারি না। ছাত্রাবস্থায় আমি কোন দিন দিনের বেলা লেখাপড়া করতাম না। আমার পড়ার সময় ছিল রাত্রিবেলা। আমি রোজ রাত্রি ৮টার পর পড়তে বসতাম, আর ১২।১টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করতাম। কোন কোন দিন এমন তন্ময় হ'য়ে যেতাম যে, কোন দিক দিয়ে যে রাত্রি প্রভাত হ'ত তাও জানতে পারতাম না। সারা রাত্রি পড়তে গেলে আলোর দরকার। আমি আমার সেই বার আনা পয়সা তেল কিনেই খরচ করতাম। দু'চার পয়সা যা বাঁচাতাম তা এদিক ওদিক খরচ হয়ে যেত। কাগজ, কলম, পেনসিল বড় দাদা গোয়ালন্দ থেকে মাঝে মাঝে পাঠাতেন, পাঠ্যপুস্তকের অধিকাংশই পরের কাছ থেকে চেয়ে পড়তাম। মনে আছে সহপাঠিরা যে সমস্ত বই ছাড়তে চাইত না, আমি তাদের বাড়ীতে বসে পড়া শেষ করতাম, আর না হয় সমস্ত বইগুলি নকল করে আনতাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম। অভাবনীয় সৌভাগ্যবলে ১০৲ বৃত্তিও পেলাম। কিন্তু তারপর? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদন পত্র দাখিল করবার সময় লিখে দিতে হয়, যদি বৃত্তি পাই কোথায় পড়ব। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের সেই সময়ের প্রধান শিক্ষক অধুনা পরলোকগত অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ওরে, তুই যদি স্কলারসিপ পাস কোথায় পড়বি? সেটা যে এখনি লিখে দিতে হবে!' আমি হেসে বলেছিলাম, যে স্কুলের ছেলেরা ছ' বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি, ১২ বছর কেউ বৃত্তি পায়নি সেই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস হওয়াই অসম্ভব, তার আবার, বৃত্তি!, অভয়াবাবু বললেন—'তা বললে কি হবে, ওটা লিখে দেওয়া দস্তুর।' আমি বল্‌লাম, তা হ'লে লিখে দিন Civil Engineering College. আমার তখন গণিত শাস্ত্রের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, তাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা মনে হয়েছিল। আমি জানতাম, বৃত্তি আমি পা'ব না। যখন লিখে দিতে হবে, তখন আর ছোট কথা লিখি কেন; তাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা লিখেছিলাম। এটা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা।

তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়নি, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। লিখতে হ'ত Presidency College, Calcutta, C. E. Department.

মাসিক ; ১০, টাকা বৃত্তি পেয়ে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়া বাতুলের স্বপ্ন, ১০, টাকায় যে কলকাতায় থেকে সাধারণ কলেজেই পড়া হয় না। আমাদের গ্রামের অনেক বড় মানুষের কলকাতায় কারবার ছিল, এখনও আছে। কলকাতার হাটখোলায় তাঁদের বড় বড় আড়ত ছিল। আমি গ্রামের অনেক বড়মানুষেরই দ্বারস্থ হলাম, তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে থেকে দুই বেলা মুষ্টি অন্নের প্রার্থনা করলাম। কিন্তু কেহই এই দীন দরিদ্র শিক্ষার্থীর কাতর নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না, কেহই একটু স্থান বা দুটি অন্ন দিতে স্বীকার করলেন না। Engineering College Session জুন মাসে আরম্ভ হ'ত। আমার পরীক্ষার ফল ডিসেম্বর মাসেই বাহির হয়েছিল। আমি জুন মাসের প্রতীক্ষায় বাড়ীতেই বসে রইলাম। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের আশা ত্যাগ করতে পারলাম না। নির্ভর করলাম ভগবানের ওপর।

এই সময় আমার সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া গেল। কলিকাতা সিটি কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় আমাদের গ্রামেরই লোক। তিনি সেই সময় বি-এ পাস ক'রে এম-এ পড়ছিলেন। তিনি আমার বড়দাদার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কি একটা উপলক্ষে হেরম্বদাদা কুমারখালি গিয়েছিলেন। সেখানে আমার বড় দাদার বাড়ীতে ছিলেন। হেরম্বদাদা শুনলেন যে, আমি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার অসাধ্য সাধন করবার জন্য বাড়ীতে বসে আছি। তিনি বড় দাদাকে বুঝালেন যে আমাদের মতন দরিদ্র লোকের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ব্যয়ভার বহন করা একবারেই অসম্ভব। তিনি আমাকে জেনারেল লাইনে প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যে পরামর্শ দিলেন। বললেন, '১০, টাকা স্কলারসিপ আছে, আর ৪।৫ টাকা হ'লেই কলকাতার ব্যয় চলে যাবে। এবং কলকাতায় গিয়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরলে বিনা বেতনে তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হ'বার সম্ভাবনা আছে।' বড় দাদাও সেই কথাই বুঝলেন। আমাকে বললেন, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের চেষ্টা অসাধ্য সাধন। তার চাইতে তুমি আর্ট কলেজেই প্রবেশ কর। আমি যেমন কোরে পারি, যত কষ্টই আমার হোক না কেন, তোকে মাসিক ৪।৫ টাকা দেবো।' তখন আর কি করি, বড় দাদার আদেশ শিরোধার্য্য কো'রে আমি কলকাতায় আসলাম।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের গ্রামের অনেক বড় মানুষের কলকাতায় আড়ত আছে। তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে যখন দু'বেলা দু'মুঠি অন্নের সংস্থান কলকাতায় করতে পারলাম না, তখন কলকাতায় গিয়ে দু'চার দিনের জন্যেও তাঁদের দ্বারস্থ হ'তে আমার মত দীন দরিদ্রেরও কুণ্ঠা বোধ হো'ল। তাই বাড়ী থেকে বেরুবার পূর্বেই আমার এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে হোল। গোয়ালন্দে আমি তার সঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গেই মাইনর পাশ করেছিলাম। তার সহায়তায় নির্ভর করেই ৫৲ টাকা বৃত্তি সম্বল কো'রে ফরিদপুর জেলা স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। তার নাম দক্ষিণারঞ্জন সেন, তিনি তখনকার গোয়ালন্দের খ্যাতনামা উকিল উমেশচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র। আমি ফরিদপুর ছেড়ে দেশের স্কুলে চলে এলাম, দক্ষিণা ফরিদপুরেই পড়তে লাগলো। আমি যে বছরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম, দক্ষিণাও সেই বছরে ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ হয়েছিল এবং কলকাতায় এক মেসে থেকে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসানে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজে) প্রবেশ করেছিল। কলেজে ভর্ত্তি হয়েই, তিনি আমাকে পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তার ঠিকানা ছিল, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। বাড়ীটার কথা মনে আছে কিন্তু নম্বর মনে নেই। আমি বাড়ী গিয়ে দক্ষিণাকে লিখলুম, আমি অমুক দিন কলকাতায় যাচ্ছি। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর পড়া হো'ল না, আমি এল এ পড়বো। কলকাতায় আমার অন্য পরিচিত থাকলেও, আমি দু'এক দিনের জন্যে তার আতিথ্য গ্রহণ করবো। সে যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসে।

যথাসময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে দেখি দক্ষিণা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার ইচ্ছা ত্যাগ করেছি, সেজন্য সে খুব ধন্যবাদ করলে। সে রাত্রি তার বাসায় কাটালাম। তার পরেও দু'দিন তার বাসায় যত্নে ও আদরে ছিলাম। এইখানেই আমার পরম বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের কথা শেষ করতে চাই।

কলেজে প্রবেশ করলাম। বৃত্তি পেয়েছিলাম বলে প্রবেশিকায় ফী দিতে হল না। মাইনেও ছয় টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা হল। হাটখোলায় বন্ধুর আড়তে আশ্রয়ও পেলাম। আড়তের হিসাবে আমার বাসা খরচ ব'লে' মাসিক তিন টাকা দেওয়া স্থির হয়ে গেল। আড়তের কর্ত্তা রামলালবাবু বল্লেন—বুঝলে জলধর, ও তিনটে টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না। আমরাই মাসে মাসে

জমা ক'রে দেব। অর্থাৎ কাগজপত্তরে খোরাকী দেবার কথা থাকলেও, আমাকে তা' দিতে হবে না—এই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

এদিকের ত সব ঠিক হয়ে গেল। গোল বাধ্‌ল পড়াশুনো নিয়ে। ইংরাজি সাহিত্যে যে খান-দুই বই পড়া হচ্ছিল, তা' একটি বন্ধু দিলেন। সেগুলি তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন বি-এ পড়েন। লজিক ফিলজফি ও হিষ্ট্রি তাও কিনতে হ'ল না। এর ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। কিনতে হল—নবীন পণ্ডিতের বিশালকায় রঘুবংশ, আর কার সঙ্কলিত নাম মনে নেই—ভট্টিকাব্য। এই বই দু'খানি দেখেই আমার চক্ষুস্থির। সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় এই দুইখানি কাব্য পড়তে হবে কিনা শ্রীজলধর সেনকে—যার দেবনাগরী বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয়নি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত উপক্রমণিকার 'গো' শব্দের যে কি 'রূপ', তাও তার চক্ষু বা কর্ণগোচর হয়নি।

কথাটা একটু খুলে বলি। আমাদের গ্রামের স্কুলে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পরীক্ষা দেওয়া যেত। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পৌরহিত্য তাঁহার ব্যবসায় ছিল। যজমানের বাড়ী গিয়ে ক্রিয়া-কলাপের জন্য যতটুকু বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন—তা' তাঁর ছিল। আমাদের গ্রামে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং আমরা যখন পড়ি, তখন তিনি খুব বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য যতটুকু জ্ঞানের দরকার, পণ্ডিত মহাশয়ের তা' ছিল না। তাঁকে স্কুল থেকে সরিয়ে দেবার চিন্তাও কারও মনে হত না, তাঁকে গ্রামের লোকে এতই শ্রদ্ধা করত। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টা ছিল আমাদের বিশ্রামের সময়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্লাসে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে—'ওরে গোল করিস্ নে সব পড়, পড়'—বলে' নিদ্রা দেবীর শরণ নিতেন। আমরা কিন্তু স-জাগই থাকতাম। যেই দেখতাম হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের ক্লাসের দিকে আসছেন, অমনি কেউ না কেউ তাঁর চেয়ারে একটু ঠেলা দিতাম—তাই ছিল হেডমাষ্টার মহাশয়ের আগমনের সঙ্কেত। পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে পা নামিয়ে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন—বানান কর বেটা, তীক্‌ষন'।

হেডমাষ্টার মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করে' বলতেন—ঈশ্বর, ওদের ভাল করে বাংলা পড়িও। হরিনাথের (কাঙাল) নাম যেন রক্ষা করতে পারে। পণ্ডিত

মহাশয় সোৎসাহে বলতেন—সে খুব পারবে। পণ্ডিত মহাশয় অপেক্ষাও বয়োবৃদ্ধ হেডমাষ্টার মহাশয় পরিদর্শনকার্য্য শেষ করে' চলে যেতেন। এইভাবে ইংরাজী স্কুলে সুদীর্ঘ তিন বৎসর বাংলাভাষা শিক্ষা করেছিলাম।

তাতে আমার, কিছু ক্ষতি হয়নি। কাঙাল হরিনাথের কৃপায় আমি তখন বাংলা সাহিত্যের রথী মহারথী না হয়ে থাকলেও, বড় রকম জমাদার হয়ে পড়েছিলাম, এবং তারই জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় আমি বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক ছিলেন।

কলেজে প্রবেশ করবার পর একদিন তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, তিনি হেসে বলেছিলেন—'দূর জলধর, হরিনাথ মজুমদার মশায়ের নামই ডুবিয়েচিস্। বাংলায় ফার্ষ্ট হ'তে পারিস্ নি। ফার্ষ্ট কে হয়েচে জানিস্? কাদম্বিনী বোস।' ইনিই পরে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যশস্বিনী চিকিৎসক হয়েছিলেন, এবং সে সময়ের প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক সাহিত্যিক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

সে কথা থাক। আমি যে কলেজে পড়তে এসে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—তারি কথা ব'লি। কলেজে পড়তে আসবার সময়ে আমার অভিভাবকগণের কারও মনে হ'ল না যে, আমি অসাধ্য সাধন করতে যাচ্ছি। দেবনাগরি অক্ষর পরিচয় যার নেই, সংস্কৃত ব্যাকারণের প্রথম পৃষ্ঠাও যে পড়েনি, তার হাতে একেবারে উঠল কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ রঘুবংশ ও ভট্টি।

অভিভাবকেরা হয়ত মনে করেছিলেন, যে ছেলে পাড়াগাঁয়ের একটা এঁদো স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বৃত্তি পেয়েছে, সে একেবারে চতুর্ভুজ, তার শক্তি অসাধারণ। আমি কলজে প্রবেশ ক'রে চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

সকল বিষয়েই আমি কাঁচা। সংস্কৃতে ত একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন। যা একটু জোর ছিল—গণিতশাস্ত্রে। আমি যখন কলেজে প্রবেশ করি, তখন ফার্ষ্ট আর্টস কেন, বি-এর গণিতশাস্ত্রও আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে তো কুলোবে না বন্ধু! বিশ্ববিদ্যালয় যে মণিহারির দোকান! প্রত্যেক দ্রব্যটি চক্চকে ঝক্ঝকে করে' রাখা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি নিয়ম থাক্ত—যার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে শুধু সেই বিষয়েই পরীক্ষা দিতে পারবে, তা' হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সেও গর্ব করে' বলতে পারি যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দু-তিন বৎসরের মধ্যেই গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আমি এম-এ, পাস করতে পারতুম।

তাতো হ'ল না—আমি সংস্কৃতের অকূল পাথারে ভাসতে ভাসতে এল-এ ফেল করে' নামকাটা সেপাই হয়ে বেরিয়ে এলাম। চেষ্টার ত্রুটি করিনি। অসাধারণ পরিশ্রম করেছি। এমন কি পরীক্ষার পূর্বে এক একদিন কোন্ দিক দিয়ে রাত কেটে যেত, তা জানতেও পারতাম না। তারপর থাকি আড়তে। সেই বেলা ন'টার সময় ডাল ভাত, কোনদিন একটু তরকারি, কোনদিন বা তাও নয়, এই খেয়ে কলেজে ছুটতাম, আর ওদিকে রাত্তির ১২টার আগে আড়তের খাওয়া হ'ত না। এই পরিশ্রম আর এই আহার শরীরে সইবে কেন?

পরীক্ষার দুইদিন পূর্বে জ্বরে পড়লাম, সেই জ্বর-গায়েই ক'দিন পরীক্ষা দিলাম। কি যে লিখলাম—তা, ভগবানই জানেন। অতি কষ্টে পরীক্ষা শেষ হ'লে, বাড়ী চলে' এলাম। যখন পরীক্ষার ফল বের হ'ল, তখন সংবাদ নিয়ে জানতে পারলাম, আমি সংস্কৃতে তিন নম্বরের জন্য ফেল হয়েছি। রঘুবংশের কাগজে ২৩ নম্বর পেয়েছিলাম। কারণ পরীক্ষক রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জ্জি অনুবাদ বড় ভালবাসতেন। সংস্কৃতে বিদ্যা না থাকলেও, অনুবাদের জোরেই বেশী নম্বর পাওয়া যেত। তাই আমি ২৩ নম্বর পেয়েছিলাম।

আর ভট্টিকাব্যের পরীক্ষক ছিলেন—নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়। তিনি বোধ হয় বিশেষ অনুগ্রহ করে' আমাকে ৭ নম্বর দিয়েছিলেন। দুয়ে জড়িয়ে ৩০ হ'ল। ৩৩ না হলে পাস হয় না। আমি ফেল হলাম।

কলেজে গিয়ে দেখা করতে গণিতের অধ্যাপক খ্যাতনামা গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় অনেক দুঃখ করলেন, কারণ গণিতে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবও দুঃখ প্রকাশ করে' বললেন, "তুমি আর এক বৎসর পড়, আসছে বার নিশ্চয়ই পাস হবে। তোমাকে কলেজের মাইনে দিতে হবে না।"

আড়তওয়ালারাও আর এক বছর আমার অন্ন সংস্থান ক'রে দিতে চাইলেন। কিন্তু তা' আর হ'ল না।

আমার ছোট ভাই শশধর সেইবারই গ্রামের স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বড়দাদা ও মেজদাদা উভয়েই প্রস্তাব করলেন যে, আমি আর এক বছর পড়ি। শশধরের আর পড়ে কাজ নেই। সে নিম্নশ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হোক। তখন প্রবেশিকা পাস করেও ওকালতি পরীক্ষা দেওয়া যেত। শশধরেরও সেই মত হ'ল।

আমি কিছুতেই এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলাম না। আমার একমাত্র ছোট ভাই—তাকে তিন মাসের রেখে বাবা মারা যান। যেমন করে হোক, তাকে

লেখা পড়া শেখাব। বড়দাদা আমাকে অনেক বোঝালেন। আমি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।

আমি যেমন তেমন একটা চাকরি নিয়ে শশধরের কলেজে পড়বার ব্যয় চালাব। আমার এই দৃঢ় সঙ্কল্পে কেহই বাধা দিতে পারেন নি। বড়দাদা তখন গোয়ালন্দের ফৌজদারি আদালতের পেস্কার। তারপর তিনি সেখানে হেড-ক্লার্কও হয়েছিলেন। তিনি সেই সময়ে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে পাবনায় কি একটা কাজে গিয়েছিলেন। সেইখান থেকেই আমাকে সংবাদ দিলেন, যে, গোয়ালন্দ স্কুলের থার্ড মাষ্টারী খালি আছে। তিনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আমাকে ২৫৲ টাকা বেতনে থার্ড মাষ্টারীতে নিতে স্বীকার করেছেন।

সে গোয়ালন্দে কৈশোর কাল কাটিয়েছি, যে গোয়ালন্দ স্কুল থেকে সর্বপ্রথম মাইনর পাস করে ৫৲ পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলাম--সেই স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হওয়ার বছর ২।৩ পরে আমি সেখানেই মাষ্টার হয়ে গেলাম।

গোয়ালন্দে আমাদের একটা বাড়ী ছিল। সেটা দাদা নিজেই তৈরী করিয়েছিলেন। দাদা পাবনায় চলে' যাওয়ায় সে বাড়ী বন্ধ ছিল। তিনিই ব্যবস্থা করে' পাঠালেন যে, রেজেষ্ট্রী অফিসে হেড ক্লার্ক ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাসায় আমি থাকব। দাদার ফিরে আসতে তখনও দুই মাস বিলম্ব ছিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই লোকনাথ তখন ওখানকার স্কুলের ফোর্থ মাষ্টার।

আমি গোয়ালন্দে গিয়ে ব্রজেনবাবুর বাসায় উঠলাম। তখন স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন—অধুনা পরলোকগত মদনমোহন সরকার মহাশয়। তিনি মাইনর স্কুলেরও হেড মাষ্টার ছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেই মাইনর পাশ করি।

স্কুল এণ্ট্রান্সে পরিণত হওয়ার পর তিনিই হেডমাষ্টার হন। তখন আর কি। ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই মিলিয়ে গেল। 'হেন করব—তেন করব—স্বদেশের সেবা করব—বাংলা সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করব। কাঙাল হরিনাথের উপযুক্ত শিষ্য হবার জন্য প্রাণপাত করব। চিরকুমার জীবন অতিবাহিত করব।' ইত্যাদি কত সকল্প মনে মনে ছিল। এল-এ ফেল করে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি পাড়াগাঁয়ের এক স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক হলাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম—কঠোর কর্তব্যের কাছে আমি আত্মনিবেদন করলাম। নইলে আমার ছোট ভাইয়ের

লেখাপড়া শিখবার কোন পন্থাই আর ছিল না। বড়দাদা, মেজদাদার সামান্য আয়ে সংসার চলাই কঠিন ছিল।

সেকালে—আর সেকাল বলি কেন? এখনও—ফৌজদারী পেস্কার মহাশয়ের যথেষ্ট 'উপরি' প্রাপ্তি ছিল। দাদা যদি তা' নিতেন, তা'হলে ছোট ভাইয়েরও পড়া চলত, আমার পড়ার ব্যাঘাত হত না। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম মানুষ; কোনদিন একটি পয়সাও 'উপরি,-গ্রহণ করেন নি। ৪০৲ বেতন—আর মেজদাদার ১৫৲—এতে সংসার চলাই ভার—পড়ার খরচ কোথা থেকে আসবে? আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম—তাইতে দু'বছর আমার পড়া হয়েছিল। এ অবস্থায় আমার চাকরি গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। আর সে চাকরিও মাষ্টারী—একেবারে 'রেডিমেড'। তার জন্য শিক্ষানবিশীও করতে হয় না—কিছুই করতে হয় না। স্কুলে গিয়ে চেয়ারে বসলেই মাষ্টারী হয়। তাইতেই তো আমাদের দেশে শিক্ষার এমন দুরাবস্থা।

মাস দুই পরে দাদা ফিরে এলেন। আমি আমাদের বাসায় গেলাম। মাসে পঁচিশটি টাকা পাই—অবশ্য এক আনা কম—সেটা রসীদ ষ্ট্যাম্পের দাম। টাকা কয়টি এনে বড় বৌদিদির হাতে দিই। তিনি শশধরের কলিকাতায় পড়াবার খরচ পাঠান। আমি নিশ্চন্ত মনে খাই-দাই ছেলে পড়াই। আর পূর্ব-সংস্কার-বশে একটু-আধটু স্বদেশীও করি, বক্তৃতাও করি—গোয়ালন্দে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের সমস্ত অনুষ্ঠানের পেছনেও থাকি।

সেই সময় গোয়ালন্দে যিনি ফৌজদারী হাকিম ছিলেন, তিনি জাতিতে পার্শী—সিভিল সার্ভিস পাস করা। তাঁর নাম মিঃ কে, জে, বাদ্‌শা। বৎসরখানেক পূর্বে বাংলা দেশে এসে কিছুদিন আলিপুরের সদরে শিক্ষানবিশী করেছিলেন। তার পরই গোয়ালন্দ মহকুমার ভার পান। লোকটি বড় ভাল এবং তিনি আমাদের স্কুলকমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। সেই উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। নইলে সাধারণ স্কুল মাষ্টার আমি—হাকিমদের কাছে মোটেই ঘেঁষতাম না।

একদিন বাদ্‌শা সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে, তিনি 'হাই-প্রফিসিয়েন্সী ইন্ বেঙ্গলী' পরীক্ষা দেবেন। তা' নইলে তাঁর পদোন্নতি হতে দেরী হবে। পরীক্ষার ছয় মাস দেরী আছে। এই ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে বাংলা ভাষায় লায়েক করে' দিতে হবে। তখন তাঁর বাংলায় বিদ্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত।

তিনি আমাকে মাসিক ৩০ৎ টাকা দিতে চাইলেন। এ যেন খাজনার চাইতে বাজনা বেশী হ'ল। স্কুলের ৫ ঘণ্টা পরিশ্রম করে' ২৪ টাকা পনর আনা পাই, আর এ রবিবার বাদে ৬ দিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টা করে সাহেবের বাংলায় হাজিরা দিতে হবে—যেদিন তাঁর কাজকর্মের চাপ থাকবে না সেই দিন তাঁকে পড়ার সাহায্য করতে হবে। ঐ শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের শিক্ষকতা করবার ধরণ আলাদা। আমি তাঁকে কি করতে হবে, তাই ব'লে আসতাম। ইংরাজী থেকে যেটাকে বাংলা করতে হবে বা বাংলা থেকে যেটাকে ইংরাজী করতে হবে, তাই দেখিয়ে দিয়ে আসতাম। আর যে সব পাঠ্য পুস্তক ছিল, প্রতিদিন তার অংশ বিশেষ পড়তে বলে' আসতাম। সাহেব ঠিক ঠিক তাই করতেন। পাঠ্য পুস্তকের যে কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারতেন না, সেইটুকু মাত্র জিজ্ঞেস করতেন এবং যা অনুবাদ করতেন তা সংশোধন করে দিতে হ'ত। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে ঘণ্টা খানেক বক্ বক্ করতে মোটেই হ'ত না।

এমনও হ'ত যে, তিনি ৪।৫ দিনের জন্য মফঃস্বলে চলে' গেলেন—আমার তখন ছুটি। মাইনে কিন্তু বরাবর দিতেন।

ছয় মাসের মধ্যেই সাহেবকে বাংলা ভাষায় লায়েক করে', পরীক্ষা দিতে পাঠালাম। তিনি ফিরে এসে বল্লেন—'Sen, did very well.' আমি তাঁর বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রশ্নপত্রের একটা বাংলার কি অনুবাদ করেছেন জিজ্ঞাসা করলাম। সেই বাংলাটা—'তদন্তে জানিতে পারিলাম ঘটনা সত্য।'

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটার তিনি কি অনুবাদ করেলেন। তিনি বল্লেন—এ আর শক্ত কি—'After that I came to know that the case was true.'

আমি হেসে উঠলাম। তিনি বল্লেন, 'কেন? ঠিক হয়নি!' আমি বল্লাম—'মোটেই না। 'তদন্ত' কথার অর্থই তুমি বুঝতে পার নি। 'তদন্ত'র ইংরেজী হচ্ছে—Investigation.' সাহেব লাফিয়ে উঠে বল্লেন—'তা কি করে হবে? তুমিই ত বার বার ব'লে দিইছিলে—যে শব্দের অর্থ না বুঝবে—তার সন্ধিবিচ্ছেদ করতে হবে। তোমার কথা অনুসারে 'তদন্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করে আমি পেলাম তৎ+অন্তে অর্থাৎ after that. আর এই লিখিছি। ওটা 'তদন্ত', তা কি করে বুঝব?

এই বিদ্যে নিয়ে ত সাহেব পরীক্ষা দিয়ে এলেন। মাস দেড়েক পরেই পরীক্ষার ফল বের হ'ল। সাহেব আমাকে ডেকে গেজেট দেখিয়ে বল্লেন—'এই

দেখ আমি পাস হয়েছি। আর হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছি। তবে দুঃখের কথা এই যে, ঐ গেজেটেই আমাকে ট্রান্সফার করেছে। যাক্, ও টাকা আমি কি করব? আমার বাপের যথেষ্ট টাকা আছে। ঐ হাজার টাকার ৫০০্ টাকা তোমাকে পুরস্কার দিলাম মাষ্টার, আর ৫০০্ টাকা এখানকার পাবলিক লাইব্রেরীতে দিয়ে যাব। যা' হোক, ছয় মাস তিরিশ টাকা করে' পেয়েছি—তারপর ৫০০্ টাকা। এসব টাকা এনে বড় বৌদিদির নামে সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করে' দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এর এক পয়সাও কেউ খরচ করতে পারবেন না। ঐ টাকা দিয়ে বড়দার মেয়ের বিয়ে দেব। বৌদিদি বল্লেন—বেশ, তাই হবে।

এ হেন উপযুক্ত ও রোজগেরে ছেলেকে আর অবিবাহিত রাখা যায় মা, জ্যেঠাই মা, দু' একবার বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আমল দিইনি। শেষে তাঁরা একেবারে হাইকোর্টে আপিল করে' বসলেন। এ হাইকোর্ট হলেন—কাঙাল হরিনাথ। এ আপিলে তিনি রায় দিলেন—আমাকে বিবাহ করতেই হবে।

এর প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসাধ্য। তিনি যা' আদেশ করবেন, বিনা বিচারে অবনত মস্তকে সেই আদেশ পালন করতেই এতকাল শিখেছি। সুতরাং নাকি সুরে একথা বলতে হয়নি—কি করব, মা ছাড়লেন না! এক্ষেত্রে সে কথা বলার যো নেই। আমি যাঁকে দেবতার মত ভক্তি করি, মাও যাঁকে তেমনি ভক্তি করেন—তাঁরই আদেশ—বিবাহ করতেই হবে।

বড়দাদা মেয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। চারিদিকে অনুসন্ধান করে তিনি নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন। বাড়ী এসে সকলকে বল্লেন—পরমাসুন্দরী মেয়ে। আমাদের কায়েতের ঘরে হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। খুব বড় বংশের মেয়ে। মহাকুলীন। কিন্তু মেয়ের বাপের অবস্থা এতই মলিন হয়েছে যে, তিনি অলঙ্কারপত্র বা দানসামগ্রী কিছুই দিতে পারবেন না। অতি কষ্টে শাঁখাশাড়ী দিয়ে মেয়ে দান করবেন। এবং সেই উপলক্ষে যাঁরা পায়ের ধূলো দেবেন তাঁদের যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করবেন।

বড়দাদা একেবারে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন। তিনি কিছুই নেবেন না। তবে বরযাত্রী শতাধিকের কম হবে না। আমার শ্বশুর মহাশয় বলেছিলেন, তাই হবে। যে করে পারি তাঁদের অভ্যর্থনা করব। তাঁর নাম অম্বিকাচরণ মিত্র। নদীয়া জেলার—মহামহিম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন, রঘুনন্দন মিত্র। মহারাজের আদেশে এখন যে ষ্টেশনের নাম শিবনিবাস—তারই

নিকটে চারিদিকে গড়খাই বা বেড় দিয়ে দেওয়ান রঘুনন্দন নূতন গ্রাম পত্তন করলেন—ব্রাহ্মণ কায়স্থ অন্যান্য জাতিরও লোকজন এনে গ্রামে বাস করালেন। গ্রামের নাম হ'ল—'দেওয়ানের বেড়'। সেই দেওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী সুকুমারী দাসী হবেন আমার গৃহলক্ষ্মী—এই আমার বড়দাদা স্থির করে এলেন। কাঙাল শুনে বল্লেন—বেশ করেছ দ্বারকানাথ। খুব উচ্চ বংশের অবস্থা অত্যন্ত মলিন হয়ে গেলেও সে ঘরের মেয়েরা খুব ভাল হয়। তারা একেবারে মাটিরও অধম হয়ে থাকে।

এই স্থানে রঘুনন্দন মিত্র মহাশয়ের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একজন কর্মচারী ছিলেন। পদ যে খুব উচ্চ ছিল তা নয়, কিন্তু এই কায়স্থ সন্তানের কর্মকুশলতা ও কার্য্যতৎপরতা গুণগ্রাহী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি রঘুনন্দনকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। সেই সময় নদীয়া-রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। মহারাজ ঋণভারে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি এই ঋণ শোধ ও রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তখন একদিন রঘুনন্দন মহারাজকে বলেন—মহারাজ, যদি আমার ওপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করেন তা হলে আমি কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সমস্ত ঋণ শোধ করে দিতে পারি এবং রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা-সাধন করতে পারি।

রঘুনন্দনের এই কথা শুনে মহারাজ বড়ই প্রীত হলেন এবং তাঁকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করে রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁর উপর অর্পণ করলেন। রঘুনন্দন তখন নানা উপায়ে রাজ্যের আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে দিলেন, আর এদিকে অযথা-ব্যয় সঙ্কোচ করলেন। এই ব্যয় সঙ্কোচ উপলক্ষে তিনি রাজকুমার, রাজমাতা এবং রাজ-আত্মীয়গণকে রেহাই দিলেন না। এই কারণে অনেকেই তাঁর শত্রু হয়ে উঠল এবং রাজকুমার থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। মহারাজের কানেও নানা কথা তুলতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত করলেন না। কাজেই সকলকে নিরস্ত হতে হল।

তারপর দেওয়ান রঘুনন্দনের অদৃষ্টে যে শোচনীয় ও অভাবনীয় ব্যাপার সঙ্ঘটিত হল তার বিবরণ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় প্রণীত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' হ'তে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"একদা মুর্শিদাবাদে নবাবের সভায়, বর্দ্ধমান ও রাজসাহী প্রভৃতি নানা

প্রদেশীয় রাজা দিগের দেওয়ান, উকীল এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসীন আছেন, এমত সময়ে, রঘুনন্দন ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। সভা মধ্যে শূন্যস্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। একারণ, তন্মধ্যে প্রবেশ কালে তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গে লাগিল। ইহাতে মাণিকচাঁদ অতিশয় কোপপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে হিন্দি ভাষায় কহিলেন, "দেখ্‌তে নেহিঁ পাজি।" রঘুনন্দন বলিলেন, "হাঁ নওকর সবহি পাজি হ্যায়, কোই ছোটা কোই বড়া।" এই কৌতুকাবহ ও সমুচিত উত্তর শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। এইরূপ উপহাসিত হওয়াতে তদবধি তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের বিষম বৈরানুবন্ধন ঘটিল। কিয়ৎকাল পরে মাণিকচাঁদ নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইবামাত্র বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এরূপ উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি রঘুনন্দন সদৃশ লোকের অনিষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, কোন না কোন ছল করিয়া অনায়াসে সফলযত্ন ও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেন। বর্ধমানের রাজার কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব হুগলি হইতে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ টাকা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত পলাশী গ্রামে পঁহুছিলে রাত্রিযোগে বহুসংখ্যক দস্যু আসিয়া প্রহরীগণের মধ্যে কাহাকে হত কাহাকে আহত ও পরাভূত করিয়া সমস্ত ধন হরণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্মচারীগণ অপরিমেয় চেষ্টা পাইয়াও হৃতধনের বা অপহারিগণের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে অথবা তাঁহার শাসন দোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া রায় মাণিকচাঁদ তাঁহার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ রঘুনন্দনকে অপরাধগ্রস্ত করিলেন, এবং প্রথমে তাঁহাকে সমধিক অবমাননা করিয়া, পরিশেষে কামানের দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। রাজবাটীতে অতিদুঃখাবহ এই এক প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন ইতিপূর্বে নিতান্ত প্রয়োজন বশত রাজকুমারদের সঙ্গে যে আপাতকঠিন আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার এই দুর্দশায় দুঃখিত-চিত্ত না হইয়া বরং পুলকিত হইয়াছিলেন। একারণ যখন মুর্শিদাবাদে রঘুনন্দনকে গর্দভারোহিত করিয়া নবাবের লোকেরা নগর ভ্রমণ করায়, তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থানের সমীপস্থ বর্ত্মে সমাগত হইলে, রাজপুত্র শিবচন্দ্র তাঁহার প্রতি নয়ন-পাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন অতীব ব্যথিত হৃদয় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, "এই অবমাননাতে আমার যাদৃশ যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, তাহার সহস্রগুণ তোমাদের ব্যবহারে হইল। অবোধ রাজনন্দন, আমার এই অবমাননাতে

কাহার অবমাননা হইতেছে, ইহা যে তুমি বুঝিলে না, এই বড় পরিতাপের বিষয়। আমি যে গর্দভে আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই করিয়াছেন জানিবে।”

* * * *

আমার শ্বশুরের নাম অম্বিকাচরণ মিত্র। সে সময় দেওয়ানের বেড়ের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছিল। বড় বড় অট্টালিকার অস্তিত্ব একেবারে ইষ্টকস্তূপে পরিণত। পূজা-বাড়ীতে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপই শুধু অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্মুখের বৃহৎ নাটমণ্ডপ স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পড়েছিল, তা হলেও ইট-কাটগুলো সরিয়ে সেখানে বসবার জায়গা হতে পারত। অন্দর মহলে সেই ইষ্টক স্তূপের পার্শ্বে খান চারেক একতলা ঘর ছিল। সেইগুলি কোনরকমে সংস্কার করে আমার শ্বশুর মহাশয় বাস করতেন। শাশুড়ী ছিলেন অন্ধ। শ্বশুর মহাশয়ের এক দূরসম্পর্কীয় বিধবা ভগ্নী তাঁদের তত্ত্বাবধান করতেন।

শ্বশুর মহাশয়ের তিন কন্যা এবং এক পুত্র। পুত্রটিই সর্বকনিষ্ঠ। তার নাম অন্নদাচরণ। তিন কন্যার মধ্যে আমার স্ত্রী সর্বকনিষ্ঠা। বড় দুই জনের বেশ ভাল ঘরে বিবাহ হয়েছিল। আমার বড় ভায়রাভাই স্কুলের সাবইন্সপেক্টার ছিলেন। মেজ ছিলেন 'গোয়ালন্দ ই. বি. আর. এ গুড্‌স অফিসে বড়বাবু। এঁরই অবস্থা ভাল ছিল। তিনি যদিও ৬০, টাকা বেতন পেতেন কিন্তু তাঁর উপার্জ্জন ছিল ছয় সাতশো টাকা।

আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বড় শ্যালিকার একটি মাত্র পুত্র। পরে আর সন্তানাদি হয়নি। মেজ শ্যালিকার তখনও সন্তানাদি হয়নি। আমার বিবাহের ৫।৬ বৎসর পরে তাঁর একটি পুত্র হয়।

এইবার আমার বিবাহের কথা। বড়দাদা তো মেয়ে দেখতে গিয়েই আশীর্বাদ করে আসেন। তার কয়েকদিন পরেই এক শনিবারে আমার শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং আমাকে আশীর্বাদ করতে এলেন। পূর্বে সংবাদ পেয়ে বড়দাদা শুক্রবার রাত্রেই বাড়ী এসেছিলেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসিনি। রবিবারে আশীর্বাদ হবে,— দুদিন আগে স্কুল কামাই করে বসে থাকি কেন? বিশেষ সে সময় আমার আ-বাল্য বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাড়ীতে ছিলেন। বড়দাদা ও অক্ষয় ষ্টেশন থেকে আমার শ্বশুর মহাশয়কে অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন। কোন বিষয়েই ত্রুটি হয়নি।

অক্ষয় আমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে তোলে। পরে শুনেছিলাম, অক্ষয় বলেছিলেন—ছেলে আর কি দেখবেন, আমাকে দেখলেই

তাকে দেখা হবে। এই আমারই মত রোগা, আমারই মত কালো, আমারই মত লম্বা চুল, আর আমারই মত অল্প অল্প দাড়ী। বিদ্যাসাধ্যি দুই জনেরই সমান। আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমাকেই আশীর্বাদ করে যেতে পারেন।

আমি রাত্তির ১১টার সময় বাড়ী এলাম। আমার শ্বশুর মহাশয় তখন আহারাদি শেষ করে নিদ্রিত হয়েছেন। শুনলাম, কাঙাল হরিনাথ এসে তাঁকে আপ্যায়িত করে গিয়েছেন এবং আমার গুণগানও করেছেন। প্রাতঃকালে পাড়ার ২।৪ জন এলেন। অক্ষয় তো ছিলেনই।

আশীর্বাদ হয়ে গেল। শ্বশুর মহাশয় তখন অক্ষয়কে সঙ্গে করে গ্রামের অনেকের বাড়ী গেলেন এবং সকলেই তাঁর বাড়ীতে পদধূলি দেবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। কাঙাল যে কোথাও যেতেন না—তিনি পর্যন্ত যেতে সম্মত হলেন। বাড়ীতে এসে অক্ষয় বল্লেন—'আপনি তো নারদের নিমন্ত্রণ করে এলেন, এদিকে বড়দার কাছে শুনেছি—আপনার বর্তমান অবস্থায় কোন প্রকার সমারোহ করা সম্ভবপর হবে না।'

তিনি বল্লেন—অক্ষয়কুমার, আমার বড় আদরের কন্যা। দেওয়ান রঘুনন্দনের সম্মান অবশ্য রক্ষা করতে পারব না; কিন্তু যে একশো-দেড়শো বরযাত্রী যাবেন যথাসাধ্য তাঁদের অভ্যর্থনা করব—এ ভরসা আমার হয়েছে। কারণ, আমার দ্বিতীয় কন্যা বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। আমি কেবল কোন রকমে কন্যা সম্প্রদান করব। হয়েছিলও তাই। আমরা প্রায় দেড়শো বরযাত্রী গিয়েছিলাম। সেই জীর্ণ নাটমণ্ডপ পরিষ্কার করে সকলের বাসের ব্যবস্থা আর সেই প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে আহারের স্থান হয়েছিল। বরযাত্রীদের হাঙ্গামা তাঁদের বেশী পোহাতে হয়নি। তিনটের গাড়ীতে আমরা পৌছি। গোধূলি লগ্নে বিবাহ। রাত্রি ১০টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করে ১২টায় গোয়ালন্দমেলে বরযাত্রীরা সব ফিরে আসেন।

অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি এবং ভোজের আয়োজনও দেওয়ান বাড়ীর উপযুক্ত হয়েছিল। শ্বশুর মহাশয় কিন্তু ৫টি হরতকী দিয়েই কন্যা উৎসর্গ করেছিলেন।

কাঙাল সে রাত্রি সেখানেই ছিলেন। পরদিন আমাদের নিয়ে বাড়ী এলেন।

এ বিবাহে বড়দাদাও অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করেন। আমার জ্যাঠাইমা দুইগাছি সোনার বালা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সেই দুই গাছি বালা ব্যতীত

বিবাহিত জীবনে তার অঙ্গে আর সোনা ওঠেনি। কোন বিলাস দ্রব্য তার আড়াই বৎসর বিবাহিত জীবনে সে পায়নি। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। তার সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারি যে, সে সমস্ত পৃথিবীটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে পারত। তিরস্কার করলেও হাসি, কারণে অকারণেও হাসি। কোনপ্রকার অভাবকেই সে জীবনে আমল দেয়নি। সবই সে হেসে উড়িয়ে দিত। এই হাসি সঙ্গে করেই সে এসেছিল—কিন্তু যাবার সময় সে হাসিমুখে যেতে পারেনি। সে কথা পরে বলব।

এখন আমার গোয়ালন্দের মাষ্টারী-জীবনের দুই চারিটি ঘটনার কথা বলি। সেখানে আমি প্রায় ৫ বৎসর ছিলাম। সে সময়ে আমার ন্যায় সামান্য স্কুল-মাষ্টারের জীবনে এমন কিছুই ঘটতে পারে না, যা' উল্লেখযোগ্য। অবশ্য গোয়ালন্দের চাকুরি শেষ হবার সময়ে আমার জীবনধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়—সে কথা পরে বলব!

সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা। মাষ্টারী করা ছাড়া তখন আমার উপায়ান্তর ছিল না। একটু রয়ে-বসে চেষ্টাচরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী আফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষানবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে' তার পর বৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল-এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দু' বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমার ছোট ভাই শশধর খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কেন যে তিনি ভালভাবে পাস করতে পারলেন না, তা' আমি বুঝতে পারলাম না।

আমরা দুই ভাই, শশধর আমার আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় মাস, তখন আমরা পিতৃহীন হই, বড় হয়ে তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলে' যে শ্রদ্ধা করতেন তা' নয়, আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অবলম্বন ব'লেই মনে করতেন। তাই আমি যখন ফেল হলাম, আর তিনি পাস হলেন, তখন তিনি জেদ করতে লাগলেন যে, আমি আর এক বৎসর পড়ি। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ ক'রে পনর কুড়ি টাকার একটা মাষ্টারী কি অন্য চাকুরী নিয়ে

আমার পড়ার খরচ চালাবেন এবং নিজেও ঘরে পড়াশুনা করে' মোক্তারী পরীক্ষা দিবেন। পিতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নি—আমি যে তার দাদা—সে যে আমার বড় আদরের পিতৃহীন ছোট ভাই! আমাদের সংসারের কর্তা, আমাদের বড় দাদা শশধরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন; কিন্তু আমি আমার পরম পূজনীয় বড়দাদার আদেশ অমান্য করেছিলাম।

তখন বড়দাদা গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেস্কার ছিলেন, পরে হেড ক্লার্ক হন। তিনি চেষ্টা করে' আমাকে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক-পদে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। বেতন হ'ল নগদ চব্বিশ টাকা, পনর আনা—অর্থাৎ বেতন পঁচিশ টাকাই হ'ল, তার থেকে মাইনে প্রাপ্তির রসিদ-ষ্টাম্পের দাম এক আনা কেটে নিয়ে স্কুলের কর্তারা আমাকে চব্বিশ টাকা, পনর আনা দিতেন। কলেজে পড়বার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ ও কালীচরণের বক্তৃতা শুনে, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাট্‌সিনি-গারিবল্ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব বলে' আকাশে যে বাড়ী তৈরী করতাম, এক আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল--বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার। কি করব—ঐ কয়টি টাকা না হ'লে যে আমার ছোট ভাইয়ের কলেজে পড়া বন্ধ হয়! তাই, আমি ঐ ready-made চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—অপেক্ষা করবার আমার সময় ছিল না।

আর এই মাষ্টারী চাকুরীটি বেশ! ও কাজের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করতে হয় না, শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় পাস বা ফেল হ'লেই মাষ্টারী করবার সনন্দ পাওয়া যায়। অমন সোজা চাকুরী আর নেই; একদিনের জন্যও মাষ্টারীর শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় না। ছেলে পড়ানো বিদ্যাটা আমরা এতই সহজ করে নিয়েছিলাম। ওর জন্য সাগরেদী করতে হয় না—একেবারে ওস্তাদ শিক্ষক। তা' তাই বলি না কেন' ঐ সহজ-প্রাপ্য (এখন কিছু দুষ্প্রাপ্য) চাকুরীর পথ খোলা ছিল ব'লে আমাদের মত ফেল-করা মূর্খেরাও পার হয়ে গিয়েছিল।

থাকুক সে কথা। ১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম। দাদার কাছে থাকি, কোন ভাবনা নেই। মাইনের টাকা এনে বৌদিদির হাতে দিই; তিনি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে

দেন। খাই-দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব সংস্কার বশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি। গোয়ালন্দের উকিল মোক্তার বড় বড় কর্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থাবিপর্য্যয়ে সেই মাইনর স্কুল এণ্টান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি। এই জন্যই আমি সকলের কাছে আবদার করতে পারতাম এবং তাঁরা সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন।

সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না বন্ধু! পাড়াগাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারদের যোগ্যতার পুরস্কার তখনও কেউ দেয়নি ; এখনও দেয় না। আমার এ বেতন-বৃদ্ধির কারণ এই যে, স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে, আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোকবৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।

এইবার আসল কথা বলি। ১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির ( কংগ্রেসের ) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( W. C. Bonerji ) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও, আমার প্রবাস-স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে। কলিকাতার কার্য্য-নির্বাহক সমিতি মনে করেছিলেন—নানা স্থানের প্রতিনিধি ও দর্শকে এত অধিক লোক হবে, যাদের স্থান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে নাও হতে পার।

কোন প্রকারে প্রথম দিনের কার্য শেষ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতি তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে হ'ল। সেইদিনের সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন যে, পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়ের পূর্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তার জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে টাউন হলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই দেখতে পেলাম—একটি গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারপাশে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটি দেখতে যেমন সুন্দর, তার পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটি; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোণার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো—সেই আলোয়ানের উপর দু দুটো ব্যাজ্—একটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটি প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় রথীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে, তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। আমার পার্শ্বে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক হয়ে বল্লেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না। উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বল্লাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি কিন্তু পাড়াগাঁয়ে থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

অনেকের স্বভাব আছে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে। আমার সে স্বভাব মোটেই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি কারও সঙ্গে আপনা হ'তে আলাপ জমাতে পারি নে, এখন তো মোটেই পারি নে, যৌবন কালেও পারতাম না। কাজেই দেশমান্য অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য

আমার হ'ল না। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি লাভ করলাম।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সেই দিনের দুইটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তার মধ্যে একটি—উত্তরপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সভায় আগমন। দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর দিয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মঞ্চের উপর এলেন, তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না—তবুও সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারলাম—ইনিই সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ হ'তে যে বাণী প্রদত্ত হ'ল তার একটি কথা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারছিনে। অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধ বললেন—

"It is no wonder that objects such as these should have drawn distinguished gentlemen from all parts of the country, when you find a blind old man like myself of 79 years of age bending under the infirmities of age, taking a part in the deliberations."

আর একটি যুবক সেদিন সত্যসত্যই আমাকে অভিভূত করে' ফেলেছিলেন। একটি প্রস্তাব সমর্থন করবাব জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, তখন সমবেত প্রতিনিধি অবাক্ হয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব-দর্শন মূর্ত্তি! তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটিকেও তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বল্লেন—চিনি নে মশায়, বোধ পাঞ্জাবী কেউ হবে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলাম না। যুবকটি গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর!—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি, তখন আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারজীবী।

কংগ্রেসের কথা এইখানেই শেষ করি।—ভারত উদ্ধার করে' যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার 'সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর।' রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চলতে লাগল।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটি প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন, যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাতুল বা কেউ গোয়ালন্দে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, পঞ্চানন সেইখানে থেকে আমাদের স্কুলে পড়ত। তারি কাছেই ইতিপূর্বে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে একটি ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন, সেখানকারই আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান পঞ্চাননও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান আচার্য্য, আমার পরম শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও কলিকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে' পঞ্চাননের গুণগান করেন। আর তার চরিত্র-মাধুর্য্য যে আমিই বিকশিত করে' দিয়েছিলাম, একথা বলে আমাকে লজ্জিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের জীবন অশ্বিনীবাবুর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল।

যাক সে কথা। পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনীবাবু কংগ্রেসের মত প্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে' কংগ্রেসের বার্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না, এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে' পাঠিয়েছেন এবং একদিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে, সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন। এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক।

অশ্বিনীকুমারের নির্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দে সভার ব্যবস্থা আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু তাঁর মত বড়-মানুষের ছেলেকে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একদিনের জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করবার অনুরোধ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'ল। তখন পঞ্চাননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে, আমি বাড়ীর ভিতর বড়দাদার কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বল্লেন—তাই তো—কি করা যায়! আমাদের এই ছোট চালা-ঘর—খড়ের চাল—দরমার বেড়া। এ কুঁড়ে ঘরে তাঁর মত মহামান্য অতিথিকে ডেকে আনি কি করে?

বড়বৌদিদি বল্লেন—"তাতে কি হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন! ঠাকুরপো, তাঁকে আসতে লিখে দাও। আমরা প্রাণপণে তাঁর অভ্যর্থনা করব। কি বলিস সেজো!" এই বলে তিনি তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আমার স্ত্রীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বড়দাদার সম্মুখে তো তিনি আর কথা বলতে পারেন না—ঘাড় নেড়ে বৌদিদির প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। আমি উৎফুল্লচিত্তে বাইরে এসে পঞ্চাননকে বললাম—"দেখ পঞ্চানন, অশ্বিনীবাবু হয় ত মনে করেছেন—আমি গোয়ালন্দের অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। তুমি তাঁর সে ভ্রম ঘুচিয়ে দাও। তাঁকে লেখ, আমি ২৫৲ টাকা মাইনের গরীব স্কুলমাষ্টার। আমার ঘর সত্যসত্যই কুটীর। তিনি এই শুনে যদি আমার বাড়ীতে পদধূলি দেন—আমি ধন্য হয়ে যাব। তুমি তাঁকে চিঠি লেখ—আমিও কাল তাঁকে চিঠি লিখব।

পঞ্চানন অশ্বিনীবাবুকে কি লিখেছিল জানি নে—খুব সম্ভব আমি যা' বলেছিলাম তাই লিখেছিল। আমিও ঐভাবেই বরিশালে অশ্বিনীবাবুকে পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন—সে কথাগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারব না—তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে, গোয়ালন্দে যদি ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ থাকত আর সেখান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসত, তা' হলেও তিনি সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসতেন।

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্নে সভা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

যথানির্দিষ্ট শনিবারের প্রত্যূষে মেল-গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে

পৌঁছলেন। একটি চাকর ব্যতীত সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাঁর আসবার দুইদিন আগে থেকেই আমরা সভার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণপত্র সকলেই দিয়েছিলাম। বাজারের নিকট প্রশস্ত ময়দানে সভার স্থান করা হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম—উন্মুক্ত আকাশতলেই সভা হবে, কিন্তু বাজারের আড়তদার ও দোকানদারগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরাই সভামণ্ডপ প্রস্তুত করার ভার নিলেন, আর আমার প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট স্কুলের ছাত্রেরা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। নিমন্ত্রণপত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার স্কুলের ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিলেন।

গোয়ালন্দের সর্বপ্রধান উকিল যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ও শনিবার প্রত্যুষেই ষ্টেশনে গিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করবেন, এ কথাও স্থির হয়েছিল। আমাদের আরও একটা সুবিধা হয়েছিল। শনিবার কি উপলক্ষে অফিস, আদালত, স্কুল, সমস্তই বন্ধ ছিল। তার জন্য আমাদের লোকবলও বেড়েছিল এবং ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর সংবর্দ্ধনার বিপুল আয়োজনও আমরা করতে পেরেছিলাম।

শনিবার প্রত্যুষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই শীতেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার দোকানদার, মুটে-মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে' ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামবার পূর্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে প্লাটফরমে নামালেন। তখনও "বন্দেমাতরম্" দেশে আসে নি, কার্যেই সমবেত জনমণ্ডলী করতালি দিয়েই এই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে সম্মুখে যাঁরা ছিলেন, যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার-বিনিময়ের পর অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কই, জলধর কই?" এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনও দাঁড়াতাম না, এখনও না। আমি সে সময়ে কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক্-ওদিক্ চেয়ে দেখলেন যে, আমি

পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—"এই নিন আপনার জলধর।"

অশ্বিনীবাবু সহাস্যবদনে বললেন—"কথাটা ঠিক হল না—বলুন, এই নিন "আমাদের জলধর।" সকলে আনন্দধ্বনি করে' উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিতে গেলাম। তিনি হো-হো করে' হেসে বললেন—"পায়ে কি আর এখন ধূলো আছে ভাই" এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে বললেন—প্রণাম আর করা হল না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে কে একজন বললেন, "আপনার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।" সেই সদা-প্রফুল্ল-বদন অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—"জলধরের বাড়ী এখান থেকে ক' ক্রোশ?"

যাদববাবুই জবাব দিলেন—"ক্রোশ তো নয়—আধ মাইলের কম।"

অশ্বিনীবাবু বললেন—"আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আমি বরিশালের বাঙ্গাল অশ্বিনী দত্ত। এখনও প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তিন চার ক্রোশ হাঁটি।" তখন সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতেই আমার বাসায় এলেন। আমার বড়দাদা ষ্টেশনে যান নি, বাড়ীর ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বাসার সম্মুখেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা সকলে নিকটস্থ হলে, যাদববাবু দাদাকে দেখিয়ে বললেন—"ইনিই জলধরের দাদা দ্বারিকবাবু—আজ আপনি এঁরই অতিথি।" বড়দাদা নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতেই, অশ্বিনীবাবু নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তারপরই দাদা অতি মৃদু স্বরে বললেন,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি দয়া করে' আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।"

সে কথার উত্তরে তিনি যা' বললেন, তা' তাঁর মত সদাশয় মহৎ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন,—"আমি কি আপনার বাড়ী এসেছি? আমি আমার বাড়ীতেই এলাম—কোন শিষ্টাচার দেখাবেন না দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই অশ্বিনী।"

এমন করে' কেউ যে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে একান্ত আপনার জন্য করে' নিতে পারে, এ আমি পূর্বে কখনও দেখি নি। অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে' উঠলেন। আমার বড়দাদাও উপযুক্ত দাদা—তিনি বললেন, "আমার একটু ভুল হয়েছিল অশ্বিনীকুমার—যাও, তোমার বাড়ী-ঘর তুমি দেখে নাও।"

তারপর আমাদের বাইরের যে ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘরে

প্রবেশ করে' চারিদিক একবার চেয়ে দেখে বললেন—"এ কি করেছেন দাদা—এ যে রাজ-অভ্যর্থনা!"

করা হয়েছিল তো ভারী! একখানা-চৌকির উপর বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল—আর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ধার ক'রে খানকতক ভাল চেয়ার, দু'খানা টেবিল ও একটি আল্না আনা হয়েছিল। এই হল তাঁর রাজ-অভ্যর্থনা।

দাদা বললেন, "আমি ওর কিছুই করিনি। যাঁরা করেছেন, যাও তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া কর গিয়ে।"

"তাই যাচ্ছি" বলেই কাপড়-চোপড় না ছেড়েই অশ্বিনীবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে বল্লেন—"চল জলধর—গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসি। বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, সে খবর আমি পঞ্চাননের চিঠিতে জানতে পেরেছি।"

আমি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলাম। বড়বৌদিদি তখন বারান্দায় জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁর সম্মুখে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে' বললেন—"আপনি যে বড়বৌদিদি, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। কথা ব'লে আমাকে আশীর্বাদ করুন।"

বড়বৌদিদি বুঝলেন—আচ্ছা লোকের হাতে পড়েছেন। কথা না বলে' পারলেন না, বললেন—"আশীর্বাদ করি—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।" অশ্বিনীবাবুর সেই হাসি! বললেন—"ওর একটাও আমি চাইনে। যাক্ সে কথা পরে হবে। কই আর এক লক্ষ্মী কই!"

বৌদি বললেন—"আপনার আসবার সাড়া পেয়েই সে ঐ ঘরে পালিয়েছে।"

অশ্বিনীকুমারের কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই—আমার শয়ন-ঘরের ভিতর প্রবেশ করে' আমার স্ত্রীর হাত ধ'রে টেনে এনে বল্লেন—"আমি ও লজ্জা-টজ্জা মানব না। এ জীবটিকে কোথায় পেয়েছেন বৌদিদি?"

বড়বৌদিদি বল্লেন—"শিবনিবাসের কাছে দেওয়ানের বেড়ে।"

"ওরে বাবা! শিবনিবাস?" এই বলে'ই ছড়া কাটলেন—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী—
ধন্য নদী কঙ্কনা!"

বৌদিদি, আমি দেওয়ানের বেড়ের ইতিহাসও পড়েছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রঘুনন্দনের স্থাপিত এই দেওয়ানের বেড়।" বড়বৌদি বল্লেন—"এতও

আপনি জানেন !—এ সেই দেওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী। এখন এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।"

"আচ্ছা। সে পরিচয় পরে করা যাবে, এখন বাইরে গিয়ে হাত-পা ধুইগে।"

বাইরে এসে সভার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাঁকে বললাম, "আজই সাড়ে তিনটেয় সভা হবে, বাজারের কাছে। সবই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আপনি জলটল খেয়ে বিশ্রাম করুন—আমি একবার দেখে আসি সব ঠিক হচ্ছে কি না।" এই বলে' আমি চলে' গেলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন বেলা প্রায় একটা।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি—দাদার ঘরের বারান্দায় অশ্বিনীবাবু আহার করতে বসেছেন। তিনি তখন নিরামিষাশী ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—"দেখ জলধর, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতেই চেয়েছিলাম। তা' তোমার ঐ লক্ষ্মীটি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি হয় তো এ বেলা আসবেই না, একেবারে সভা শেষ করে' আসবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ফেলেই খেতে বসেছি। দাদাকে বাইরের ঘরে নির্বাসিত করে' ওরা দুইজনে আমাকে নিয়ে পড়েছে। বড় শক্ত বাঁধনেই ভাই ফেললে আমাকে!" তারপর যে কত কথা—কত হাসি-তামাসা—সে সব কথা মনে হলেও এখন আমার চোখে জল আসে।

তারপর যথানির্দিষ্ট সময়ে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় সভায় অধিবেশন হ'ল। আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনা করলেন। অশ্বিনীবাবু আমাদের দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে এক ঘণ্টার উপর বক্তৃতা করলেন। সকলের শেষে আমি ধন্যবাদ করলাম! সভার কার্য্য শেষ হ'ল। অশ্বিনীকুমার এই অনুষ্ঠান দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। অশ্বিনীবাবু বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খানিকটা দুধ ব্যতীত আর কিছুই খেলেন না। গরীবের যা' কিছু আয়োজন হয়েছিল, আমরাই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

শয়নের কিছু পূর্বে অশ্বিনীকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমারই সম্মুখে বড় বৌদিকে বল্লেন—"বৌদি, যা' মনে করেছেন—তা' নয়। অশ্বিনী-কুমার কাল সকালে যাচ্ছেন না।"

এ কথার জবাব আমার স্ত্রী দিলেন—"কে আপনাকে যেতে বলেছে মশায়! থাকুন না দশ-পনর দিন আমাদের এখানে!"

"সত্যসত্যই তাই ইচ্ছে করছে", এই বলে' মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশ্বিনীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর চাকরটিকে বাড়ীতে রেখে আমাদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনীবাবু বেড়াতে বেরুলেন। বেলা প্রায় আটটার সময়ে যখন ফিরলেন —তখন তাঁর পেছনে আমাদের চাকরের মাথায় একটা ঝাঁকা আর একটা নগদা কুলীর মাথায় একটা ঝুড়ি। এই দৃশ্য দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সব কি দাদা!" অশ্বিনীকুমার হিন্দী বাত্‌ আওড়ালেন—"তফাৎ যাও। কোহি বাত মত্‌ বোলো।" এই বলে' লোক দুটোকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেলেন—আমি আর তাঁর অনুসরণ করলাম না, কারণ জানতাম তখন বড়দাদা বাড়ীর ভেতরে আছেন। বড়দাদা একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন —"দেখ গিয়ে জলধর, তোমার পাগলের কাণ্ড। বাজারের আর কিছু বাকী রাখেনি।"

তার খানিকটা পরেই বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি—উঠানের দড়ীর ওপর তাঁর গরম কোট ও শাল ঝুলছে; পায়ের জুতা-মোজা খুলে উঠানে ফেলে দিয়ে—মহাপুরুষ বসে' কুটনো কুটছেন। পাশে আর একখানা বঁটি নিয়ে আমার স্ত্রীও তাঁর সাহায্য করছেন।

আমি বললাম, "দাদা ও কি, হাত কাটবেন যে?"

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন—"ভগবান, তাই যেন হয়—যতদিন কাটা ঘা না শুকোবে, ততদিন তো আমাদের কথা মনে থাকবে!"

অশ্বিনীকুমার বললেন—"জলধর, তোর এই গৃহিণীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এর কথারও অন্ত নেই—হাসিরও অন্ত নেই!"

তারপর অশ্বিনীকুমার একবার রান্নায় যোগ দিচ্ছেন, আর একবার বা বাইরে এসে যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদের বলছেন—"আমি কালকের অশ্বিনীকুমার নেই মশায়—আমি আজ এ বাড়ীর রাঁধুনী।"

এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনের ভোরের ষ্টীমারে তিনি যখন ঢাকা রওনা হন, তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন, আমার বৌদিদি ও আমার গৃহিণীও চোখের জল ফেলেন। কথা আর কেউ বলতে পারলেন না, উভয় পক্ষের চোখের জলেই বিদায়াভিনন্দন হয়ে গেল।

তার পর! তার পরের কথাও বলতে হবে?

পূর্ববর্ত্তী ঘটনার নয় মাস পরে একদিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারে ফুটপাতের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।

অশ্বিনীকুমার সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে' তিরস্কার করে' বল্লেন, "হাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই—এই ন মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলি নে।" আমি শুষ্কমুখে বল্লাম—"খবর তো কিছু নেই দাদা, সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে!"

"সে কি, আমি যে বুঝতে পারছিনে!" আমি বললাম—"শুনবেন দাদা' আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে আমার একটি কন্যাসন্তান হয় বারদিন পরেই সেটি মারা যায়। তার বারদিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে' গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়-যাত্রী।"

"এঁ্যা—কি বলিস!" এই বলে' সেই মানবশ্রেষ্ঠ গোলদীঘির পার্শ্বের রেলিং-এ ভর দিয়ে নতমুখে দাঁড়ালেন। দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি চুপ করে' তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই-তিন মিনিট পরেই আত্মসংবরণ করে' অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বল্লেন—"জলধর—এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশীদিন টিঁকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।"

আমার গোয়ালন্দে অবস্থান-কালে সর্বপ্রধান ঘটনা—আমার প্রবাসভবনে কাঙাল হরিনাথের পদধূলি দান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার "কাঙাল হরিনাথ" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়েছি। ঐ গ্রন্থ থেকেই তার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

আমি তখন গোয়ালন্দে থাকি। কাঙাল আমাকে পত্র লিখলেন যে, তিনি দল লইয়া ফরিদপুর কৃষিপ্রদর্শনীতে গান করিতে যাইতেছেন। আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে হইবে। তখন বড়দিনের ছুটি ছিল। আমি প্রস্তুত হইলাম। তাঁহারা শেষরাত্রির গাড়ীতে গোয়ালন্দ পৌঁছিলেন। আমি প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনেই ছিলাম। এক সঙ্গে ষ্টীমারে চড়িয়া ফরিদপুরে গেলাম। আমাদের গ্রামবাসী এক্ষণে পরলোকগত প্রসন্নকুমার সান্যাল মহাশয় ফরিদপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি কাঙালের ছাত্র এবং আমাদের মাষ্টার। আমরা তাঁহার বাসায় উঠিলাম। সেদিন আর গান হইল না। তাহার পরদিন মেলাকমিটির সেক্রেটারী মহাশয় বলিয়া গেলেন যে, সেইদিন অপরাহ্নকালে মেলার মণ্ডপে ফিকিরচাঁদের গান হইবে।

আমরা ফরিদপুর যাইয়াই শুনিলাম যে, প্রসিদ্ধ পাগ্‌লা কানাই ফরিদপুরে গান করিতে আসিয়াছেন। পাগ্‌লা কানাইয়ের নাম কলিকাতা অঞ্চলের লোক না জানিতে পারেন; কিন্তু এক সময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশবিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগ্‌লা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য এক এক সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান একস্থানে সমবেত হইত। একদিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাগলা কানাই বৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গলার এমন আওয়াজ ছিল যে, পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিলেও, সকলে তাহার গান শুনিতে পাইত। আমরা ফরিদপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, আমাদের যে সময়ে গান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার পূর্বে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বারটায় সময় পাগলা কানাইয়ের গান আরম্ভ হইবে। কাঙাল বলিলেন, "তোরা ত সে গান শুনিস্ নাই, কানাইয়ের গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়!"

আমরা বেলা ১২টার সময়ে মেলার মাঠে গিয়া দেখি, সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! অনুমান ত্রিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। একটু পরেই মাথায় লম্বা-লম্বা চুলওয়ালা দশ-বার জন লোক কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। জনসংঘের হিন্দুগণ "হরিবোল" এবং মুসলমানগণ "আল্লা-আল্লা" ধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিল। সে যে কি উন্মাদনা, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। যাহারা গান করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্য একটি কাঠের মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল; তাহারই উপর দাঁড়াইয়া গান না করিলে, কানাইকে কেহ দেখিতে পাইবে না বুঝিয়াই মেলার কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কানাই ও তাহার দলের লোকেরা মঞ্চের উপর আরোহণ করিল; প্রত্যেকের হস্তে একখানি করিয়া খঞ্জনী; আর কোন বাদ্যযন্ত্র নাই। একটু পরেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। এই যে ত্রিশ হাজার লোক, ইহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতে লাগিল। তাহারা যে কয়টি গান গাহিল, সমস্তই অনিত্যতা সম্বন্ধে। আমরা অবাক হইয়া এই দশটি লোক ও বৃদ্ধ কানাইয়ের সুররাজি, সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ! ধন্য শিক্ষা! আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না; যাঁহারা পাগলা কানাইয়ের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

পাগলা কানাইয়ের গান চারিটা পর্যন্ত চলিবে, তাহার পরেই ফিকিরচাঁদের

গান আরম্ভ করিতে হইবে। সৌভাগ্যের কথা এই, তাহাদিগকে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গান করিতে হইবে না; তাহা হইলে আমি যোগ দিতেই পারিতাম না। মেলার জন্য যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই মণ্ডপেই ফিকির-চাঁদের গান হইবে; সহরের ভদ্রলোক, সাহেব-বিবি ও মফঃস্বলের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ সেইখানেই সমবেত হইবেন।

তিনটা বাজিয়া গেল, তখন আমরা আর পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য সেখানে থাকিলাম না। মেলার মধ্যেই একটি ঘরে আমাদের দলের সাজসরঞ্জাম রক্ষিত হইয়াছিল। কাঙালের ত আর সাজের প্রয়োজন ছিল না—তাঁহার ফকিরেরই বেশ! আর সকলে ফকির সাজিবার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। কাঙাল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস; তিনি কি যেন ভাবিতেছিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি একটু পরে বলিলেন, "কানাইয়ের গান শুনলি ত। এর পরে কি তোদের গান জম্‌বে, তোরা কি পারবি? আমি তাই ভাবছি।" এ কথার কি উত্তর দিব! আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই তিনি বলিলেন, "তোর কাছে কাগজ-পেন্সিল আছে? আমি বলিলাম "আছে।" তিনি বলিলেন, এই যে জনসমুদ্র দেখছিস, ইহাদের মধ্যে আজ মায়ের নাম ছড়াইয়া দিতে হইবে। তুই কাগজ ধর, নূতন গান দিই। সেই গান নিয়ে প্রথমে আসরে যেতে হবে।" এই বলিয়া তিনি গান বলিতে লাগিলেন, আমি লিখিয়া লইলাম। গানটি এই—

আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জাবারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।
মা, তোমার যে নাম জপে, হৃদয় কূপে নির্জনে যোগী-মুনি;
সেই নাম আজ জনসমাজে, ফকির সাজে, গাইতে এলাম ও জননি!
মা, আমার হ'তেছে ভয় কাঁপে হৃদয়, হৃদে এস বীণাপাণি!
মা, তুমি আপনি বাজাও, আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি।
মা, তুমি মা নাম দিয়ে জাগাইয়ে, জাগালে কুলকুণ্ডলিনী;
এ হৃদয়-বাঁধ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচায় ভাবরূপিণী।
কাঙালের গেছে সজ্জা, লোকলজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী,
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিস্ অনন্তরূপিণী।

দেখিতে দেখিতে উপরিলিখিত গান প্রস্তুত হইয়া গেল। কাঙাল তখন বলিলেন, "এ গান লাগবেই, তোদের ভয় নাই।" আমি গান লইয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। প্রফুল্ল, নগেন্দ্র সকলেই গান দেখিল।

প্রফুল্ল বলিল, "হাঁ ঠিক হয়েছে। আমিও সেই ভাবছিলাম। দেখব, আজ মা হারে কি পুত্র হারে!', প্রফুল্লের কথা শুনিয়া আজ সকলেই প্রফুল্ল হইল, সকলেরই হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। প্রফুল্ল বলিল, "আজ আর অন্য যন্ত্রে হবে না। সবাই একখানা করিয়া খঞ্জনী হাতে লও।

কে একজন বলিল, "আমাদের এত খঞ্জনী নাই।" উকিল প্রসন্নদাদা সেখানে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তাহার জন্য ভাবনা নাই। কানাইয়ের দলের নিকট হইতে খঞ্জনী আনিয়া দিব।" প্রসন্নদাদার সেদিন আনন্দ দেখে কে? তিনি শুধু বলিতেছেন, "দেখিস্ প্রফুল্ল আজ আমাদের গ্রামের নাম রাখিস্, আজ কাঙালের নাম রাখিস্।"

কানাইয়ের গান ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদিগের আসরে যাইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কাঙাল তখনও তৃণাসনে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলাম, "এখন গাইতে যেতে হবে।" তিনি চকিত হইয়া বলিলেন, "বেশ, চল।" আমরা কাঙাল হরিনাথকে দলের সম্মুখে প্রথম সারির মাঝখানে লইয়া সকলে মণ্ডপাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঙাল বলিলেন, "এখান হইতেই গান ধর।"

তখন একসঙ্গে পনরখানী খঞ্জনী বাজিয়া উঠিল, পনর জনের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গান আরম্ভ হইল—

"আমার আজ এই নিবেদন···"

চারিদিক হইতে লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমরা তখন সত্যসত্যই কি এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গান ধরিয়াছিলাম। মণ্ডপের দ্বারে পৌঁছিতেই গান জমিয়া গেল, সুরের একটা জমাট বাঁধিয়া গেল। আমরা ধীরে ধীরে মণ্ডপের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম। তখন আর আমাদের জ্ঞান ছিল না। আমরা প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। মণ্ডপের মধ্যে প্রায় দুই-তিন হাজার লোক। সকলে নিঃশব্দে গান শুনিতে লাগিল। যখন শেষের অন্তরা আমরা ধরিলাম, তখন কাঙাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তখন নৃত্য আরম্ভ হইল। তখন আর দল বে-দল থাকিল না। মণ্ডপের লোকেরাও আসিয়া গানে যোগ দিলেন। বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র ভেদ থাকিল না। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আমার ত মনে হইতে লাগিল—চারিদিক হইতে সহস্র কণ্ঠ গাহিতেছে—

"নামে না হয় কলঙ্ক—
মা নামে না হয় কলঙ্ক"—

প্রায় তিন কোয়ার্টার এই একটি গানই হইল। তাহার পরই ফকিরের দল মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কত জন আসিয়া কাঙালের পদধূলি লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন, সেদিন যেন আমাদিগকে আর গান করিবার জন্য আহ্বান করা না হয়। পরের দিনও গান হইয়াছিল। সেদিনও ঐ ব্যাপার। তাহার পরের দিনই আমরা ফরিদপুর ত্যাগ করি।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় ফকিরচাঁদের দল এবং কাঙাল হরিনাথ তাঁহার এই অযোগ্য শিষ্যের গোয়ালন্দের বাসায় দুইদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করিতাম।

কাঙাল হরিনাথ ফিকিরচাঁদের দল সহ গোয়ালন্দে উপস্থিত হইলে সহরময় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। আমাদের ক্ষুদ্র কুটিরে লোক আর ধরে না। গোয়ালন্দ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে দলে দলে লোক ফিকিরচাঁদের গান শুনিবার জন্য এবং কাঙালকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বে গোয়ালন্দে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও এক্ষণে পরলোকগত কালীশঙ্কর সুকুল মহাশয় এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উপলক্ষে গোয়ালন্দে আগমন করিয়াছিলেন। গোয়ালন্দে যে কয়েকজন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম করিয়াছিলেন। এই উৎসবের পরেই গোয়ালন্দে মহা দলাদলি আরম্ভ হইল; হিন্দুসমাজভুক্ত মহোদয়গণ ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না। কিন্তু হিন্দুসমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ এই কয়েকটি ভদ্রলোককে নানাপ্রকারে নির্যাতিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। এমন কি আমি জানি যে, এই দলের একজন ভদ্রলোক কোন হিন্দু-সমাজভুক্ত উকিলের বাসায় গমন করিয়া তাঁহার ফরাসে উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভদ্রলোকের সম্মুখেই হুঁকার জল ফেলিয়া দিবার জন্য উকিলবাবু চাকরদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ফরিদপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় এই কথা আমি কাঙালকে বলিয়াছিলাম।

তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আজ আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। দুইদিন তোর বাসাতেই থাকিতে হইতেছে।" এই কারণেই কাঙাল হরিনাথ দলবদলসহ গোয়ালন্দে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সকলে আমাদের বাসায় পৌছিলেন। আমার বড়দাদা এবং আমাদের বাসার সকলে হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাত্রিতে কাঙাল হরিনাথ বড়দাদার নিকট স্থানীয় দলাদলির কথা সমস্ত শুনিলেন। তাহার পর যখন সকলে শয়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন কাঙাল আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি এখানকার দলাদলি মিটাইয়া দিয়া তবে বাড়ী যাইব।" আমি বলিলাম "পারিবেন কি ?" তিনি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন "নিশ্চয়ই পারিব। দেখতে পাচ্ছিস্ না, কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্। এই ফিকিরচাঁদ অস্ত্রে তোরা যে পৃথিবী জয় ক'রতে পারিস, এ কথা কি এখনও বুঝতে পারিস নাই।" কাঙালের কথাগুলি আমার নিকট দৈববাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, জীবনের উপর দিয়া কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এখনও কাঙালের সেই রাত্রির মূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত রহিয়াছে। কত কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কত লোকের কত উপকার বিস্মৃত হইয়াছি। তখনকার নিষ্কলঙ্ক জীবন কত কলঙ্ককালিমায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঙালের সে দিনের সে মূর্ত্তি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই বলিয়াই কাঙালের এত শিষ্য থাকিতে সর্বাপেক্ষা অযোগ্য আমি তাঁহার জীবনকথা কীর্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছি ; কাঙালের সেই গৌরকান্তি, সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু, সেই তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি তখন যেন এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে পূর্ণ হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছিল এই মূর্ত্তির সম্মুখে পাপ, তাপ, মলিনতা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না। এই মুখের বাণী শুনিলে সকলকেই অবনত মস্তক হইতেই হয়।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কাঙাল বলিলেন "কী ভাবছিস্ ?" আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম "না, তেমন কিছু না।" কাঙাল আমাকে আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি আমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমার দিদিকে ডাকিলেন। আমার দিদি কাঙালের বড়ই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কাঙাল যখন প্রথম কুমারখালিতে বালিকা

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন প্রথম যে কয়েকটি ছাত্রী ছিল তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতমা। আমার এই দিদিকে কাঙাল মৃত্যুকাল পর্যন্ত একইভাবে দেখিয়াছিলেন।

আমার দিদিকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, আমি একটা গান বাঁধব, তুই লেখ দেখি।" দিদি তখন তাড়াতাড়ি উঠানেই আসন পাতিয়া দিলেন এবং নিজে কাগজ কলম লইয়া বসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা এবং আমি উঠানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাঙাল সুর করিয়া গান বলিয়া যাইতে লাগিলেন। গানটি এই :

"ও ভাই বল্‌রে বল্ সবাই রে।
দলাদলি, গালাগালি, ধর্মের কি ফল রে।
স্ত্রী-পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে;

এখন সাকার আর নিরাকার তুলে,
দিচ্ছ খড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে,
বাতাস দিয়ে অনলে হাসে শত্রুদল রে।

অসীম আকাশ মাথার 'পরে,
দেখ একবার বিচার ক'রে,
সূর্য তারা ঘোরে ফিরে, উদয় অস্তাচল রে,
ওরে, তারার মাঝে যারা আছে,
দেখ্ তিনিও আছেন তাদের কাছে,
কেউ নেই তাঁর আগে পিছে, সমান তাঁর সকল রে।

কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাই হয়রে কথায়,
ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে কেবল রে;

ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি,
সেই ভাবে তার হৃদ্-মন্দিরে,
নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে করেন যে শীতল রে।

শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্মকথন সকলি বিফল রে;

ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়,
কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর,
বৃথা তর্ক বিচার ছাড় বুদ্ধির কৌশল রে।
যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে,
যদি সিদ্ধ হও ভাই সাধন ক'রে,
তখন বক্তৃতা ক'রে, খাবে না আর জল রে ;
তখন একটি কথার তেজোবলে,
কত পাষাণ শিলা যাবে গ'লে,
হবে এক সত্য বলে পূর্ণ ধরাতল-রে।
কাঙাল কয় সকাতরে, ভারতের পায় ধ'রে,
সাধনহীন এ বিচারে হবে গণ্ডগোল রে ;
ওরে, সাধন ক'রে সযতনে,
যিনি পেয়েছেন সেই সত্যধনে,
তাঁর উপদেশ বিনে সকলই গরল রে।"

কাঙালের গানের শব্দ পাইয়া দলের যাঁহারা বাহিরে নিদ্রা যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; সকলে আমাদের বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আর কি—ঐ গান আরম্ভ হইল। আমার দাদা একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া কাগজ দেখিয়া গানের কথাগুলি বলিয়া দিতে লাগিলেন, আর দলের লোকেরা গান করিতে লাগিল। তখন পাড়ার সকলে ছুটিয়া আসিল ; আমাদের বাড়ীর উঠানে আর লোক ধরে না ; বাড়ীর মেয়েরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, লজ্জা, সঙ্কোচ কিছুই তখন থাকিল না। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! আমি অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম—বুঝিতে পারিলাম কাঙালের একটু পূর্ব্বের সেই কথা, "দেখতে পাচ্ছিস্ না কি অমোঘ অস্ত্র তোরা আমার হাতে দিইছিস্।"

রাত্রি বোধহয় এগারটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল তবুও গান থামে না ; একজন যদি চুপ করে, তবে আর একজন গান ধরে। চারিটি গানেই রাত্রি শেষ হইবার রকম হইল। তিনটার পর কাঙালের হুঁষ হইল, তিনি তখন প্রকৃতিস্থ হইলেন। যেন কোন্ এক আনন্দলোক হইতে আবার আমাদের পৃথিবীতে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। গান ভাঙ্গিয়া গেল,

কাঙাল বিশ্রাম করিতে গেলেন। দলের অন্যান্য লোকেরও বিশ্রাম করিতে গেল।

তখন আমি আর প্রফুল্লচন্দ্র বাহিরে যাইয়া ঘাসের উপর বসিলাম। প্রফুল্ল বলিলেন, "আজ রাত্রিতে আর ঘুম হইবে না, এস আমরা বসিয়াই রাত কাটাই।" কিন্তু কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়। প্রফুল্ল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কালকের জন্যে আমিও একটা গান বাঁধি।" আমি বলিলাম "বেশ।" তখনই কাগজ কলম আলো ঘাসের মাঠে আনিয়া দিলাম; প্রফুল্লচন্দ্র গান বাঁধিলেন। সে গানটি এই—

"আছে কি কোন·ঠিক তার,
কখন তোমার নথী উঠে পেশ হইবে।
কিবা রাত কিবা সকালে, সাঁজ বিকালে,
যে কালে সে মন করিবে .
তখনই নথী ধরে, অবোধ তোরে,
জবাব দিতে তলব দিবে।
সে তলব চিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে,
যখন ধেয়ে দূত আসিবে ;
তখন তোর আত্ম-স্বজন, স্ত্রী-পরিজন,
ক'রে যতন কে ঠেকাবে।
যখন সেই আদালতে জজের হাতে,
অবোধ রে তোর বিচার হবে·;
তখন তোর সপক্ষেতে সাক্ষী দিতে,
ঝুটো কথা কে বলিবে।
যাদের তুই ভেবে আপন, করিস যতন,
তারা আপন না হইবে,
দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে ছয় সাক্ষীতে,
তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেবে।
যাদের তুই হেলা করিস্, দেখতে নারিস্,
দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে ;
হয়ত তার কেহ গিয়ে তোমার হ'য়ে
ঝুটো কথা তাঁয় বলিবে।

ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়ার হ'য়ে,
কি ব'লে জ'ব তখন দেবে ;
হ'লে জ'ব খেঁচা নেষা সাক্ষী কাঁচা,
পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে।"

এই গানটি শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। গোয়ালন্দ সাব-ডিভিসন স্থান ; সেখানে আমাদের পাড়ায় দিনরাত্রি শুধু মামলা আর মোকর্দ্দমা, মোকর্দ্দমা আর মামলা, শুধু হাকিম আর শামলা। এ অবস্থায় শেষ মামলার সম্বন্ধে উকিল মোক্তার বাবুদিগকে সজাগ করিয়া দেওয়া বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

যাহা হউক, পরের দিন প্রাতঃকাল হইতেই গান আরম্ভ হইল। সেদিন রবিবার ছিল, কাছারী সমস্তই বন্ধ। কাহাকেও সংবাদ দিতে হইল না, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে হইল না ; কাঙালের গৃহে কাঙালের গান, তাহাতে আর নিমন্ত্রণ কি !

কিসে কি হয়, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় গান আরম্ভ হইয়াছিল, অপরাহ্নে তিনটা বাজিয়া যায় তবুও কেহ উঠে না। ব্রাহ্মদল, হিন্দুদল সকলেই উপস্থিত। যে কয়জন প্রধান উকিল হিন্দুদলের নেতা ছিলেন, তাঁহারা ঐ যে আসিয়া বসিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। সকলের প্রাণ মন ভিজিয়া গেল ; কোন দলাদলি, কোন প্রকার হিংসা দ্বেষ কিছুই কাহারও মনে থাকিল না। তিনটার সময় যখন গান ভাঙ্গিয়া গেল, তখন কাঙালের নিকট সকলেই উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন করযোড়ে সকলকে বলিলেন "আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।" বড় বড় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যাঁহারা হিন্দু সমাজপতি তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "অমন কথা বলিবেন না, আপনি কি অনুমতি করিবেন বলুন।" কাঙাল সহাস্য বদনে বলিলেন, "আমার বড় সাধ যে, আজ রাত্রিতে আমার এই ভাইয়ের বাড়িতে আপনারা সকলে প্রীতি-ভোজন করেন।" তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন ; এত দলাদলি, এত যে হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া, এত যে ঠাট্টাবিদ্রূপ, সে সব কোথায় চলিয়া গেল। সকলেই সাগ্রহে বলিলেন, "রাত্রিতে গানের পর আমরা সকলেই এখানে জলযোগ করিব।" আমার তখন ইংরাজ কবির সেই কথা মনে হইল :—

**Those who came to scoff**
**Remained to pray.**

তখন আমাদের ন্যায় গরীবের ক্ষুদ্র কুটীরে মহোৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। আমাদের বন্ধুগণ, আমাদের প্রিয় ছাত্রগণ তখন পরম উৎসাহে মহোৎসবের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে কে কি পাঠাইতে লাগিলেন, কে কি আনিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা হইল না। আমরা দরিদ্র ব্যক্তি; আমাদের সাধ্য কি যে এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইল না, যাঁহার কার্য—যাঁহার মহোৎসব, তিনিই সমস্ত যোগাইয়া দিতে লাগিলেন। দ্রব্যের অভাব হইল না—আমার এক একটি বালক ছাত্র তিনটি যুবকের কার্য একাকী করিতে লাগিলেন।

পাঁচটার সময় আবার গান আরম্ভ হইল। এবার অন্য রকমের গান হইতে লাগিল। এবার ফিকিরচাঁদ শুধু মায়ের নাম-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই 'মা' নাম শুনিয়া পাষাণও গলিয়া যায়, মানুষ ত দূরের কথা। আমাদের মনে হইতে লাগিল সে স্থানের গগন-পবন যেন 'মা' নামে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে সমস্ত প্রকৃতি যেন 'মা' নাম গান করিতেছে। এক একবার সমবেত জনমণ্ডলী যখন উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন "মাগো মা" তখন মনে হইতে লাগিল, মা ব্রহ্মময়ী যেন সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অভয় প্রদান করিতেছেন। সত্য সত্যই ফিকিরচাঁদের গানে তখন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

রাত্রি এগারটার সময় গান শেষ হইল। তখন প্রীতিভোজন। সেও এক আশ্চর্য দৃশ্য। কিছু বিচার নাই, অহঙ্কার নাই, কোন গর্ব নাই—সে সময় সব এক হইয়া গেল। মৃত্তিকাসনে বসিয়া ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলে জলযোগ করিলেন। সকলেরই হৃদয় তখন মায়ের নামে নৃত্য করিতেছিল, তখন কি আর ভেদাভেদ থাকে? মায়ের এমনই খেলা বটে! কাঙাল এই মহোৎসব ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আর এক একবার বলিতে লাগিলেন—"এ যে আনন্দ-বাজার!"

আমার জন্মভূমি কুমারখালি থেকে প্রকাশিত এবং আমার শিক্ষাগুরু ও জীবনের আদর্শ—কাঙাল হরিনাথ (তখন শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়) সম্পাদিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার কথা পূর্বেই বলা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত দু' এক স্থলে তার উল্লেখও করেছি, কিন্তু "গ্রামবার্ত্তা"র ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ করিনি। এই স্থানে সেই কাজটা শেষ করি।

আমি আমার সাহিত্যসেবার প্রেরণা পেয়েছিলাম কাঙাল হরিনাথের কাছে। আর সুযোগ পেয়েছিলাম—"গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"র মধ্য দিয়ে। "গ্রামবার্ত্তা"র জীবনের শেষ দুই বৎসর আমি নানা ভাবে ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং তার অন্তিম সৎকার আমার ও আর দু' চারজন বন্ধুর হাতেই হয়। সুতরাং, "গ্রামবার্ত্তা"র কথা বলতে গেলে আমার জীবনের একটা প্রধান কথা।

বড়ই আনন্দের কথা যে, "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র বিবরণ প্রকাশ করবার জন্য আমাকে আয়াস স্বীকার করতে হবে না। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক—আমার পরম স্নেহভাজন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়া বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত বাংলায় মুদ্রিত সাময়িক পত্রের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তিনি প্রকাশ করেছেন। "গ্রামবার্ত্তা" ঐ সময়ের পরে প্রকাশিত হওয়ার জন্য শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রকাশিত ১ম খণ্ডে তার স্থান পায়নি। কিন্তু শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র দ্বিচত্বারিংশ ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডে "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র একটি বিবরণ প্রকাশিত করেছেন। এই বিবরণটি উদ্ধৃত করে' দিলেই "গ্রামবার্ত্তা" সম্বন্ধে সকল বিবরণই পাঠকগণ জানতে পারবেন। ইহার সংগ্রহে কাঙালের ভ্রাতুষ্পুত্র পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান ভোলানাথ মজুমদার সাহায্য করেছেন। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের ন্যায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের বিবরণ যে অভ্রান্ত, এ কথা আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি। নিম্নে সেই সঙ্কলিত বিবরণই প্রদত্ত হ'ল :—

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে ( বৈশাখ ১২৭০ ) কুমারখালীর বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার ( কাঙাল হরিনাথ ) 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' ( ১ জুন, ১৮৮৩ ) লেখেন—

"গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"। ইহা অভিনব মাসিক সমাচারপত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যারত্ন যন্ত্র' হইতে প্রচারিত হইতেছে। কুমারখালিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে।

সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।"

"গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত :

"গুণালোকপ্রদা দোষ-প্রদোষ-ধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥"

১২৭৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পরিচালনা করিয়া কাঙাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। এই কারণে নয় বৎসর কায়ক্লেশে কাগজখানি চালাইবার পর তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা চাঁদা করিয়া কাগজখানি বজায় রাখেন। ১২৮০ সালের ৬ই বৈশাখ ( ১৭ এপ্রিল ১৮৭৩ ) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্বক এই পত্রিকাখানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং পত্রিকায় সেইরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায়, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকাখানি আপাততঃ রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [ স্থাপন করিবার ] উদ্যোগ করিতেছেন।"

এই সংখ্যা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :

"কুমারখালি—প্রতিবাদ।...গতকল্য গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায়, সকল সভ্যগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...কেষাঞ্চিৎ কুমারখালীবাসিনাম্।"

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙাল হরিনাথ কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র (মথুরানাথ-যন্ত্র) স্থাপন করেন, অতঃপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতেই 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' মুদ্রিত হইতে থাকে। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ :—

"সংবাদ।...আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদপত্র 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা' উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।"

১২৮১ সালের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" লেখা আছে ; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উপর লেখা আছে "১২ ভাগ—২য় সংখ্যা"। তবে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত না হওয়ায়, ১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় লেখা আছে "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"। ঐ সংখ্যার সম্পাদক কৈফিয়ত দিতেছেন :

"গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক নির্দয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্যদানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এতদিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না।......আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।"

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলে। তাহার পর পুনরায় বৈশাখ হইতে উহার বৎসর গণনা করা হয়।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় গ্রাহকগণকে জানাইতেছেন :

"গ্রাহকগণ! অনুগ্রহপ্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।"

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন:

"নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই,—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। এক দিকে ভারতাকাশে মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার জন্য উদ্যত বজ্রের ন্যায় গর্জন * এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সংবাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্যদিকে তাহাব প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণের মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ।...গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।"

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হইলে, ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—'গ্রামবার্ত্তা'র দরদী বান্ধবগণের যত্ন ও চেষ্টায়। তখন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর জলধর সেন ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯২ সালে আশ্বিন মাসে।

কাঙাল হরিনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করা হইল:

"আমি শুনিলাম, বাংলা সংবাবপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার ধর্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' রাখিয়া গিরিশযন্ত্রের কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রতিশ্রুত করাইলাম॥ (১১২৪ পৃঃ)

"কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

---

* বড়লাট লর্ড লিটনের শাসনকালে।

কলিকাতায় নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায়, (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈতৃক বিষয়কার্য করিয়া উন্নতিপ্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদপত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভগ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব। (১৪২৫-২৬ পৃঃ)

" 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিক হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কার্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বারশত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমত মাসে একবার চারি ফর্মা করিয়া 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসর পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন, সুতরাং 'গ্রামবার্ত্তা' প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারণী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য আরম্ভ করিতে আগু টাকার প্রয়োজন হইল না।...[ ১৪২৭-২৮ পৃঃ ]

"গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শ লিপি অর্থাৎ কপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [ ১৪৩০ পৃঃ ] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।···অতএব আমি শ্যামও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া···পাঠশালার কার্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম [ ১৪৩২ পৃঃ ]

"আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন, দুই দিনের দূরবর্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই একজন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকার লেফাফা লেখক ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [ ১৪৩১ পৃঃ ]

"···এতদিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে-প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না···'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'ই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান্ কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপ প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুইশত হইতে দশ টাকা পর্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে···[ ১২৭৪ ? ] সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' পক্ষান্তরে প্রচারের করিয়া তাহার কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। [ ১৪৪২ পৃঃ ] প্রায় দুইমাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা হইবে" অন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম, সন্দেহ

নাই।...কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০্ একশত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০্ দুইশত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি একশত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই একশত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০্ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [ ১৪৪৩ পৃঃ ] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে, এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই। তবে এস্থলে কেবল এই মাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের-হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনা সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্মনীতি-সাহিত্য ব্যতীত পূর্ববৎ আর সকলেরই [ ১৪৪৪ পৃঃ ] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [ ১৪৪৫ পৃঃ ]

"কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসরমত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও-পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী

লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিলাম। [ ১৪৬২-৩ ]...

"চারিদিকে পুস্তকবিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকাস্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই।...এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায়চৌধুরীর দান [ মাসিক ১০, ] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল [ ১৪৯১ পৃঃ ]...

"রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালীর সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অন্যূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [ ১৬৭৩ পৃঃ ] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০, ছয়শত টাকা...আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন।...উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকার প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালিত এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [ ১৬৭৪ পৃঃ ] 'মথুরানাথ-যন্ত্র' নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [ ১৬৭৫ পৃঃ ]...

"আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্মচারী অন্য ৬।৭টি পরিবারের অন্নসংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদসঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [ ১৬৮১ পৃঃ ]

"আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য নির্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য নির্বাহ করিলে, আমি কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্বশুদ্ধ ১২০০৲ বারশত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্ধক্য জরার নিকটবর্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। [ ১৬৮৪ পৃঃ ]

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ কাঙাল হরিনাথের স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরী থেকে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করেছেন! কাঙালের এই বিস্তৃত ডায়েরী আমাদের এক অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু সেই ডায়েরী আদ্যোপান্ত প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। তাহাতে নানা বিপদ-আপদের সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে কাঙালের ডায়েরী তাঁর পরলোকগমনের পর এই সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় প'ড়েই রয়েছে। আমরা কেউই সেই ডায়েরী আমূল প্রকাশের চেষ্টা করিনি এবং ভবিষ্যতেও করব না। সেই ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' সম্বন্ধে যে কথাগুলি আছে, শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক স্থল বাদ দিয়া প্রকাশ করেছেন।

ঐ ডায়েরী উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকে তিনি বলেছেন, 'পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু'একজন বন্ধু 'গ্রামবার্ত্তার' শেষ ভার গ্রহণ করেছিলেন।' সেই আরও দু'একজন বন্ধুর মধ্যে আমিও একজন। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। "গ্রামবার্ত্তা"র যা কিছু কাজ, পূজনীয় প্রসন্ন পণ্ডিত মশাই করতেন। আমি প্রতি শনিবার রাত্রে গোয়ালন্দ মেলে কুমার-খালীতে আসতাম, পরদিন রবিবারে পণ্ডিত মহাশয়কে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। পণ্ডিত মহাশয় সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হননি। তাই শেষের দু'বছর আমার নামই সম্পাদক হিসাবে ছিল। কাজ যা কিছু পণ্ডিত মহাশয়ই করতেন—এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তাঁর মূল্যবান্ সাহায্য পণ্ডিত মহাশয় পেতেন।

এইখানে আর একটি কথার উল্লেখ করে'ই "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা"র সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা শেষ করব। আমি যখন "গ্রামবার্ত্তা"র তথাকথিত সম্পাদক,

তখন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ এদেশ ত্যাগ করে' যান। তিনি দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কলিকাতায় ফিরে এসেই দেশে চলে যান।

যেদিন তিনি দার্জ্জিলিং থেকে কলিকাতায় যান, সেদিন আমরা একটা গান ছাপিয়ে নিয়ে সদল বলে পোড়াদহ ষ্টেশনে যাই। লাট সাহেবের স্পেশাল ট্রেণ পোড়াদহে দু'মিনিট থামবার কথা—কিন্তু গাড়ী পৌছতে না পৌছতেই, আমরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইতে আরম্ভ করি। স্পেশাল ট্রেণের সাহেবরা, হয়ত লাট সাহেব স্বয়ংও গাড়ী থেকে মুখ বা'ড়িয়ে, এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে থাকেন। তাতে স্পেশাল ট্রেণ আরও তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা গানটি বাংলায় ছাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং তার ইংরাজী অনুবাদও ছাপিয়েছিলাম। স্পেশাল ট্রেণের প্রত্যেক কামরায় সেই ইংরাজী-বাংলা-ছাপানো কাগজ আমরা ১৫।২০ খানা ফেলে দিয়েছিলাম। তার পরদিনই আমি কলিকাতায় গিয়ে একখানি আবেদনপত্রের সঙ্গে ছাপান গান গেঁথে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে বড়লাট বাহাদুরের চীফ্ সেক্রেটারির নিকট পাঠাই।

কয়েকদিন পরেই প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে' আমাদের সেই পত্রের উত্তর দেন। নিম্নে সেই বাংলা গানটি উদ্ধৃত করে' দেবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারলাম না।

"দেশে চলিলে মহামতি রিপণ !
রাম-রাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।

১। সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে
( তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি )
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

২। আমরা কাঙ্গাল বেশে, এসেছি তব উদ্দেশে,
( হের কৃপানয়নে, সাধারণ দেশের দশা )
দেশের দশা প্রকাশ বেশে কর নিরীক্ষণ।

৩। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, দেখাতে নাহি ক্ষমতা,
( আমরা পল্লীবাসী হে ), ( জ্ঞান অর্থহীন )
( ধর চক্ষের জল হে ), ( অন্য সম্বল নাই )
রাজভক্তি সরলতা ভারতবাসীর ধন।

৪। ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বল তখন।
( কেবল নাম রয়েছে, সোনার ভারত )
( সকল হারায়েছে )
সোণার খনি নাই আর এখন ভারত-ভুবন!

৫। দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্ন বিনা প্রজা মরে,
( মায়ের কাছে বল এই, ভিক্টোরিয়া )
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ।

৬। সহায়হীনা গুরুরমণি, পরম সতীরমণী,
( তার কি দশা হল হায়! ) ( বলতে হৃদয় ফাটে )
হারিয়ে সতীত্বমণি বধিল জীবন।

'। আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর,
( কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান )
:দেশে গিয়ে গুণাকর, করিবে স্মরণ।

-। ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ,
( তাদের এ কি দশা হে ) ( মহারাণীর প্রজা হয়ে )
পশুহস্তে প্রজাবৃন্দ হারায় জীবন।

৯। রাজরাজেশ্বরী হয়ে, থাকুক মাতা ভিক্টোরিয়া,
( প্রার্থনা করি এই বিভুপদে )
এ অত্যাচার দয়া করে' করুন নিবারণ।

১০। তিনি তোমায় করুন রক্ষে, স্থলে জলে, অন্তরীক্ষে,
( যিনি আত্মাতে আত্মা:, এ চরাচরের )
কাঙাল ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।

এই খানে ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউলের দলের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করছি ( ১৭—২৯ পৃষ্ঠা )।

একবার গ্রীষ্মের অবকাশের সময়ে শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে ( কুমারখালীতে ) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুল-মাষ্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে আসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের 'গ্রামবার্ত্তা প্রবেশিকা' পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময়েআমোদ-আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।

এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া, 'গ্রামবার্ত্তা'র

কপি লেখা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা হাত-পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান 'গ্রামবার্ত্তা'র অফিস অর্থাৎ কাঙাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয়কুমার, 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালি বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতেরা ব্যাকরণে বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই কাঙালের শিষ্য। সকলেই গান করিতে পারিত। চুপ করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কি করা যায়, ইহা লইয়াই তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে, তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না!" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির-নামক একজন ফকির কাঙালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। লালন ফকির কুমারখালির অদূরবর্ত্তী কালাগঙ্গার তীরে বাস কবিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। তিনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা বলা বড় কঠিন, কারণ তিনি সকল সম্প্রদায়ের অতীত রাজ্যে পৌছিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতেন না, ধর্মকথাও বলিতেন না। তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল, তাহা বাউলের গান। তিনি সেই সকল গান কবিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। শুনিয়াছি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুটিতে লালন ফকির একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল; ইহার মধ্যে কেহ স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই লালন ফকিব কাঙালের কুটীরে, আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিনই আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গান করিয়াছিলেন। সব কয়টি গান এখন আর আমাব সঠিকভাবে মনে নাই; একটি গান মনে আছে, যথা—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে;
আমার ঘরের কাছে আরসী-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে।
গ্রাম বেড়ে অগাধ পাণি,
তার নাই কিনারা, নাই তরণী পারের;

আমি মনে দেখ্‌ব তারি,
আমি কেমনে সেথা যাই রে !
বলব কি পড়সীর কথা তার,
হস্ত, পদ, স্কন্ধ কিছুই নাই রে ;
সে যে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক থাকে নীরে।
সেই পড়সী যদি আমার হ'ত
তবে যম-যাতনা সকল যেত দূরে ;
আবার, সেই আর লালন এক স্থানেই রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥"

প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা সে গানের মর্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে শ্রীমান্ অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ সেই লালন ফকিরের গানের কথা উদিত হইয়াছিল। তাই সে বলিয়া বসিল "একটা বাউলের দল করিলে হয় না ?" সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন "বেশ, বেশ !"

"বেশ, বেশ" বলাটা খুব সহজ ; কিন্তু গান কোথায় ? বাউলের গান তখন তেমন প্রচলিত হয় নাই। ক্বচিৎ কখনও দুই একজন ফকির বা দরবেশের মুখে এক আধটা দেহতত্ত্বের গান আমরা শুনিয়াছি। সে সকল গান কাহারও মনে ছিল না। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বলিলেন "নূতন করিয়া গান প্রস্তুত করিতে হইবে।" শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার না পারেন, এমন কার্যই নাই। তখনও তিনি যেমন ছিলেন এখনও তাই। বয়সের পরিণতিতে সে ভাবটা এখনও যায় নাই। তিনি যাহা ধরেন, তাহাই করিতে পারেন। অক্ষয়কুমার বলিলেন, "তার জন্য ভয় কি ? ধর্ ত জলদা, কাগজ ; বাউলের গানই লেখা যাক্ !" আমি তখন কাগজ-কলম লইয়া বসিলাম। 'গ্রামবার্ত্তা'র কপি লিখিবার জন্য যে কাগজ গুছাইয়া বসিয়াছিলাম তাহারই শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। অক্ষয়কুমার বলিলেন—

"ভাব মন দিবানিশি, অশিবনাশি,
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর-ডাকাতে কোনমতে,
ছোঁবে না রে সোনাদানা ॥

সেই পথে মনোসাধে চল্‌রে, পাগল,
ছাড়, ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকাপথে দিনে রেতে,
চোর-ডাকাতে দেয় যাতনা ;
আবার রে ছয়টি চোরে ঘুরে ফিরে
লয়রে কেড়ে সব সাধনা॥

এই পর্যন্ত লেখা হলেই অক্ষয় বলিলেন, "এতদূর তো হল, তার পর?" তারপর—আবার কি? গানটা গাওয়া হবে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "কথাটি বুঝলে না! বাউলের গানের নিয়ম হচ্ছে এই যে গানের শেষে একটা ভণিতা দিতে হয়। কেমন?" অক্ষয় বলিলেন, "সেই কথাই ত ভাবছি।" তখন এক এক জন এক একটা নাম বলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই 'ভোটে' টিকিল না। আমি বললাম, "অত লোকে কাজ কি! গানটি নিয়ে কাঙালের কাছে যাই, তিনি শেষ অন্তরা এবং ভণিতা ঠিক ক'রে নেবেন।" অক্ষয় বলিলেন, "তা হবে না ; তাঁকে একবারে Surprise (অবাক) করতে হবে। রও না, আমিই একটি নূতন নাম ঠিক করেছি।" এই বলিয়া একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন "লেখ জলদা"। আমি কলম ধরলাম, অক্ষয় শেষ অন্তরা ধরিলেন :

"ফিকির চাঁদ ফকির কয় তাই,
কি কর ভাই, মিছামিছি করি ভাবনা—
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে,—
এ যাতনা আর রবে না।"

ব্যস্। গানের ভণিতা হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন "ফিকির চাঁদ" নামটি ঠিকই হইয়াছে। আমাদের ত ধর্মভাব ছিল না, কেনও "ফিকিরে" সময় কাটানই আমাদের উদ্দেশ্য। "ফিকির চাঁদ" নামের ইহাই ইতিহাস।

গানটা হইয়া গেল ; তখন আমাদের মধ্যে-পাকা ওস্তাদ প্রফুল্লচন্দ্র গানের সুর দিলেন। সুরটি নূতন কি পুরাতন, তাহা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু পুরাতন হইলেও, ঐ সুর বড়ই বাড়িয়া উঠিল। পরে সমস্ত বাঙ্গালাদেশ ঐ সুরেই মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সেই দ্বিপ্রহরে আমাদের মজ্‌লিসে যখন গানের রিহর্সেল দেওয়া শেষ হইল,

তখন স্থির হইল গানটি একবার কাঙ্গালকে শুনাইতে হইবে। আমরা সকলে তখন দল বাঁধিয়া বাড়ীর মধ্যে কাঙ্গালের জীর্ণ খড়ের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তখন কি যেন লিখিতেছিলেন। এত বড় একটা রেজিমেণ্টকে অসময়ে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি, তোদের আবার তর্ক বেঁধেছে নাকি! তোদের জালায় দেখছি একটু স্থির হইয়া কাজ করবার যো নাই। কি ব্যাপার বল্‌ত?" তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আমাদের মুখপাত্রস্বরূপ (কারণ তিনি তখন বি, এল পড়েন, লায়েক হইয়াছেন) বলিলেন, "আমরা একটা বাউলের দল করব। তার জন্য একটি গান লিখছি।"

গানের কথা শুনিলে কাঙাল শত রাজার ধন হাতে পাইতেন। তিনি অমনি পরম উৎসাহে বলিলেন "গান লিখেছিস? সুর বসানো হয়েছে?" প্রফুল্ল বলিলেন "সব হয়েছে, এখন শুধু আপনার শোনা বাকি।" তখন তিনি বলিলেন "বেশ, বেশ, সকলে মিলে গা দেখি" আমরা সকলে গান ধরলাম। গানের মুখটুকু তিনি বসিয়া বসিয়াই শুনিলেন, তারপর যখন অন্তরা ধরা হইল, তখন আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। আমরা ত দাঁড়াইয়াই আছি তাহার পর গান আর নৃত্য—নৃত্য আর গান। সে এক অপার্থিব দৃশ্য।

শেষে গান থামিলে কাঙাল বলিলেন—"দেখ, এই গানে দেশ ভেসে যাবে। তা' একটা গান নিয়ে ত আর বাহির হওয়া যায় না। আমিও একটা গান দিই। অক্ষয়, কাগজ-কলম ধর্‌ত।"

তখন অক্ষয় কাগজ-কলম ধরিলেন। কাঙাল প্রথমে একটু গুণ-গুণ করিয়া সুর ভাঁজিলেন, তারপর গাইতে লাগিলেন, অক্ষয় লিখিতে লাগিলেন:—

"আমি করব এ রাখালী কত কাল।
পালের ছটা গরু ছুটে' করছে আমায় হাল-বেহাল
আমি গাদা করে নাদা পুরে রে, কত যত্ন করে খোল বিচালী
খেতে দিবে ঘরে,
তারা ছটা যে গু-খেকো গরু রে, তারা নরক খায় রে হামেহাল।
কাঙাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও আর
পারিনে গরু চরাতে,
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, তাই কর দীন দয়াল"

এইটি দ্বিতীয় গান। এই দুইটি গান লইয়া প্রথম প্রেসের ভূতে সন্ধ্যার

সময়ে গ্রামের বাহির হইলেন। সেই নিদাঘের সন্ধ্যারী সময়ে যখন আলখাল্লা পরিধান করিয়া, মুখে কৃত্রিম দাড়ী লাগাইয়া নগ্নপদে গ্রামবার্ত্তার প্রেস হইতে ভূতের দল বাহির হইল এবং খঞ্জনী একতারা ও গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গান ধরিল—

—"ভাব মন দিবানিশি"—

দুইটি গান লইয়া বাউলের দল প্রথমে বাহির হইল; কিন্তু দুইটি গানে লোকের পিপাসা মিটিল না; দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই কুমারখালী গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী কুড়ি-পঁচিশখানি গ্রামের আবালবৃদ্ধ গান দুইটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। আমরা যখন যেখানে যাইতাম, শুধু শুনিতাম, কেহ গাহিতেছে—

"ভাব মন দিবানিশি"

অথবা আর কেহ গাহিতেছে—

"আমি করব এ রাখালী কত কাল।"

তখন শ্রীমান্ অক্ষয়কে আরও গান বাঁধিবার জন্য বলা হইল অক্ষয় অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "আমি আর বাঁধিব না; দেখিতেছ না এ গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন 'কাঙাল' ব্যতীত এ স্রোতের মুখে আর কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না! এখন ইহার পশ্চাতে সাধনার বল থাকা চাই, নতুবা চলিবে না।"

অক্ষয় যখন জবাব দিলেন, তখন আমাদের ভূতের দলের সর্দার প্রসিদ্ধ গায়ক (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অগ্রসর হইলেন; তিনি বলিলেন "আমি গান বাঁধিব।" যে বলা, সেই কাজ। প্রফুল্ল গান গাহিতে পারিত। প্রেসের প্রিণ্টারের প্রাণে যে ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। প্রফুল্ল পনর মিনিটের মধ্যে একটা গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, তাঁহার কৃপা হইলে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রফুল্লের গানটা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গানটি এই—

"ভাবীদিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, দেখ রে আমার মন পামরা!

১। আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা;
যখন তোর হাত ধরিতে, তর্জ্জনীতে, না করিবে নাড়াচাড়া।

২। যখন তোর সকল অঙ্গ অবশ হ'য়ে, প'ড়ে রবে ধরা;
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে না পাইবে সাড়া।

৩। যে গলার মধুর স্বরে, জগতের মাতাস্ ওরে ঘাটে পড়া ;
তখন তোয় সেই স্বরেতে থেকে থেকে রব করিবে ঘড়াৎ-ঘড়া।
৪। তাই বলি, যাই দেখি চল্ সত্য পথে নিত্য-নগরেতে মোরা ;
শুনেছি সেই ধামেতে এই রূপেতে যবে নাবে মানুষ যারা।"

প্রফুল্লচন্দ্র এই গানটি রচনা করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে কোন ভণিতা দিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আমার এই প্রথম গানে ভণিতা দিব না। এ-গান আমার রচনা নহে ; আমার সাধ্য কি যে, আমি এই গান রচনা করি। যিনি আমার মুখ দিয়ে, আমার মত মহাপাপী ও দুশ্চরিত্রের মুখ দিয়ে এ গান বাহির করে দিয়েছেন, তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভণিতা দিবেন।' তাই এই গানটির কোন ভণিতা নাই ; কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন এই গানটি লইয়া ফকিরের দল গ্রামে বাহির হইলেন, তখন এই গান শুনিয়া লোকে একেবারে অধীর হইয়া গেল। যে একবার শুনিল, সে দ্বিতীয়বারের জন্য দলের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কাঙ্গালের কুটীর হইতে গ্রামের দল বাহির হইয়া যখন বাজারে পৌঁছিল, তখন লোকারণ্য, দূর গ্রাম হইতে লোকেরা এই দলের গান শুনিবার জন্য বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বাজারের উপর যখন এই গানটি আগাগোড়া গীত হইল, তখন কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না ; সকলেরই প্রাণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল আমি অনেক দিন এমন জনসমারোহ দেখি নাই। আর বলিতে কি এমন প্রাণস্পর্শী গানও আমি কখনও শুনি নাই। এখনও আমার নয়ন সম্মুখে সেই দৃশ্য বর্ত্তমান দেখিতেছি। সে আজকালকার কথা নহে। ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল বাঙ্গালা ১২৮৭ সালে গঠিত হয়। আজ ৩৩ বৎসর পরেও আমি সেই দিনের দৃশ্য অবিকল দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি—একদল ফকির, সকলেরই গৈরিক আলখাল্লা পরা ; কাহারও মুখে কৃত্রিম দাড়ী, কাহারও মাথায় কৃত্রিম বাব্‌রী চুল, সকলেই নগ্নপদ। সম্মুখভাগে প্রফুল্লচন্দ্র, তাঁহার বাম পার্শ্বে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বানবারীলাল, দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ। প্রফুল্লচন্দ্র কৃত্রিম দাড়ী বা চুল পরিধান করিত না। সে গৌরকায় পুরুষ ছিল ; তাহার মুখে দাড়ী ছিল। আমি এখনও দেখিতে পাইতেছি, তিন ভাইয়ের হস্তে তিনখানি খঞ্জনী। সেই তিনখানি খঞ্জনীতে এক সঙ্গে ঘা পড়িতেছে, তার তিন ভাই প্রেমে মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিতেছে, আর গাহিতেছে—

"ভাবী দিন কি ভয়ঙ্কর—"

বলিতে কি, সে সময়ে আমাদের অঞ্চলের লোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কে জানিত যে, আমাদের অবসর সময়ের খেয়াল হইতে যে সামান্য গানটি বাহির হইয়াছিল, তাহার তেজ এত অধিক। কে জানিত যে, এই কাঙাল ফিকির চাঁদের সঙ্গীতে সমস্ত পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে। কে জানিত যে সামান্য বীজ হইতে এমন প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিবে। প্রিয়তম অক্ষয়কুমার সত্য সত্যই বলিয়াছেন যে, "এমন যে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এমন করিয়া যে দেশের জনসাধারণের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করা যায়, আমি জানতাম না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের গান বেশ হইয়াছে শুনিয়া সকলেরই মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তখন প্রফুল্লচন্দ্র পরম উৎসাহে আর একটী গান রচনা করিল এবং 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতা ব্যবহার করিল। সে গানটীও আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। গানটী এই—

"দেখ্ দেখি ভেবে ভেবে, কেবা রবে, যে দিন সে তলব দিবে।

১। কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকাকড়ি জুড়ী-গাড়ী কে হাঁকাবে,
বল্ দেখি চেন ঝুলান ঘড়ী তোমার সেই দিনেতে কে পরিবে।

২। কোথা তোর রবে মালা, কৌপীন-ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে,
তার কাছে ছাপাবার যো নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে কে ছাপাবে।

৩। ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, তা' হবার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে।
বিপদে তরবি যদি, নিরবধি, সেবিগে চল্ সত্য দেবে ( ও ভোলা মন )"

এখানে একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। উপরিলিখিত গানটিতে তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর একটু ইঙ্গিত আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, তিনি, যিনি এই গানের রচয়িতা, তিনি সত্য সত্যই কাহারও উপরে কটাক্ষ করেন নাই। আমাদের গ্রামটী বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সংখ্যা বেশী নহে, তিলি এবং তন্তুবায়গণের সংখ্যাই অধিক। কাঙ্গাল হরিনাথ তিলিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামে তিলিজাতিই বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন; তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাঁতি, কুমার, কামার ও অন্যান্য সকলেই বৈষ্ণব। সুতরাং আমাদের গ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এখনও আছে। এ অবস্থায় ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা বলিতে হইলে স্বতঃই কদাচারী বৈষ্ণবগণের কথাই মনে উঠিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের উপর আক্রমণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি নাই এবং এখনও করি না; প্রফুল্লচন্দ্রও তখন এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটু প্রতিবাদ হইয়াছে শুনিয়া কাঙাল হরিনাথ দুইটি গান দিলেন। এই দুইটি গান বড়ই সুন্দর। আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রথম গানটি এই—

"বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার, মনের মাঝে রোগের হাঁড়ী।
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার-বৈদ্য হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।
১। তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও, উপদেশ দাও নেড়ে দাড়ি;
তোমার যে আপন বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি।
২। তুমি এ রোগের জ্বালায় জ্বলছ সদাই, দেখে লোকের টাকাকড়ি,
তোর এ জ্বরবিকারে বৈদ্য যাবে, ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।
৩। কাঙাল কয় হও রে দৃঢ় ছাড়, ছাড় কুপথ্য, মিথ্যা ছল-চাতুরী;
এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে, খাও রে হরিনামের বড়ি।"

দ্বিতীয় গানটি এই-

"মজে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, কেন না মন সং সাজিলি।
১। মনরে এসে, হেসে হেসে, আগে কেশে কালী দিদি,
শরে মন বয়স-দোষে, বসে রসে, অবশেষে চুণ মাখিলি।
২। হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফিরত না ঢং, থাকত এক রং চিরকালই,
এখন তোর, কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা, ঠিক যে মাছরাঙ্গা হ'লি।
৩। যাবি তুই লেংঠা হ'য়ে লজ্জা খেয়ে, লেংঠা হয়ে যেমন এলি,
ওরে তোর কোপীন-কোঁচা, জামা মোজা, ঘোলে গোঁজা হয় সকলই।
৪। কাঙাল কয়, প্রেমভরে, সং সাজরে, গান কর রে বাহু তুলি,
যাদের নাই হরি-ভজন, সত্য-কথন, তারাই রে সং হয় কেবলই।"

ফিকিরচাঁদের গান সম্বন্ধে কাঙাল হরিনাথ তাঁহার তৎসময়ের দিনলিপিতে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমি এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কাঙাল লিখিতেছেন—

"শ্রীমান্ অক্ষয় ও শ্রীমান্ প্রফুল্লের গানগুলির মধ্যে আমি যে মাধুর্য পাইলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এভাবে সত্য জ্ঞান ও প্রেম-সাধনার তত্ত্ব প্রচার করিলে, পৃথিবীর কিঞ্চিৎ সেবা হইতে পারে অতএব কতিপয় গান রচনা দ্বারা তাহার স্রোত সত্য, জ্ঞান ও প্রেমসাধনের উপায়স্বরূপ পরমাত্ম পথে ফিরাইয়া আনিলাম এবং ফিকিরচাঁদের আগে 'কাঙাল' নাম দিয়া দলের নাম 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' রাখিয়া তদনুসারেই গীতাবলীর নাম করিলাম। কাঙাল ফিকিরচাঁদ

ফকিরের দলস্থ গায়কেরা বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হৃদয় যতই পবিত্র হইতে লাগিল, ততই সত্য জ্ঞান ও প্রেমময় গীতিসকল উদ্ভাসিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র সত্য, জ্ঞান ও প্রেমানন্দে পূর্ণ করিতে লাগিল। দলস্থ যাঁহারা যতদূর পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত বিষয়ে ততদূর এক আশ্চর্য শক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর-শ্রেণী সকলেই প্রার্থনাসহকারে ডাকিয়া কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণে দেশস্থ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং নানা প্রকারে হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি একাকী সকল আঘাত সহ্য করিতে লাগিলাম। তিলার্দ্ধ মাত্রও অবসর নাই। সংসারধর্ম ও সংসারধর্মের অতীত পরমার্থ পর্য্যন্ত যিনি যে কোন কার্য্য না করুন, জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিবে। প্রতিবাদ আছে বলিয়া এ জগতে এখনও কিছু দৃঢ়তা, পবিত্রতা রহিয়াছে, অন্যথা ইহাও থাকিত না। কৃতকার্যে যতই প্রতিবাদ হইতে থাকে, কার্যে ততই স্বতঃ দৃঢ়তা জন্মে। যিনি ফিকির করিয়া হাপরে স্বর্ণ দগ্ধ করিয়া খাঁটি করিবার জন্য এইরূপ দগ্ধ করিতেছেন, বিরলে কেবল তাঁহার উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া চক্ষের জলে বক্ষদেশ ভাসাইতে লাগিলাম।"

"আমি যে সময়ে এই অসহ্য যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইতেছি, সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তচূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া কুমারখালিতে আসিয়া কাঙালের কুটীরে সপরিবারে অবস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে না বলিলেও, তিনি নিজ প্রভাবেই আমার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনাপূর্বক এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, সর্বপ্রকার উত্তাপ সহ্য করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ ও পরিষ্কার কর। অমৃত ফল ফলিবে।"

"এই সময় একদিন আমার জ্বর বোধ হওয়ায় কুশাসনে শয়ন করিয়া আছি। ইহা ত শারীরিক কোন প্রকার জ্বর নহে, ইহা মর্মাঘাত ও চিন্তাজ্বর, অনলদগ্ধের মত দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং নিদ্রা নাই। কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত এবং নিদ্রায় অভিভূত। স্কন্ধদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত অব্যক্ত মহাদেবী জগন্মাতার একখানি অভূতপূর্ব মুখ আমার মুখের উপরে প্রকাশিত হইল। শরীর চমকিত হইয়া

উঠিল। এ কি ব্যাপার। চক্ষুর জলে দগ্ধ হৃদয় শীতল হইতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। যিনি আমার মুখের উপর মুখ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ সকল তাঁহারই খেলা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও, যে তাহার নিকট ব্যক্ত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন। তখন আমার এই বিশ্বাস এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, আমি যে রূপ দেখিয়াছিলাম, সেই চিন্ময় রূপ দেখিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইলাম; এবং এক্ষণে সংসারে সকল প্রকারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তাঁহার নিকটেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমি কি ছিলাম, কে আমাকে এরূপ করিল? সংশোধন করিয়া আমার হৃদয়ফলক এমন নির্মল করিল যে তাহা অব্যক্তের স্বরূপশক্তি প্রকাশের মত করিয়া তুলিল।"

সেই দিনের অবস্থা স্মরণ করিয়া কাঙাল যে গানটি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। গানটি এই:

"অপরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে প্রাণ যে আমার দিবানিশি।

১। কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ শত শত সূর্য্য শশী।

২। যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে সে-রূপ আবার বেড়ায় ভাসি;
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়; ঝলক লাগে হৃদে আসি।

৩। হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন এই রূপশশী;
ওরে, তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কু-বাসনা মেঘ রাশি।

৪। কাঙাল কয়, যে জন মোরে দয়া ক'রে দেখা দেয় রে ভালবাসি;
আমি যে সংসার-মায়ায় ভুলিয়ে, তাঁয় প্রাণভ'রে কৈ ভালবাসি।"

ফিকিরচাঁদের গান আর আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এই গান শুনিবার জন্য চার পাঁচ ক্রোশ হইতে অনেক লোক আসিতে আরম্ভ করিল। এদিকে রেল-পথেও বহুদূর হইতে অনেক লোক আসিতে লাগিল। সকলেরই অনুরোধ তাঁহাদের গ্রামে একবার ফিকিরচাঁদের দলের পদার্পণ করিতে হইবে।

শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়াই রাজসাহী চলিয়া গেলেন। আমি তখন গোয়ালন্দে স্কুলমাষ্টারী করি। আমিও কর্মস্থলে চলিয়া গেলাম। কিন্তু ফিকিরচাঁদের এমন আকর্ষণ যে, প্রতি শনিবারের রাত্রিতে বাড়ী যাইতাম এবং যে একদিন থাকিতাম, সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া নূতন নূতন গান শুনিতাম।

আমরা তখন বাহিরে পড়িয়া গেলাম। ফিকিরচাঁদের গানের দলের ব্যবস্থার ভার কাঙ্গালের উপরই পড়িল।

চারিদিক হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, তখন কাঙ্গাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন যে, ফিকিরচাঁদের দল গ্রামেই হউক বা বিদেশেই হউক, যেখানেই যাইবেন, সেখানে কাহারও গৃহে অতিথি হইতে পারিবেন না, সামান্য এক ছিলিম তামাকও বাড়ী হইতে লইয়া যাইতে হইবে। তবে দলের লোকদিগের গৃহে গেলে এ নিয়ম খাটিবে না। পাছে ইহা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়, এই আশঙ্কা করিয়াই কাঙাল এই নিয়ম করিয়া দিলেন।

এই সময় একদিন পরলোকগত মীর মশারফ হোসেন মহাশয় কুমারখালীতে আসিলেন। তিনি কাঙালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অদূরবর্ত্তী গোরনদীর তটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙাল হরিনাথ মীর মশারফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালাসাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। মীর মশারফ কাঙালের প্রকাশিত "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পত্রিকার লেখক ছিলেন। আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি সপ্তাহে মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না—লিখিতেন "গোরতটবাসী মশা"। এই মশার লিখিত গদ্য-পদ্য-সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার "গৌরী-সেতু", তাঁহার "উদাসীন পথিকের মনের কথা", তাঁহার "গাজী মিয়ার বস্তানী", আর তাঁহার অমূল্য রত্ন "বিষাদ-সিন্ধু" যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাকে নীল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক 'নোট' দিয়া যাইব, তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও।" আমি এ বয়সে আর পারিলাম না। আলস্যবশতঃ সে 'নোট' আর লওয়া হইল না। তিনিও আমাকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন সাহিত্যসেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ায় পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মীর মশারফ হোসেনের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যাক্ সে কথা। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর মশারফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকিরচাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না। তোমার বাড়ীতে গান শেষ করিয়া দলেব লোকেরা সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকও খাইবেন না। মশারফ বলিলেন, "সে কি রকম কথা? তা কি হয়?" কাঙাল বলিলেন, "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।" মশারফ হাসিয়া বলিলেন, "আমি ত গান করিতে জানি না"। কাঙাল উত্তর করিলেন, "গান করিতে জান না বটে, কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশারফ বলিলেন, "তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন। আমরা সেই গানটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; মীর সাহেব এই দলের জন্য আর কোন গান পরে দেন নাই। গানটী এই:

"রবে না চিরদিন সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

১। এই যে আমার আমার সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোনার অঙ্গ ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।

২। সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজি ফুরাইবে;
তখন রে এক পলকে, তিন ঝলকে সকল আশা ঘুচে যাবে।

৩। তোমার এই আত্মজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদবে সবে
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা তুমি কথা না কহিবে।

৪। তোমার সব টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, ঘুড়িগাড়ী পড়ে রবে;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে পরের কাঁদে যেতে হবে।

৫। আগে রে ক'রে হেলা, গেল বেলা সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে,
জগতের কার যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশা'র ভরসা ভবে।"

তাহার পরই একদিন ফিকিরচাঁদের দল মীর সাহেবের লাহিনীপাড়ার বাড়ীতে যাইয়া গান করিয়া আসিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী এমন গ্রাম অতি অল্পই ছিল, যেখানে ফিকিরচাঁদের দলকে গান করিবার জন্য যাইতে হয় নাই।

---

[ জলধরদাদা তাঁহার আত্মজীবনী এই পর্যন্ত বলিয়া থামিয়া যান। তখন আমায় বলিয়াছিলেন,—'শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের সব কথাই তোমায় বললুম ; এ আর অন্য কেউ বলতে পারবে না। আমার কলকাতায় আসা থেকে পরবর্তী জীবনের কথা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সব জানে। তাঁর কাছ থেকেই তুমি সে-সব খবর যোগাড় করতে পারবে।—লিপিকার ]

# স্মৃতি-তর্পণ

॥ ১ ॥

পরলোকগমনের কিছুদিন পূর্বে আমার স্নেহভাজন 'সাহিত্য' সম্পাদক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ভায়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—দাদা, এই সুদীর্ঘ জীবনে আপনার সঙ্গে অনেক লোকের, অনেক সাহিত্য-সেবকের, অনেক সমাজ-সেবকের, অনেক ধর্ম-প্রচারকের, অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, আলাপ পরিচয় হয়েছে, অনেক কথাবার্তাও হয়েছে; আপনি সেইগুলো লিখে রেখে যান না কেন? তাতে আর কিছু হোক আর না হোক—বাংলা সাহিত্যিকদিগের ইতিহাসের কিছু মালমসলা জমা হবে।

সুরেশচন্দ্র আমার ছোট ভাইয়ের মত হলেও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমি কখনও 'তুমি' শব্দের ব্যবহার করিনি; তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আমি 'আপনি' ব্যবহার করেছি।

আমি তাঁর কথার উত্তরে বলেছিলাম,—ভায়া, আপনি যা বললেন তার প্রথমাংশ খুব ঠিক। যাঁদের কথা বললেন, তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। সাহিত্যিকদের কথা যদি বলেন, তা হলে বল্‌তে পারি, মাইকেল মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান তরুণ সাহিত্যিকগণ—এঁদের প্রায় সকলের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল, আলাপ পরিচয়ও হয়েছিল। তাঁদের স্নেহ ভালবাসা ও অনুগ্রহ আমি যথেষ্ট লাভ করেছি; কিন্তু আপনার প্রস্তাবের শেষাংশ আমার দ্বারা প্রতিপালিত হবে না, ভায়া; কারণ, আমি কিছু লিখতে পারব না।

সুরেশচন্দ্র বললেন—কেন পারবেন না তা তো বুঝতে পারলাম না। আমি তাঁর কথার উত্তরে বলেছিলাম, পারি না তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে এই, এমন দুই চার জন ছিলেন বা আছেন যাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে দু-চারটি অপ্রিয় সত্যও বলতে হয়। আমার দ্বারা সে কার্য হবে না। একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই। কথাটা ইংলণ্ডের ইতিহাসে আছে। একজন চিত্রকর অলিভার ক্রমওয়েলের ছবি আঁকতে এসেছিলেন। ক্রমওয়েল ছবি আঁকতে দিতে সম্মত হয়ে চিত্রকরকে বলেছিলেন—"Paint me as I am; if you leave out my scars and wrinkles I will not pay you a shilling."—এমন কথা আপনারা কেউ বলতে পারেন?

সুরেশচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখুন, দাদা, আর কেউ পারুক না

পারুক, আমি পারি। এই ধরুন, আমার সম্বন্ধেই যদি আপনি কিছু বলেন, আমি সব মাথা পেতে নেব ; একটুও অসন্তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হব না।

আমি বললাম—এ কথাটা ঠিক ; বিদ্যাসাগরের দৌহিত্রের মুখেই শোভা পায় ; কিন্তু এত শীঘ্রই আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? এই আপনারই 'সাহিত্য' পত্রে কয়েক বৎসর আগে শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; তাতে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে দু-একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলেছিলেন ; তা নিয়ে কি তুমুল কাণ্ড হয়েছিল, অক্ষয় ভায়াকে কি বিপন্ন হতে হয়েছিল, সে কথা আর কেউ না জানুক আপনি আর আমি তো জানি। সুতরাং এমন কর্ম আমার দ্বারা হবে না, ভায়া।

সুরেশচন্দ্র চুপ করে গেলেন, কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবটা এতকাল আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। আমি তবুও এ সম্বন্ধে লিখতে এতদিনও সাহস করিনি।

তারপর আমাকে যাঁরা ভালবাসেন, আমাকে যাঁরা অনুগ্রহ করেন, এমন বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা, ভগবানের আশীর্বাদে, আমার কম নেই। তাঁরা অনেকেই বললেন—দাদা, আপনার জীবন-চরিতটা লিখে ফেলুন না! তাঁদের সে কথা আমি হেসেই উড়িয়ে দিইছি। আমার আবার জীবন,—তার আবার কথা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!

কিন্তু তা হলেও দু-একজন কনিষ্ঠের অনুরোধে আমি মুখে মুখে আমার বাল্যজীবন ও ছাত্র-জীবনের কথা বলেছি। আমার সোদরপম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বসু সে কথাগুলি লিখে রেখেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আমার ছাত্র-জীবনের কথাও বলা শেষ হয়নি, আর, হবে বলে আশাও নেই।

তারপর বিগত বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্রাজুয়েট বাংলা ভাষা বিভাগের অধিনায়ক শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায়বাহাদুর ভায়ার অনুরোধে আশুতোষ বিল্ডিংয়ে বাংলা সাহিত্যাধ্যায়ীদের সভায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একদিন কয়েকটি কথা বলতে হয়েছিল। আমার কথা শেষ হলে, ছাত্রেরা সকলে মিলে আমাকে চেপে ধরেছিলেন যে, আমি আমার পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লিখে ফেলি।

তাঁদের অধিনায়ক শ্রীমান খগেন্দ্রনাথও তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদন করে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। আমি তখন 'হাঁ কি না' কিছুই বলিনি ; কিন্তু কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমার মনে হয়েছিল, আমি

হয় তো কিছু বলতে পারি। এতদিন ধরে কথাটা মনে মনেই তোলপাড় করেছি। এবার ইচ্ছা হয়েছে,—বলেই ফেলি না দু-একটা কথা।

কিন্তু কথা বলতে পারবো, তার পারম্পর্য রক্ষা করতে পারব না; ধারাবাহিক ভাবে সময়ের হিসাব করে পর-পর কিছুই বলতে পারবো না। যখন যাঁর কথা মনে হবে, তাঁরই সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলতে চেষ্টা করব।

সুতরাং সকলের আগে আমার মনে হচ্ছে—আমি কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা বলি।

আজ তেইশ বৎসর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষের'র সেবা করে আসছি। তিনি তাঁর 'ভারতবর্ষ' দেখে যেতে পারেন নি,—সে দুঃখ আমার মর্মান্তিক হয়ে আছে। তাঁরই শূন্য আসন, নিতান্ত অযোগ্য হয়েও, আমি এতদিন অধিকার করে আছি;—সেই জন্য তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ প্রথমেই করি।

যে সময়ের কথা বলছি, তাকে সেকালও বলা যায়, কারণ সে হচ্ছে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এতকাল পরে সে সময়ের কথা বলতে গেলে, সাল, মাস, তারিখ, কিছুই ঠিক রাখতে পারিনে, সব গোল পাকিয়ে যায়; কিন্তু এ সালটা মনে আছে, কারণ এইবার আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই।

আমিও পরীক্ষা দিই, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও সেইবারই পরীক্ষা দেন। আমি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুল থেকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল পরীক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে—সেইখানেই তাঁদের বাড়ী। সেই পরীক্ষা উপলক্ষেই দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

সে সময় পূজার কিছু পূর্বে বা পরে আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল। এখনকার মত বৈশাখ মাসের খর-রৌদ্রের মধ্যে নয়। তখন শীতও পড়েনি, গ্রীষ্মও তেমন প্রখর নয়। এইখানে, সেই সময়ে আমার অবস্থা কেমন ছিল, সে কথাটা না বললে চলছে না।

সে সময় আমাদের পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর। এখন যেমন একই স্কুলের দশটি ছেলের মধ্যে যার যেখানে খুসী সেই কেন্দ্রেই পরীক্ষা দিতে পারে, আমাদের সময়ে সে নিয়ম ছিল না। বিশেষত আমাদের বাড়ী কৃষ্ণনগর জেলায়—আমাদের কৃষ্ণনগরেই পরীক্ষা দিতে হোতো।

এখন যেমন রাণাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রেল হয়েছে, ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তার কল্পনাও কেউ করেনি। আমাদের বাড়ী থেকে কৃষ্ণনগর যেতে হলে বগুলা ষ্টেশনে নামতে হোতো। সেখান থেকে মাইল দুই আড়াই গিয়ে হাসখালীতে

নদী পার হতে হোতো। এই হাঁসখালীর স্মৃতি এখনও আছে—'স্বর্ণলতায়'। পার হয়ে ওপারে ৮/৯ মাইল গেলে কৃষ্ণনগর পৌছনো যেতো। যাঁরা বড়মানুষ, তাঁদের যাতায়াতের কোন অসুবিধাই ছিল না। বগুলা ষ্টেশনে যথেষ্ট ঘোড়ার গাড়ী থাকতো, আবার হাঁসখালীর ওপারেও অনেক গাড়ী পাওয়া যেতো। পয়সা দিলে ঘণ্টা ২।৩-এর ভিতর বগুলা থেকে কৃষ্ণনগর পৌছিতে পারা যেত। আমাদের অবস্থা তখন এমনই ছিল যে, সে কথা এখন মনে করলে চোখে জল এসে পড়ে।

সেবার আমাদের স্কুল থেকে আমরা চারজন পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। আমাদের গ্রামের আরও দুইটি বড়মানুষের ছেলে পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে কৃষ্ণনগরে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। তাঁরাও আমাদের গ্রাম থেকে আমাদেরই সঙ্গী হয়েছিলেন। 'সঙ্গী' কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হোলো না। এক দিনেই আমরা কৃষ্ণনগব যাত্রা করেছিলাম, এক ট্রেণেই গিয়েছিলাম, কিন্তু একসঙ্গে নয়। তাঁরা কেউ সেকেণ্ড ক্লাসে গেলেন, কেউ ইণ্টার ক্লাসে গেলেন। আর আমি গেলাম থার্ড কেলাসে। আমাব কৃষ্ণনগব যাতায়াত ও সেখানে থাকবার খরচ বাবদ আমার বড়দাদা মোট চারটী টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আমার কি আর উপর শ্রেণীতে যাওয়া চলে?

আমার সঙ্গীদের সঙ্গে বাক্স, পেটরা ও বিছানা-পত্তর, চাকর বামুন;—আর আমার সঙ্গে নিজের পরিধেয় ময়লা ধুতি ও চাদর ব্যতীত একখানি কাপড় ও একখানি চাদর, জামা জুতা ব্যবহার করবার সঙ্গতি তখন পর্যন্তও আমার হয় নাই। বই এর বোঝা আমার বেশী ছিল না, কারণ অধিকাংশ বই-ই তো আমি কিনতে পারিনি,—সহপাঠীদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তেই পড়া শেষ করেছিলাম। সুতরাং আমার লট-বহর থান পাঁচ ছয় বই, আর ঐ ধুতি আর চাদর। সেইগুলো একখানি ছেঁড়া নেকড়ায় বেঁধে আমার পুঁটুলী।

বগুলা ষ্টেশনে যখন নামলাম, তখন আমার সম্বল তিনটি টাকা ও গুটি-কয়েক পয়সা। এই যে আমার সঙ্গীরা—যাঁদের সঙ্গে এক বেঞ্চে বসে পড়েছি, যাঁরা আমার গ্রামবাসী, কেউ কেউ নিকট প্রতিবেশীও, তাঁদের মধ্যে একজনও ষ্টেশনে নেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না—ওরে তুই কি করে যাবি? তাঁরা গাড়ী থেকে নেমে কুলি ডেকে জিনিষপত্র তাদের মাথায় দিয়ে ষ্টেশনের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি দূরে চেয়ে দেখলাম। তাঁরা যে আমায় ডেকে নেবেন, এ আশা আমি মোটেই করিনি; আর ডেকে নিলেও আমি যখন

পড়তা-মত গাড়ী-ভাড়া দিতে পারতাম না, তখন তাঁদের সঙ্গে যেতামও না।

তাঁরা ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে দোকান থেকে নানাবিধ খাবার কিনে হল্লা করে খেতে লাগলেন। আমি ষ্টেশনের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলাম, বাইরে আর গেলাম না। তার ফল হল এই যে, তাঁরা যখন ঘোড়া-গাড়ীতে চড়ে যাত্রা করলেন তখন অপরাহ্ন ৫টা। আমাকে তখন এই অপরিচিত পথে আমার সেই পুঁটুলিটী মাথায় করে ১০/১২ মাইল পথ পদব্রজে যেতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে একবার মনে হ'ল দু'পয়সার মুড়ি-গুড় কিনে খাই। কিন্তু ভবিষ্যত ভেবে সে নবাবী করবার লোভ সংবরণ করতে হোলো।

বগুলা থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তা খুব ভাল। রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছ, এত শিশুগাছ আর কোন রাস্তায় দেখিনি। রোদের সময়ও চলতে কষ্ট হয় না। আমি খুব টানা পায়ে হেঁটে যখন হাঁসখালীর ঘাটে গেলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। খেয়া পার হয়ে ওপারে উঠতে একজন চাষা লোক জিজ্ঞাসা করল—তুমি কোথায় যাবে ?

আমি কৃষ্ণনগর যাবো শুনে সে বলল, চার আনা দিয়ে শেয়ারের গাড়ীতে যাও না! তার কাছে দারিদ্রের ইতিহাস না বলে জবাব দিলাম—আমি হেঁটেই যাবো—ভগবান পা দিয়েছেন কেন ?

লোকটা আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্ল,—তাতো বুঝলাম, বাবা,—রাস্তায় যে ডাকাতের ভয় আছে—যাবে কি করে। এদিকে অন্ধকারও হয়ে এল। আমি বলি কি, আজ রাতটা একটা দোকানে থাক, কাল ভোরে উঠে চলে যেও। তার এই অযাচিত উপদেশে আমি কর্ণপাত করলাম না দেখে সে "মরগে যাও" বলে আশীর্বাদ করে চলে গেল।

সেই অপরিচিত পথে অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণনগর অভিমুখে যাত্রা করলাম। পথ অবশ্য জনশূন্য নয় ; কৃষ্ণনগর ও আশে-পাশের গ্রামের লোক সে পথে যাচ্ছিল।

আমি আগেই শুনেছিলাম, গোয়াড়ীতে খড়ে নদীর ধারে তিন চারটে হোটেল আছে। সেখানে আহার ও বাসস্থান পাওয়া যায়। তা ছাড়া ঐ-খানেই অনেকগুলি বৈষ্ণবীর বাড়ী আছে ; সে সব বাড়ীতেও ঘর-ভাড়া পাওয়া যায়। আমাদের গ্রামের যাঁরা মামলা মোকদ্দমা করতে কৃষ্ণনগরে যান, তাঁরা ঐ সব হোটেলে বা বৈষ্ণবীদের বাড়ীতে বাসা নেন।

'বৈষ্ণবী' কথাটা একটু সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করা হয়, কারণ এই সব বাড়ীওয়ালী সত্যসত্যই বৈষ্ণবী নয়, তাদের অন্য ব্যবসায়ও আছে।

হোটেলে থাকতে গেলে দৈনিক আহার ও বাসস্থানের জন্য আট আনা দিতে হয়। আমাকে ৫ দিন থাকতে হবে। এই ৫ দিনে হোটেলওয়ালাকে কাযেই ২।।০ টাকা দিতে হবে। আমার সম্বল মাত্র তিনটি টাকা। আড়াই টাকাই যদি হোটেলে দিই, তা হলে বাড়ী ফিরব কি করে। কাজেই আমি আগে থেকেই স্থির করেছিলাম—বিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়ে অবিদ্যালয়েই আশ্রয় নেব। সেখানে দৈনিক দু-আনা ঘর-ভাড়া নেয়। যাদের ইচ্ছে তারা সেখানে রেঁধে-বেড়ে খেতে পারে, অথবা হোটেল থেকেও খেয়ে আসতে পারে। আমি মনে মনে স্থির করেই গিয়েছিলাম—বৈষ্ণবীর বাড়ীতেই থাকব। দু-আনা ঘর ভাড়া দেব, এক বেলা হোটেলে খাব, আর এক বেলা উপবাস করব। নিতান্তই যদি ক্ষিদে পায়, দু-পয়সার চিঁড়ে-গুড় কিনে খাব। তা হলে টাকা দেড়েকের মধ্যেই আমার কৃষ্ণনগর বাস হয়ে যাবে। খরচের অকুলান হবে না।

রাত্রি প্রায় ৯ টার সময়ে গোয়াড়ীতে পৌঁছিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোথায় যাই, এমন সময়ে একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক একটা বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বুঝতে পারলো আমি পরীক্ষা দিতে এসেছি। কারণ, সেখানে অনেক বাড়ীতেই নানা স্থানের ছাত্রেরা এসে বাসা নিয়েছে। স্ত্রীলোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে।

আমি বললাম, আমি আগে কখনও এখানে আসিনি, পরীক্ষা দিতে এসেছি, কোথায় থাকব ভাবছি।

সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে আর কোন ছেলে আসেনি? আমি বললাম, এসেছিল,—তারা অন্য স্থানে বাসা নিয়েছে। আমি একলাই থাকব।

সে বলল, দেখ, বাবা, আমার বাড়ীতে ছেলেরা কেউ বাসা নেয়নি। অন্য লোকে বাসা নিয়েছে। তা তুমি যদি আমার একটা ঘরের বারান্দায় থাকতে পার, তা হলে জায়গা হতে পারে। ভাড়া কিন্তু রোজ দু-আনা করে দিতে হবে।

আমি তাতেই সম্মত হয়ে তার সঙ্গে যেতেই সে বলল, কই,—তোমার বিছানা-পত্তর কাপড়-চোপড় কই? আমি বললাম, আমি তো কিছু আনিনি।

স্ত্রীলোকটি একটু চুপ করে থেকে বলল, বুঝেছি, তুমি বড় গরীব মানুষের ছেলে, না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, মা আমি ভারী গরীব। স্ত্রীলোকটি তখন আমার হাত থেকে পুঁটুলিটি নিয়ে, আমাকে সঙ্গে করে তার বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেল ; লম্বা একটা ঘরের ছোট্ট একটা কুঠুরীতে নিয়ে বলল, বাবা, তুমি এইখানে থাক।

আমি বললাম, ভাড়া যে বেশী দিতে হবে। সে হেসে বলল—তোমাকে এক পয়সাও ভাড়া দিতে হবে না। আমি তোমার জন্য একটা মাদুর আর একটা বালিশ এনে দিচ্ছি।

তার পর সে বলল, রাত্তিরে কি খাবে ? সুমুখেই হোটেল আছে, সেইখান থেকেই খেয়ে এস গিয়ে। আমি বললাম, আমি আর এত রাত্তিরে খাব না, আর খাবার দরকারও নেই। কাল সকালে যা হয় করব। স্ত্রীলোকটি একটা মাদুর, একটা বালিশ, আর একটা প্রদীপ দিয়ে গেল। আমি সেই ঘরেই রাত কাটাতাম।

পরের দিন রবিবার। সকালে উঠে আর কোথাও গেলুম না। যে দু-একখানা বই সঙ্গে ছিল তাই পড়লাম। বারটাব সময় হোটেলে গিয়ে তিন আনা পয়সা দিয়ে পেট ভরে খেয়ে এলাম।

বিকেল-বেলা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম, অনেক ছেলে কলেজের দিকে যাচ্ছে, কার কোথায় স্থান হয়েছে তাই দেখবার জন্য। আমিও তাদের সঙ্গে গিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট আসন দেখে এলাম। তার পর খানিক এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আমি বাসস্থানে ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বাড়ীওয়ালী এসে বলল, আর একটু পরে গিয়েই হোটেলে খেয়ে এস, বাবা। আমি আর সে কথার কোন উত্তর দিলাম না। অর্থাৎ রাত্তিরে কিছু খাব না শুনে দয়াময়ী বাড়ীওয়ালী হয়ত নিজে থেকেই খাবারের আয়োজন করবে, এই ভয়ে আর কোন কথা বললাম না। খানিকটা পরে বাড়ীওয়ালী এসে আমার খবর নিয়ে গেল।

পরের দিন ৮টার মধ্যেই হোটেলে খেয়ে বাড়ী থেকে যে কাপড় আর চাদর এনেছিলাম তাই পরে, একটু ভদ্দর লোক হয়ে, গুটী দুই পেনের কলম হাতে করে কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসলাম।

একটার সময় পরীক্ষা-গৃহ থেকে বেরিয়ে কলেজের প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে

একটা গাছতলায় গিয়ে বসলাম। তখন অন্যান্য ছেলেরা সোর-গোল করে জলযোগ করছে, আমি গাছতলায় বসে তাই দেখছি। যারা খাবার বেচতে এসেছিল তারা তো জানে না যে, পরীক্ষার্থীর মধ্যে চিঁড়ে গুড়েরও খরিদ্দার থাকে; সুতরাং যে দু-পয়সার জলযোগ করব মনে করেছিলাম, দরিদ্রের সে মনোরথ মনেই মিলিয়ে গেল।

সেই সময় একটি ফুটফুটে গৌরবর্ণ ছেলে, আমারই বয়সী, আমি যে গাছতলায় বসে ছিলাম সেই দিকে এল। সে যে বড়মানুষের ছেলে তা তার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেই বুঝতে পারলাম। ছেলেটি সোজা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ভাই তোমার নাম কি জলধর সেন? তুমিই কি কুমারখালী স্কুল থেকে একজামিন্ দিতে এসেছ?

তার এই প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই রাজপুত্রের মত ছেলে আমাকে এমন ভাবে সম্বোধন করল কেন, এ আমি বুঝেই উঠতে পারলাম না। আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে তখন আমার পাশে বসে পড়ল; তার পর হাসিমুখে বলল, আমার কথা শুনে তুমি আশ্চর্য বোধ করছ, না? আমি সে কথারও কোন জবাব দিতে পারলাম না। কি যে বলচে তাও ভেবে পেলাম না। ছেলেটি বলল, তুমি নীললোহিত বাবুকে চেন?

এইবার আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো। আমি বললাম, তিনি যে আমাদের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। মাস চারেক আগে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। ছেলেটি বলল, নীললোহিত বাবুর কাছেই তোমার নাম শুনেছি। তিনি যে এখানকার জামাই। তাঁরি কাছে শুনেছি যে, তুমি এবার এগজামিন দিতে এখানে আসবে, আর তোমার মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে তিনি কখন দেখেন নি। তাই তোমার খোঁজ করছিলাম। তোমাদেরই স্কুলের একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতে সে তোমাকে দেখিয়ে দিল। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। তার কথা আমি প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারিনি। গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, মাথায় এক রাশ চুল, এমন একটি ছেলে যে ব্রিলিয়াণ্ট জলধর সেন, তা আমি কেমন করে বিশ্বাস করব। তা, ফার্ষ্ট পেপার কেমন লিখলে?

আমি বললাম, পাশের নম্বর থাকবে। তার পরই অতি ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, তুমি এত কথা বললে, তোমার নামটি তো জানতে পারলাম না।

ছেলেটি হেসে বলল—নাম বল্লে তো চিনতে পারবে না, তবে বাপের নাম বললে হয় তো চিনতে পার। আমার নাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। আমি কৃষ্ণনগরের রাজার দাওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের ছেলে।

আমি এই পরিচয় পেয়ে সত্যই অভিভূত হয়ে পড়লাম। কৃষ্ণনগরের রাজার দাওয়ান—রাজা বললেই হয়! তাঁর ছেলে আমার সঙ্গে এমন করে কথা বললেন। এমনি সময় ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। দ্বিজেন্দ্রলাল আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে হলের দিকে চলল; যেতে যেতে বলল, হল থেকে যে আগে বেরুবে সে ঐ গাছতলায় অপেক্ষা করবে। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমার নির্দিষ্ট আসনের দিকে চলে গেলাম।

বিকেলে সাড়ে চারটায় হল থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট গাছতলার দিকে অগ্রসর হতেই দেখি দ্বিজেন্দ্রলাল একটা ঠোঙা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। সে, বোধ হয়, হল থেকে একটু আগেই বেরিয়ে এসেছিল। আমাকে দেখেই বল্‌ল, দেড়টার টিফিনের সময়ে তুমি যে কিছু খাওনি তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম; কিন্তু তখন তো খাবার কিনবার সময় ছিল না—ঘণ্টা বেজে গেল; এখন তাই তোমার জন্য খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম—এ ভাই তোমার ভারি অন্যায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল চেঁচিয়ে বলে উঠল—ন্যায় অন্যায় পরে দেখা যাবে, এখন খাও।

ঠোঙার মধ্যে ছিল, খানকয়েক সরভাজা ও সরপুরিয়া। আমি বললাম—এ কি করেছ, এর যে দাম অনেক বেশী। দ্বিজেন্দ্রলাল বলল, দাম তো আর তোমার কাছে চাচ্ছি না। তখন উপায়ান্তর না দেখে সেই উপাদেয় খাদ্যগুলি খেয়ে ফেললাম। মনে মনে বললাম, রাত্রের খাবারের পয়সা বেঁচে গেল।

তার পরই দ্বিজেন্দ্রলাল বলল, আর দেরী নয়, আমি বাড়ী যাই। কাল ঠিক দেড়টার সময় এই গাছতলা—বুঝলে। তারপর যে তিন দিন আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল সে তিনদিনই দ্বিজেন্দ্রলাল দেড়টার ছুটির সময় তার বাড়ী থেকে আনা নানা প্রকারের মিষ্টান্নের অংশ আমাকে দিয়েছিল।

তারপর এই সুদীর্ঘ জীবনে কতজন কত মিষ্টান্ন খাইয়েছে, কিন্তু আমার শৈশবের বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের দেওয়া মিষ্টান্নের তুলনা আজ পর্যন্ত আমি কিছুর সঙ্গেই করতে পারলাম না। কৃষ্ণনগরের কথায় দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :—

"উপাদেয় রাজভোগ মেলে গো তথায়,
সরভাজা সর-পুরি বিখ্যাত ধরায়।

শচীর রসনাযোগ্য কি মধুর তায়,
একবার খেলে নাহি ভোলা যায় আর!"

কিন্তু আমার কাছে—সেই সরভাজা সর-পুরিয়ার মিষ্টান্ন দ্বিজেন্দ্রের স্নেহে আরও বাড়িয়েছিল।

আমি আগেই তাকে বলে রেখেছিলাম যে, বৃহস্পতিবারে পরীক্ষা শেষ হলেই আমি বাড়ী চলে যাব। দ্বিজেন্দ্রলাল সে কথার উত্তরে বলেছিল,—আমার সঙ্গে দেখা না করে যেও না,—এই গাছতলায়ই দেখা হবে। আমি যদি জানতাম যে তার আর কিছু অভিসন্ধি আছে তা হলে একটু আগেই হল থেকে বেরিয়ে পলায়ন করতাম। আমার মনে হয়েছিল যে, যাবার সময় মাত্র দেখা করবার জন্যই সে অনুরোধ করেছিল।

সাড়ে চারিটার সময় হল থেকে বেরিয়েই দেখি—দ্বিজেন্দ্রলাল সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে—আর তার কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক, তার হাতে একটা হাঁড়ি। আমাকে দেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল বলল, দেখ ভাই তোমার বাড়ীর জন্য কিছু খাবার দিলাম। এই বলে আমাকে আলিঙ্গন করে তার সঙ্গের সেই ভৃত্যটিকে বলল— ওরে, এই হাঁড়িটা নিয়ে ওর সঙ্গে গিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়। এই বলেই আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে দৌড়ে চলে গেল—আমি তাকে ধন্যবাদ দেবারও অবকাশ পেলাম না।

তারপর পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল যে, আমি ও দ্বিজেন্দ্রলাল একই ব্রাকেটে স্কলারসিপ পেয়েছি। এর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে, আর আমি হেদোর কলেজে পড়েছিলাম। সে সময় মধ্যে মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা হ'ত। দেখতাম সেই সদানন্দ যুবক। এতদিন হয়ে গিয়েছে এখনও সে কথা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। তারপর কে কোথায় চলে গেলাম—কেউ কারো খোঁজও নিলাম না। আমার কিন্তু কৃষ্ণনগরের সেই সদানন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের কথা সর্ব্বদাই মনে হোতো।

এরপরে বোধ হয় ১৫।১৬ বছর কেটে গেল। দ্বিজেন্দ্রলাল এম. এ. পাশ করে কোথায় অধ্যাপক হয়ে গেল। তারপর সরকারী কৃষিবৃত্তি পেয়ে বিলেত গেল, সেখান থেকে পাশ করে ফিরে এসে ডেপুটি কালেক্টর হ'ল—এ সবই খবরের কাগজে পড়েছি, আর আনন্দে অধীর হয়েছি।

অকস্মাৎ অভাবনীয় রূপে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। সে, বোধ হয়, ১৮৯৫ কি ৯৬ অব্দে। আমি তখন মহিষাদল স্কুলে মাষ্টারি করি।

মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার আমার পরম হিতৈষী সুহৃদ্ পরলোকগত যদুনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় আমি তখন থাকি ; তাঁর ছেলেটিকে পড়াই, আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুহৃদ্‌বর দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সঙ্গে অবসর-সময় যাপন করি।

সেই সময় এক-দিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে এসে দেখি ম্যানেজারবাবু বাসাতেই আছেন, কাছারীতে যান নি। আমাকে দেখেই তিনি বললেন—মাষ্টার মশায়, আজ দু'জন বিশিষ্ট অতিথি আসবেন। তাঁদেরই অভ্যর্থনার আয়োজন করার জন্য আজ কাছারী যাই নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে এমন মহামান্য অতিথি, ম্যানেজারবাবু? তিনি হেসে বললেন, একজন বিদ্যাদ্বারের বারবেলা, আর একজন তমলুকের এস্-ডি-ও।

দীনেন্দ্রবাবু বললেন—একজন গানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়,—আর একজন তমলুকের ডেপুটি চন্দ্রশেখর কর। আমি যে তাঁদের চিনি—দ্বিজেন্দ্রলাল যে আমার কৈশোরের সখা, আর চন্দ্রশেখর যে আমার নিকটতম কুটুম্ব—আমার মেজদাদার মামাশ্বশুর, এ কথা আমি তাঁদের কাছে প্রকাশ করলাম না। একজন প্রথিতযশা কবি, খ্যাতনামা সেটেলমেণ্ট অফিসার ; আর একজন মহকুমার প্রধান হাকিম। তাঁরা যে আমার পরিচিত, তাঁরা যে এতকাল পরে এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলের থার্ড মাষ্টারকে চিনবেন—এ কথা আমার মনেই হোলো না। কাষেই কোন উচ্চ-বাচ্য না করে ম্যানেজারবাবুকে বললাম—তা'হলে এই মহামান্য অতিথিদের উপলক্ষে এই গরীবদের অদৃষ্টেও আজকে মহাভোজ আছে দেখছি। দীনেন্দ্রকুমার বললেন—ঐ-টুকুই আমাদের লাভ মাষ্টার মশাই।

সন্ধ্যার পরই মহামান্য অতিথিদ্বয় এসে উপস্থিত হলেন। ম্যানেজারবাবু তাঁদের অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন। আমি একটু পাশ কাটিয়েই রইলাম। জলযোগের পর প্রথমে তাস খেলা আরম্ভ হল। আমি তখনো বাইরে বাইরে ঘুরছি। তার পরই তাস খেলা বন্ধ করে দিয়ে ম্যানেজারবাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে গান করবার জন্য অনুরোধ করলেন, এবং এদিক ওদিক চেয়ে—আমাকে দেখতে না পেয়ে—দীনেন্দ্রবাবুকে বললেন—দীন, (তাঁকে দীন বলেই তিনি ডাকতেন) কই মাষ্টার মশায়কে তো দেখছিনে। আমি তখন বারান্দার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। দীনেন্দ্রবাবু আমাকে টেনে ঘরের ভেতর নিয়ে যেতেই—দ্বিজেন্দ্রলাল আমার দিকে চেয়েই একেবারে লাফিয়ে উঠে—হালো ভাই জলধর, বলে ফরাস থেকে নেমে এসে আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন।

খুব গান-বাজনা চল্‌ল। ম্যানেজারবাবুর অনুরোধে আমাকেও দু'একটা গান গাইতে হয়েছিল।

তারপর কলকাতায় কতবার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারই সকলকে শুনিয়ে তিনি বলেছেন—জলধরবাবু আর আমি এক ব্রাকেটে। এ ব্রাকেট ভাঙবে না।

হায়, সেই ব্রাকেটই ভেঙ্গে গেল তেইশ বৎসর আগে। একদিন অকস্মাৎ আমার কৈশোরের বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাকেট ভেঙ্গে চলে গেলেন—আর আমি তাঁর অযোগ্য বন্ধু এই তেইশ বৎসর তাঁর বড় সাধের 'ভারতবর্ষে'র সেবা করছি। আজ এত কাল পরে আমাব সেই কৈশোরের বন্ধুর সঙ্গে প্রথম দর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করলাম।

॥ ২ ॥

এবার 'স্মৃতি-তর্পণ' করবার পূর্বে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। কিশোর বয়সে ও যৌবনের প্রারম্ভে যাঁদের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তাঁদের কথা বল্‌তে গেলে সে সময়ে আমার দুরবস্থার কথা না বল্‌লে চলে না; তাই বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের কথা বল্‌তে হচ্চে।

কোন কোন বন্ধু ধারাবাহিক ভাবে লিখতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু তা হ'লে যে জীবন-চরিত হয়। তা আমি এখন পারছিনে। তবে এবার যে স্মৃতি-তর্পণ করছি, তা ধারাবাহিকই হয়েছে, কারণ এটা আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানের ঠিক পরের অধ্যায়।

১৮৭৮ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হলাম। অভাবনীয় সৌভাগ্যের বশে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হয়েও মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পেলাম, কারণ সেবার প্রথম বিভাগে বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারেনি,—বিশেষত প্রেসিডেন্সি বিভাগের বৃত্তির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকাতেই আমার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল।

কিন্তু তারপর! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার আবেদনপত্র দাখিল করবার সময় লিখে দিতে হয়, যদি বৃত্তি পাই কোথায় পড়বো। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের সেই সময়ের প্রধান শিক্ষক অধুনা পরলোকগত অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরে, তুই যদি স্কলারসিপ্‌ পাস, কোথায় পড়বি, সেটা যে এখনি লিখে দিতে হবে।

আমি হেসে বলেছিলাম, যে স্কুলের ছেলেরা ছয়বছর পরীক্ষায় পাশ হতে পারেনি, বারো বছর কেউ বৃত্তি পায়নি, সেই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ হওয়াই অসম্ভব, তার আবার বৃত্তি। অভয়বাবু বল্‌লেন, তা বল্‌লে কি হবে, ওটা লিখে দেওয়া দস্তুর। আমি উত্তর করলাম, তাহলে লিখে নিন Civil Engineering College, অর্থাৎ তখন আমার গণিতের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, তাই Engineering College-এর কথা মনে হয়েছিল। আমি জানতাম, বৃত্তি আমি পাবই না। লিখে যখন দিতে হবে, তখন আর ছোট কথা লিখি কেন? স্বপনে ফলার খেতে বসে দই চিড়ে কে খায়—লুচি-মণ্ডাই খেতে হয়। তাই Engineering College-এর কথা লিখেছিলাম। এটা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন Engineering College শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়নি, কলকাতায় Presidency College-এর মধ্যেই ছিল। লিখতে হোত—C. E. Department Presidency College, Calcutta.

মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পেয়ে Engineering College-এ পড়া বাতুলের স্বপ্ন। ১০৲ টাকায় যে কলকাতায় থেকে সাধারণ কলেজেই পড়া যায় না। আমাদের গ্রামের অনেক বড়মানুষের কলকাতায় কারবার ছিল, এখনও আছে। কলকাতা হাটখোলায় তাঁদের বড় বড় আড়ত ছিল। আমি গ্রামের কয়েকজন বড়মানুষের দ্বারস্থ হলাম, তাঁদের কলকাতার আড়তে থেকে দুবেলা দুমুঠো অন্নের প্রার্থনা করলাম। কিন্তু কেউই এই দীন দরিদ্র ছাত্রের কাতর নিবেদনে কর্ণপাত করলেন না।

তখন Engineering College-এর সেসন্ জুন মাসে আরম্ভ হোত। আমার পরীক্ষার ফল ডিসেম্বর মাসেই বার হয়েছিল। আমি জুন মাসের প্রতীক্ষায় বাড়িতেই বসে রইলাম। Engineering College-এ প্রবেশের আশা ত্যাগ করতে পারলাম না, নির্ভর করলাম ভগবানের উপর। অকস্মাৎ আমার সব ব্যবস্থাই উল্টে গেল। কলকাতার সিটি কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ডক্টর হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মশায়* আমাদেরই গ্রামের লোক। তিনি সেই সময় বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ছিলেন। কি একটা উপলক্ষে হেরম্বদাদা কুমারখালি গিয়েছিলেন, সেই সময় আমার বড়দাদাও বাড়িতে ছিলেন। হেরম্বদাদা শুনলেন যে, আমি Engineering College-এ পড়বার অসাধ্য-

* মৃত্যু ১৬.১.১৯৩৮।—সম্পাদক

সাধন করবার জন্যে বাড়িতে বসে আছি। তিনি বড়দাদাকে বুঝালেন যে, আমাদের মত গরীব লোকের Engineering College-এর ব্যয়ভার বহন করা একবারেই অসম্ভব। তিনি আমাকে জেনারেল লাইনে প্রবেশ করিয়ে দিতে দাদাকে পরামর্শ দিলেন। বল্লেন, ১০্ টাকা স্কলারসিপ্ আছে আর ৪।৫ টাকা হলেই কলকাতার খরচ চলে যাবে। কলকাতায় গিয়ে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মশায়কে ধরলে, বিনা মাইনেতেও তাঁর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বড়দাদা সেই কথাই বুঝলেন, আমাকে বল্লেন—Engineering College-এ ভর্তির চেষ্টা অসাধ্য সাধন, তার চাইতে তুমি আর্ট কলেজেই ভর্তি হও। আমি যেমন করে পারি, যত কষ্টই আমার হোক না কেন, তোমাকে মাসিক ৪।৫ টাকা দেবো। তখন আর কি করি, বড়দাদার আদেশ শিরোধার্য করে আমি কলকাতায় এলাম।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের গ্রামের অনেক বড়মানুষের কলকাতায় আড্ডা আছে। তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে যখন দুবেলা দুমুঠি অন্নের সংস্থান কলকাতায় করতে পারলাম না, তখন সেখানে গিয়ে দু-চার দিনের জন্যও তাঁদের দ্বারস্থ হতে আমার মত দীন দরিদ্রেরও কুণ্ঠাবোধ হো'ল। তাই বাঁড়ি থেকে বেরুবার পূর্বেই আমার এক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে হো'ল। আমি গোয়ালন্দে তাঁর সঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গেই মাইনর পাশ করেছিলাম। তাঁর সহায়তায় নির্ভর করেই, ৫্ টাকা বৃত্তি সম্বল করে ফরিদপুর জেলাস্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। তাঁর নাম দক্ষিণারঞ্জন সেন। তিনি গোয়ালন্দের তখনকার খ্যাতনামা উকিল উমেশচন্দ্র সেনের একমাত্র পুত্র। আমি ফরিদপুর ছেড়ে দেশের স্কুলে চলে এলাম, দক্ষিণারঞ্জন ফরিদপুরেই পড়তে লাগ্লেন। আমি যে বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম, দক্ষিণাও সেই বছর ফরিদপুর জেলাস্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ হয়েছিলেন এবং কলকাতায় এক মেসে থেকে মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসনে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রবেশ করেছিলেন। কলেজে ভর্ত্তি হয়েই তিনি আমাকে পত্র লিখেছিলেন সেই পত্রে তাঁর ঠিকানা ছিল, নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট বাড়িটার কথা মনে আছে, কিন্তু নম্বর মনে নেই। আমি দক্ষিণাকে লিখলাম—আমি অমুক দিনে কলকাতায় যাচ্ছি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আর পড়া হোল না, আমি এল-এ পড়বো। কলকাতায় আমার অল্প পরিচিত

লোক থাকলেও, আমি দু-একদিনের জন্যে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবো। তিনি যেন নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসেন।

যথাসময়ে শিয়ালদহ ষ্টেসনে নেমে দেখি, দক্ষিণা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার ইচ্ছা ত্যাগ করেচি, সেজন্যে তিনি আমাকে খুব ধন্যবাদ করলেন। সে রাত্রি তাঁর বাসাতেই কাটালাম। তার পরেও একদিন তাঁর বাসায় পরম যত্নে ও সমাদরে ছিলাম। এইখানেই আমার পরম বন্ধু দক্ষিণার কথা শেষ করতে চাই। দক্ষিণা বি-এল পাশ করে ১৮৮৭ সালে গোয়ালন্দে ওকালতি আরম্ভ করেন। সুদীর্ঘকাল সেখানে ওকালতি করে ১৩৪০ সালের ( ইংরাজি ১৯৩৪ অব্দ ) ফাল্গুন মাসে দেহত্যাগ করেছেন।

এইবার আবার আমার কথা আরম্ভ করি। যেদিন কলকাতায় পৌঁছিলাম, তার পরদিন প্রাতঃকালেই দক্ষিণাদের মেসে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাদুড়বাগানে থাকেন। কলকাতার পথঘাট আমার অনেকই জানা ছিল, কাজেই বাদুড়বাগান খুঁজে নিতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। মলিন একখানি ধুতি, ততোধিক মলিন একখানি চাদর এবং বড়দাদার দেওয়া একজোড়া নতুন চটিজুতা—এই আমার বেশ। এইখানেই বলে রাখি, এই আমার প্রথম জুতা পায়ে দেওয়ার সৌভাগ্য। এর পূর্বে আমি কখনও জুতা বা জামা ব্যবহার করিনি। আমার অভিভাবকদের এ ভদ্র পোষাক সংগ্রহ করে দেবার শক্তি ও সামর্থ ছিল না।

দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, পূজনীয় হেরম্ব দাদাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি যে পরম সহায়, এ কথাও তিনি বলে-ছিলেন। তাই তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে একটুও শঙ্কা, সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ হো'ল না। কিন্তু তাঁর গৃহের বারান্দায় উঠে, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করবার সাহস আমি কিছুতেই সঞ্চয় করতে পারলাম না। দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিন চার মিনিট যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, বারান্দায় ওঠবার সময়েই আমি তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছিলাম। ঘরের মধ্যে তখন বোধ হয় ৮।১০ জন ভদ্রলোক ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বোধ হয় তাঁদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। সে কথা শেষ হলেই তিনি কে একজনকে বললেন, ওহে দেখ তো, বারান্দায় একটী ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভেতরে ডেকে আন। আমি বাইরে থেকেই এ কথা শুনতে পেলাম, আর সে লোক বাইরে আসার

পূর্বেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু তাঁর পায়ে হাত দেওয়ার সাহস হোল না।

একখানি টেবিলের সামনে বিদ্যাসাগর মহাশয় সোজা হয়ে একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। পরে শুনেছি, তিনি কখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন না। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই, তিনি বল্‌লেন—কিরে, কি চাস্‌?

আমি হাত জোড় করে বল্‌লাম, আজ্ঞে আমি কলেজে পড়তে চাই।

তিনি বল্‌লেন—এইবার বুঝি পাশ করেছিস্‌?

আমি বল্‌লাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইবার সেকেণ্ড ডিভিসনে পাশ করেছি, ১০্ টাকা স্কলারসিপও পেয়েছি।

দয়াবসাগব হেসে বল্‌লেন—এতটুকু ছেলে স্কলারসিপ্‌ পেয়েছিস্‌। বেশ! তোর বাড়ি কোথায়?

আমি আমাদের গ্রামের নাম বল্‌তেই, বললেন—ও, পাংশার কাছে! পাংশায় যে আমার সূর্যিদের বাড়ি। আমি হেরম্বদাদার কাছেই শুনেছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জামাতা সূর্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের বাড়ি আমাদের দেশে, পাংশার কাছে। তিনিই তখন কলেজের সুপারিণ্টেডেণ্ট।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বল্‌লেন—একজামিনেশনের রেজাণ্ট ত ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েচে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্যন্ত কি করছিলি? আমি তখন অল্প কথায় আমার বিলম্বের কারণ তাঁকে জানালাম, আর আমার দুরবস্থার কথাও তাঁকে বল্‌লাম। বিদ্যাসাগর মশায় নিস্তব্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে, আমার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী শুনলেন্। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—তাই ত রে, আমার কলেজে ফাষ্ট´ ইয়ারে বোধ হয় স্থান নেই, সব ভরে গিয়েছে। দাঁড়া, জিজ্ঞাসা করছি। এই বলে সূর্যিবাবুকে ডাকলেন। তিনি এলে বল্‌লেন—দেখ সূর্যি, এ ছেলেটি তোমাদেরই দেশের, এর বাড়ি কুমারখালি। এ ফাষ্ট´ ইয়ারে ভর্ত্তি হতে চায়। ভাল ছেলে হে, স্কলারসিপ্‌ পেয়েছে।

সূর্যিবাবু বল্‌লেন, আর ছেলে নেবার উপায় নেই, সব ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর মশায় তখন আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—শুনলি ত, এ বছর আর আমার কলেজে স্থান হবে না। এ বছরটা আর কোন কলেজে ভর্তি হ, আসছে বছরে তোকে সেকেণ্ড ইয়ারে নেবো। মাইনে-টাইনে কিছু দিতে হবে না। তারপরই একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন—দ্যাখ্‌, তোর কথা যা শুনলুম, তোর খরচ চলবে কি করে? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেম্ব্লিতে যদি ভর্ত্তি

হতে পারিস, তাহলে তারা ৫৲ টাকা মাইনে নেবে, স্কলারসিপ্‌ওলা ছেলেদের এক টাকা রেহাই দেয়। তাহলে আর তোর ৫৲ টাকা থাক্‌লো, তাতে চলবে কি করে রে ?

এ কথার আমি আর কি উত্তর দেবো, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন বল্‌লেন—দ্যাখ্‌, এ বছর তোর কলেজের মাইনে আমিই দেবো। তারপর সেকেণ্ড ইয়ারে ত আমার এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে খোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি, তারা এখনও ভর্তি করে, তাদের বেশী ছেলে হয়নি। আজই সেইটে ঠিক করে, কাল সকালে আবার আমার এখানে আসিস্—বুঝলি ?

আমি তখন কেঁদে ফেলেছি। মানুষের হৃদয়ে যে এত দয়া থাকতে পারে, এ আমি জানতাম না। আমার সেই অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উঠে এসে, আমার মাথায় হাত দিয়ে, যে একটি কথা বলেছিলেন, সেকথা এখনও আমার মনে আছে। বল্‌লেন—তোর অবস্থা খারাপ, তাতে কি হয়েছে ? আমিও তোর মতন দরিদ্র ছিলুম। যা, কাল আসিস্। ঠিক এই কয়টী কথাই বলেছিলেন কি না তা মনে নেই ; তবে যা বলেছিলেন, তার ভাব এই রকমই। আমি প্রণাম করতে ভুলে গেলাম। সাশ্রুনয়নে সেই দেব-নিকেতন থেকে বের হয়ে এলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ি থেকে বের হয়ে, সোজা দক্ষিণাদের মেসে গেলাম। তারা জিজ্ঞাসা করলে শুধু বল্‌লাম মেট্রোপলিটানে ভর্তি হবার উপায় নেই। সেই মেসের যাঁরা জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে পড়তেন, তাঁরা বললেন, তাঁদের কলেজে আমায় ভর্তি করিয়ে দিতে পারবেন।

সকাল সকাল আহারাদি শেষ করে, জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে গেলাম। কলেজের হেডক্লার্ক ছিলেন রাজকুমার বাবু। শুনলাম, তিনিই সর্বেসর্বা। প্রিন্সিপাল হেষ্‌টি সাহেব এ সব কাযের সম্পূর্ণ ভার রাজকুমার বাবুর ওপরেই রেখেছেন। আমার সঙ্গীরা রাজকুমারবাবুকে আমার ভর্তির কথা বল্‌লে, তিনি বল্‌লেন—তাই ত' হে, বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। তারপর আবার স্কলারসিপ্‌ ট্রান্সফার করতে হবে। যাক্ ভর্তি হয়ে পড়। দু'চারদিন পরে স্কলারসিপ্‌ ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা আমিই করে দেবো।

বাড়ি থেকে আসবার সময় আমার মা একখানি গহনা বন্ধক দিয়ে, আমাকে ২৫৲ টাকা দিয়েছিলেন। তার থেকে রেল ভাড়া ইত্যাদিতে দুটো টাকা

খরচ হয়ে, আমার কাছে ২৩্ টাকা ছিল। আমি ৫্ টাকা দিয়ে নাম ভর্তি করলাম। স্কলারসিপ্ পেয়েছি বলে, প্রবেশ-ফি দিতে হোল না।

কলেজে ত ভর্তি হওয়া গেল, এখন থাকি কোথায়। দক্ষিণার বাসায় না হয় দু-একদিন বন্ধুভাবে রইলাম, কিন্তু সেখানে মেসের খরচ দিয়ে স্থায়ীভাবে থাকা আমার সাধ্যাতীত। তখন হঠাৎ আমার আর একটি বন্ধুর কথা মনে হোল। আমি যখন গোয়ালন্দ থেকে মাইনর পাশ হয়ে কয়েক মাস ফরিদপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়ে শেষে কুমারখালি স্কুলে এসে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করি তখন আমার এই বন্ধুটী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তেন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে পূর্বে আমার জানাশুনা মোটেই ছিল না। তাঁর বাড়ি পাবনা জেলার অন্তর্গত দোগাছি গ্রামে। তাঁরা সেখানকার ধনী মহাজন ছিলেন। তাঁর নাম হৃদয়নাথ সাহা। কলকাতার হাটখোলার হরচন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীটে তাঁদের খুব বড় আড়ত ছিল। হৃদয় আমাদের গ্রামের সর্বপ্রধান ধনী কুণ্ডুবাবুদের এক শাখার ভাগিনেয়। তাঁদের গ্রামে ভাল ইংরাজী স্কুল না থাকায়, আমাদের গ্রামে মামার বাড়িতে থেকে তিনি পড়তেন। এ ইংরাজী ১৮৭৬ অব্দের কথা।

অতি শুভক্ষণে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে পরিচয় ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল এবং এই সুদীর্ঘকাল সেই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। অবস্থা-বিপর্যয়ে তাঁরা একবারে দরিদ্র হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কলকাতায় ও উত্তরবঙ্গের আড়তগুলো উঠে গিয়েছিল। তাঁদের জমিদারী দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ঘোর দরিদ্র-দশায় পড়েছিলেন, কিন্তু আমাদের কিশোর বয়সের সেই ভালবাসা, সেই স্নেহ, তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি সমানভাবে ছিল। এই সেদিন ৩রা ফাল্গুন ১৩৪০, হৃদয়নাথ অমরধামে চলে গিয়েছেন। আমি তাঁর মৃত্যু-শয্যায় পাশে উপস্থিত হতে পারিনি। আমার সেই বন্ধুর কথাই সেদিন জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ থেকে বের হয়ে মনে হয়েছিল। স্বয়ং ভগবানই যেন এই নিরাশ্রয় ছাত্রকে আশ্রয় দেবার জন্যে, আমায় সেই বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হই, তখন হৃদয়নাথ পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তেন। আমি যেবার প্রথম শ্রেণীতে উঠলাম, তিনি সেবার তৃতীয় শ্রেণীতে এলেন। আমাদের স্কুলের তখন ঘোর দুর্দশা। পড়াশুনা মোটেই ভাল হোত না, ছাত্রসংখ্যাও খুব কম ছিল। আমার মত অসহায়

দরিদ্র ছাত্রই বেশী। হৃদয়নাথ ধনী-সন্তান, বয়স অল্প ছিল বলে, এতদিন মামার বাড়িতে থেকে পড়ছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে তিনি আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে, কলকাতায় পড়তে গেলেন। হৃদয়নাথের বয়স তখন ১৬/১৭ বছর। তাঁর মাথার ওপর দুই বড় ভাই আর পাঁচ সাতটী খুড়া জ্যেঠা। তাঁর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন, সেজন্যে তিনি খুড়া জ্যেঠা ও বড় ভাইদের বড় আদরের পাত্র ছিলেন। আমি সেদিন তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; মনে মনে আশা করলাম, তিনি যদি তাঁর অভিভাবকদের কাছে আবদার করে তাঁদের বৃহৎ আড়তে আমার মত গরীবের দুটী অন্নের ব্যবস্থা করে দেন। আমার সে আশা সার্থক হয়েছিল। ভগবান যেন হাত ধরে আমাকে তাঁদের আড়তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতা হাটখোলার হরচন্দ্র মল্লিকের ষ্ট্রীট আমার অপরিজ্ঞাত স্থান নয়। অনেকদিন আগে, আমার চোখের চিকিৎসা করার জন্যে কলকাতায় এসে এই হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটের ২১ নম্বর বাড়িতে আমার পিসতুতো ভাইয়ের আশ্রয়ে ছিলাম। হৃদয়দের আড়ত ১৯ নম্বর। সুতরাং পথ চিনে যেতে আমার কোনই কষ্ট হোল না। ১৯ নম্বর বাড়ির সম্মুখে গিয়ে আমার একটু ভয় হোল। এত প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ি যে তাঁদের আড়ত, এটা ভাল করে না জেনে প্রবেশ করতে সাহস পেলামনা। বাড়ির প্রকাণ্ড দুয়ারে দু-চারজন লোক বসে ছিল। হৃদয়ের নাম করে জিজ্ঞাসা করলে তারা হয় ত কিছুই বলতে পারবে না, কারণ, সে ছেলেমানুষ, স্কুলের ছাত্র। আমি একটু ইতঃস্তত করে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি দোগাছির সাহাবাবুদের বাড়ি? সে লোকটি উত্তর দিল—হ্যাঁ, এইটে রামলাল সাহার আড়ত। রামলাল সাহা মশায় হৃদয়নাথের জ্যেঠা, তাঁর বাপের জ্যেঠতুতো ভাই। তিনি যে এ আড়তের কর্ত্তা, তা আমি শুনেছিলুম। পাঁচ ছয় সরিকের কলকাতার আড়তে কাযের ভার রামলাল বাবুর উপর।

আমি তখন অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে গেলাম। আমার সৌভাগ্য যে, উপরের হলে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতে হো'ল না, হৃদয়েরও খোঁজ করতে হো'ল না। হৃদয়ের বড় ভাই গিরীন্দ্রনাথ হলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে দৌড়ে এসে, কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—আরে জলধর যে, কবে এলে, সব ভাল'ত? আমি সংক্ষেপে দু-এক কথা

বলতেই, তিনি আমাকে টেনে নিয়ে হলের একপাশে একটা বেঞ্চিতে বসালেন। তারপর হৃদয়কেও খবর দিলেন।

হৃদয় ত আমাকে দেখে অবাক। সে বল্‌লে,—যাঃ, তুমি যে লিখেছিলে যে মাসে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হবে? আমি বললাম—আমি সে সংকল্প ত্যাগ করেছি। আজ জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হয়েচি। গিরীন্দ্রদাদা বললেন—তা বেশ করেচ। তারপর এখানে এসে থাকার ব্যবস্থা কি করেচ?

আমি তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা, কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার কথা সব তাঁকে জানিয়ে বললাম—গিরীনদাদা, থাকবার কিছুই ঠিক করিনি, আমাদের অবস্থার কথা ত জান। দশটা টাকা স্কলারসিপের ওপর নির্ভর করেই এখানে এসেচি। পাঁচ টাকা ত মাইনেই যাবে, থাকবে পাঁচ টাকা। আর বিদ্যাসাগর মশায় বোধ হয় মাসে পাঁচ টাকা দেবেন। এই দশ টাকায় কোন মেসে থেকে চলে না, তাই তোমাদের কথা মনে হো'ল। এখন কি করবো সেই পরামর্শের জন্যেই তোমাদের কাছে এসেছি।

গিরীন্দ্র দাদা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন—চল, মেজ জ্যেঠামশায়ের কাছে যাই, তিনি ঐ ঘরে আছেন। তোকে কিছু বলতে হবে না। তোর নাম তিনি জানেন, তুই যে পাশ করেচিস সে কথা তাঁর কাছে বলেছি। হৃদয় কুমারখালিতে থাকতে, তুই যে তাকে খুব যত্ন করেচিস, সে গল্প হৃদয় মেজ জ্যেঠামশায়ের কাছে করেছে। চল, তাঁর কাছে যাই।

হৃদয় এতক্ষণ চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল, গিরীন্দ্রদাদা দাঁড়াতেই সে বলে বস্‌ল—ও যাই-টাই নয় দাদা, জলধরকে আমাদের এই আড়তে রাখতেই হবে, ওর ব্যবস্থা করে দিতেই হবে তোমায়।

গিরীন্দ্রদাদা হেসে বললেন—আমরা দু-ভাই গিয়ে যদি চেপে ধরি, তাহলে মেজ জ্যেঠামশায়ের বাবারও সাধ্য নেই যে অস্বীকার করেন। আমি মনে মনে বললুম, ভগবান, তাই যেন হয়।

আমরা মেজকর্তার ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একটা বিছানার ওপর বসে তামাক খাচ্চেন। গিরীন্দ্রদাদা আমার পরিচয় দিতে, আমি গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলুম। তিনি আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি ত জলপানি পেয়েচ, এ খবর পেয়েচি। হ্যারে হৃদয়, কুমারখালি স্কুলে ভাল পড়া হয় না বলে তুই যে

কলকাতায় চলে এলি, আর দেখ ত, জলধর সেই স্কুল থেকে পাশ করে জলপান নিয়ে এল। চাই মন, কি বল হে জলধর?

গিরীন্দ্রদাদা তখন ধীরে ধীরে আমার অবস্থার কথা তাঁকে জানালেন। আর আমি যে তাঁদের এখানে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেচি, তাও তাঁকে বললেন। বৃদ্ধ তখন মাথা নীচু করে তামাক টানতে লাগলেন। তারপর গিরীন্দ্রদাদার দিকে চেয়ে বললেন—গ্যাখ্ গিরীন, তুই ত জানিস, এ আমাদের পাঁচ সরিকের আডত। তোরা যেমন এক সরিক, আমিও তেমনি এক সরিক। কাজেই, কথাটা সকলকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

হৃদয় তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে,—ও জিজ্ঞাসা-টিজ্ঞাসা কিছুই করতে হবে না জ্যেঠামশাই। আপনি যা হুকুম দেবেন, দোগাছির বড়বাড়ির কারুর সাধ্য নেই যে তার উপর কথা বলে।

মেজকর্তা হেসে বললেন—ওরে জানিসনে, সবাইকে মানিয়ে চলি বলে আমি কর্তা। যা'ক সে কথা। গ্যাখ জলধর, আমাদের এখানে যারা থাকে, তাদের খাওয়া থাকা নিয়ে মাসে ছ-টাকা দিতে হয়। তা তুমি এক কাজ কর, তোমার কাছে আর ছ-টাকা নেব না, মাসে তিন টাকা দিও। কেমন, এতে রাজি?

হৃদয় হেসে বললে—জ্যেঠামশায়, ও তিনটে টাকাও মাসে মাসে আপনাকেই জমা করে দিতে হবে। তিনি হেসে বললেন—ওরে ব্যাটা, আমি দিই আর তুই দিস, ওর গায়ে না লাগলেই হো'ল, কেমন ত? অর্থাৎ মাসে মাসে বাসাখরচ হিসেবে তিন টাকা করে খাতায় জমা করা হবে, আর সে টাকার জন্যে আমায় ভাবতে হবে না। সোজা কথা এই, আমি নিখরচায় তাঁদের আশ্রয় লাভ করলাম। গিরীন্দ্রদাদা তখন বললেন—আর দেরী নয়, চল তোর সঙ্গে যাই, আজই তোর জিনিষপত্র নিয়ে আসি। আমি বললাম—আজ থাক। কাল সকালে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত কথা বলে, এখানে চলে আসবো। তাঁরা তাতেই সম্মত হোলেন, অনাথের নাথ আমার আশ্রয় মিলিয়ে দিলেন।

হৃদয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে দক্ষিণার মেসে গেলাম। দক্ষিণা আমার জন্যে অপেক্ষা করেই বসেছিলেন। আমার থাকার স্থান হয়েছে এবং মাসে তিনটী টাকা দিতে হবে তাও স্থির হয়ে গিয়েছে—এই কথা শুনে দক্ষিণা খুব আনন্দিত হলেন। বললেন, তোমার যে একটা সুবিধে হবেই, এ আমি ভেবে রেখেছিলাম। তাহলে কাল সকালেই একবার বিদ্যা-

সাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত কথা বো'ল। আমি বললাম, তাঁর কাছে ত যাবই, কিন্তু রাস্তায় আসতে আসতে স্থির করেছি, বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকে আমি কোন সাহায্য নেব না। দক্ষিণা বললেন, পাঁচ টাকা কলেজের মাইনে যাবে, আড়তে দিতে হবে তিন টাকা থাকবে শুধু দুটো টাকা, তাতে চলবে কি করে? জল-খাওয়া আছে, ধোপা নাপিত আছে, কাগজ কলম আছে—এ ছাড়া আরও কত কি খরচের দরকার হবে, দু টাকায় কুলবে কেন? আমি বললাম, জলখাবার আমার মোটেই দরকার হবে না। আর যা চাই, তা ঐ দুই টাকার মধ্যে হয়েও কিছু বাঁচবে। বই কেনবার টাকা আমার আছে, এক সঙ্গে ত সব বই কিনতে হবে না। কাপড়-চোপড় আর সামান্য যা কিছু অভাব পড়বে, মধ্যে মধ্যে দাদার কাছে চাইলে তিনি তা দেবেন—এ কথা তিনি বলেই দিয়েছেন।

সে রাত্রিটা দক্ষিণার মেসেই কাটালাম। পরদিন প্রাতঃকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। আমার বেশ মনে আছে, সেদিন রবিবার। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। এত লোকের মাঝে কি করেই বা যাবো, আর এত অপরিচিত লোকের সম্মুখে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কি বলবো, এই ভেবে দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম; ভাবলাম, সকলে চলে গেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে, তাঁকে আমার কথা বলবো।

বোধ হয় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বিদ্যাসাগর মশায়ের দৃষ্টি আমার দিকে পড়লো। তিনি চেঁচিয়ে বললেন—ওরে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আমার কাছে আয়, শুনি কি হোল! আমি মনে ভেবেছিলাম, আমার মত কত ছাত্র, কত লোক প্রতিদিন তাঁর কাছে আসে, তিনি কি সকলের কথা মনে রাখতে পারেন? আমাকেও হয় ত চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করবেন, কি হে, কি চাই? কিন্তু আমি যে ভুলে গিয়েছিলাম, তিনি দয়ার সাগর, তিনি বিদ্যাসাগর, তিনি দরিদ্রের বন্ধু, তিনি কি দরিদ্রের কথা ভুলতে পারেন!

আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁর পায়ের ধূলো নিতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, হেয়্‌টি সাহেব কি বল্‌লে? আমি বললাম, হেয়্‌টি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় নি, রাজকুমার বাবু ভর্ত্তি করে নিয়েছেন তিনি হেসে বললেন—"যে হেয়্‌টি সেই রাজকুমার। তারপর।"

আমি তখন অতি সংক্ষেপে হাটখোলা আড়তে আশ্রয় পাবার কথা বললাম।

তিনি বললেন, বেশ বেশ! ওরে ছোকরা, এখনও দেশে মানুষ আছে। তা দ্যাখ্, ওতে ত আর চলবে না, মাসে আমার কাছ থেকে পাঁচটা করে টাকা নিয়ে যাস। এ মাসের টাকাটা এখন দিয়ে দিই। তারপর সেকেণ্ড ইয়ারে ত আমার কলেজেই আসচিস্।

আমি হাতজোড় করে বললাম আমার ত টাকার দরকার হবে না এখন। তিনি হেসে বললেন—দরকার হবে না কি রে? দুটো টাকায় চলবে কি করে কত খরচ জানিস! এই ত এখনই বই কিনতে হবে। তারপর কাপড়চোপড় চাই, না ন্যাংটা হয়ে বেড়াবি! আমি বললাম, এখন যে কখানা বই কেনার দরকার, তার টাকা আমার কাছে আছে। যখন অভাব হবে চেয়ে নিয়ে যাব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন—এই দ্যাখো ছেলে! কতজন যে আমাকে ঠকিয়ে নিয়েচে তার হিসেব নেই! এ ছেলেটী সে দলের নয়। আমাকে বললেন, আচ্ছা যা, মাঝে মাঝে এসে পায়ের ধূলো নিয়ে যাস। আর যখন যা দরকার হবে, আমার কাছে নিবি। আমি, যে আজ্ঞা বলে, তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর যে দুই বৎসর কলকাতার কলেজে পড়েছিলাম, সে সময় অনেক অভাব সহ্য করেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু কোনদিন তাঁকে আমার অভাবের কথা জানাইনি। তাঁর আশীর্বাদই আমার অমূল্য সম্পদ হয়েছিল।

আজ ৫৭ বৎসর পরে সেই পুণ্যশ্লোক, দেবপ্রতিম, দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করে কৃতার্থ হলাম।

॥ ৩ ॥

এবার যে কথা বলব, যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, তা আমার পূর্বে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধে লিখিত সময়ের অনেক আগের কথা। সেই জন্যই প্রথমেই নিবেদন করেছিলাম যে, আমার এই সকল প্রবন্ধে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারব না। এবার আমি যাঁর কথা বলব, তিনি বাঙ্গালী জাতির পরম পূজনীয় স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র জীবন-কথা বিবৃত করার জন্য আমি আমার দুর্বল লেখনী ধারণ করি নাই। যে সাধনার বল

থাক্‌লে, যে শক্তি সামর্থ থাক্‌লে গুরুস্থানীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌরবোজ্জল, মহনীয় জীবন-কথা কথঞ্চিৎও বলা সম্ভবপর হয়, সে সাধনা, সে শক্তি-সামর্থ আমার নাই। আমি সে অসাধ্য-সাধন করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি নে। আমি বহুদিন পূর্বের একটী ঘটনার কথা বল্‌ব ; এবং সে ঘটনার নায়ক স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

পূজনীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার কবে, কোথায়, কি অবস্থায় হয়েছিল, সেই কথাটাই এতকাল পরে—সুদীর্ঘ প্রায় ৬৫ বৎসর পরে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

পূর্বেই বলেছি, সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন আমাদের গ্রামের ( নদীয়া জেলার কুমারখালী ) বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বল্‌তে পারব না ; মনে হচ্চে সে হয় ত ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।

আমাদের গ্রামে বহুদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল এবং এখনও আছে। সেই সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে আমাদের বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। দুই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা একজনই ছিলেন। এই বঙ্গ-বিদ্যালয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নাম পরলোকগত হরিনাথ মজুমদার ; তিনি "কাঙ্গাল হরিনাথ" নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। সে সময়ে তাঁর প্রণীত "বিজয় বসন্ত" উপন্যাস পড়ে কেহই অশ্রুসংবরণ করতে পারতেন না ; পরবর্তী কালে তাঁর বাউলের গানে উত্তর ও পূর্ববঙ্গ একেবারে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথা আমার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থে বলেছি ; পারি ত আরও বলব।

আমি যখন বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় একদিন শুন্‌তে পেলাম যে, বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ভূদেববাবু দুই-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসছেন। স্কুলের শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ এবং গ্রামের ভদ্রলোক সকলে একেবারে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কেমন্ ভাবে অভ্যর্থনা করা হবে, তারই আলোচনা হ'তে লাগল। পাড়াগাঁয়ের স্কুল দেখবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরের আগমন, সে ইন্‌স্পেক্টরও আবার যে কেউ নহেন, বাঙ্গালীর গৌরব ভূদেববাবু ; সুতরাং গ্রামের লোক যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তার আর কথা কি !

আমাদের সেই স্কুলের সীমানার প্রান্ত থেকে আমাদের গ্রামের তলবাহিনী গৌরী নদী এখন অনেকদূর সরে গিয়েছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি,

তখন নদীর ঠিক উপরেই আমাদের স্কুল ছিল। শুনতে পাওয়া গেল যে, ভূদেববাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসবেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্যন্ত গিয়েছিল।

স্কুলের সম্মুখে, যেখানে তিনি নৌকা থেকে নামবেন, সেখানে এক প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হোলো, নানা রঙ্গের পতাকা ও পত্র-পুষ্পে তোরণ শোভিত হোলো, ঘাট থেকে স্কুলের বারান্দা পর্যন্ত লাল কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হলো। দুই দিন আর ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামের লোকের অন্য কাজের অবকাশ রইল না। আমি তখন এগার বারো বছরের, আমি এই সমারোহ ব্যাপারের জন্য কত দেবদারু পাতা যে টেনে আনলাম, কত বাঁশ যে কাঁধে করে বইলাম, বড় ছেলেদের হুকুম তামিল করবার জন্য কত যে দৌড়াদৌড়ি করলাম, তা আর বলতে পারিনে। আমাদের উৎসাহ দেখে কে ? এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই সুদূর-অতীতের দৃশ্য আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।

নির্দিষ্ট দিন এসে পড়ল। পূর্বদিনই আমাদের গ্রাম থেকে একখানি সুসজ্জিত পান্‌সী নৌকা কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। যেদিন ভূদেববাবু আস্‌বেন, সেদিন সকল ছাত্রকে ভাল কাপড়-চোপড় পরে আসবার জন্য মাষ্টার মহাশয়েরা আদেশ দিয়েছিলেন। যে সকল ছাত্রের অবস্থা ভাল এবং যারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তারাও ভাল কাপড় প'রে এসেছিল। আমি পিতৃহীন ; অতি দীন ঘরের ছেলে আমি। আমি ভাল কাপড় কোথায় পাব ? একখানি মলিন ছেঁড়া কাপড় এবং ততোধিক মলিন একখানি চাদর গায়ে দিয়ে যথাসময়ে স্কুলে গেলাম ; স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করবার পূর্ব পর্যন্ত, জুতা জামা কেনাব সামর্থ আমার হয় নি।

যাক্ সেকথা। যখন দূরে নিশান-শোভিত পান্‌সী আসিতে দেখা গেল, তখন শিক্ষকমহাশয়েরা সেই লাল কঙ্করময় পথের দুই পার্শ্বে ছাত্রগণকে সারিবন্দী ভাবে দাঁড় করাইতে আরম্ভ করলেন। যাদের বসন-ভূষণ ভাল, তাহাদের দুই-পার্শ্বে প্রথম সারিতে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তাদের পিছনে দ্বিতীয় সারি। আমি মলিন বস্ত্র-পরিহিত দরিদ্রের ছেলে, আমার স্থান হোলো সকলের শেষ সারিতে। এই রকমই আবহমানকাল হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ হয়নি, কিন্তু সেই সকলের পিছনের সারি থেকে তখন যে ভূদেববাবুকে মোটেই দেখতে পেলাম না, এ কষ্টের কথা আমার এখনও মনে আছে।

যথাসময়ে ভূদেববাবু নৌকা থেকে নামলেন, স্কুলের কর্তারা এবং গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে, ঘিরে ধরে স্কুলের মধ্যে নিয়ে গেলেন।

যাঁরা তাঁর দর্শনলাভ করলেন, তাঁরা করযোড়ে প্রণাম করলেন ; আমিও শিক্ষক মহাশয়গণের আদেশমত পিছন থেকেই করযোড়ে প্রণাম করলাম। কাকে যে প্রণাম করলাম, দেখতেও পেলাম না। তারপর আমরা ধীরে ধীরে স্কুলের মধ্যে গিয়ে নিজ নিজ আসনে বস্‌লাম। তখন বেলা এগারটা।

বারোটা বেজে গেল, একটাও বেজে গেল—ভূদেববাবু ইংরাজী স্কুলই পরিদর্শন করছেন, আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিক চেয়ে বসে আছি। বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই, চুপ করে বসে থাকতে হবে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা নিম্নস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন, ভূদেববাবু হয় ত বাঙ্গালা স্কুল দেখতে আসবেন না, আড়াইটার সময় নৌকায় উঠবেন। শুনে মনে বড়ই কষ্ট হোলো এই দুইদিন ধরে যাঁর জন্য বাগানে বাগানে ঘুরে দেবদারু পাতা ও ফুল সংগ্রহ করেছি, বড় বড় ছাত্রদের হুকুম মত বাঁশ টেনেছি, দড়ি এগিয়ে দিয়েছি, তাঁকে একবার দেখবার সৌভাগ্যও আমাদের হবে না ?

ভগবান আমাদের কাতর আবেদন শুনেছিলেন। দেড়টার পর পণ্ডিত মহাশয়েরা ব'লে উঠলেন "সব ঠিক হয়ে বোসো, ভূদেববাবু আসছেন। তিনি এলেই সবাই দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে ভুলো না।"

একটু পরেই কাঙ্গাল হরিনাথকে অগ্রবর্তী করে ভূদেববাবু আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। হাঁ, মনে মনে যে ছবি এঁকে ফেলেছিলাম, তার থেকেও জ্যোতির্ময় মূর্তি! এমন সৌম্য মূর্তি দর্শন আমাদের পল্লীগ্রামে অতি কমই ঘটে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, যীশুখৃষ্টের ছবির মত চেহারা কাঙাল হরিনাথের পার্শ্বে অপূর্ব-দর্শন মূর্তি! এখনও সে দৃশ্য মনে আছে।

ভূদেববাবু প্রথম শ্রেণীতে এসে, আমরা কি কি বই পড়ি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার পরই কাঙাল হরিনাথ বললেন, "একটু আবৃত্তি শুনবেন না ?" ভূদেববাবু বল্‌লেন "বেশ ত।"

আমি বাল্যকাল থেকেই কাঙাল হরিনাথের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁর আদেশে, আমি যখন যে কবিতার বই পেয়েছি, তা আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। বহুদিন পর্যন্ত আমার এ অভ্যাস ছিল ; ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা যে কবে কণ্ঠস্থ করেছিলাম, তার হিসাব দিতে পারিনে ; অথচ আমি হলফ করে বল্‌তে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন দুই লাইন কবিতাও লিখতে পারিনি।

থাক সে কথা। কাঙাল হরিনাথ আমাকেই একটি কবিতা আবৃত্তি করতে

বল্‌লেন। এই কালো চেহারা, মলিন বস্ত্র-পরিহিত, পায়ে জুতা, গায়ে জামা নেই, এমনই একটি ছেলেকে আবৃত্তি করবার জন্য অগ্রসর হ'তে দেখে ভূদেববাবু কি মনে করেছিলেন বলতে পারিনে।

কাঙাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম। আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'। আমি একটুও না ভেবেচিন্তে সেই কাব্য থেকে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলাম। এখন তার সবটা বল্‌তে পারব না, কয়েক লাইন মনে আছে। তা এই—

"কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর।
সে আনন্দ পড়ে মনে,
দেখি হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার।
প্রস্ফুটিত প্রায় যবে ফুল
করে দিক্‌ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।"

কিসে কি হোলো বুঝতে পারলাম না। আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো। তিনি যে ইন্‌স্পেক্টর, তিনি যে দেশমান্য, বরেণ্য, ব্রাহ্মণকুলতিলক ভূদেব বাবু, সে কথা ভুলে গেলেন—তিনি অগ্রসর হয়ে এই মলিনবস্ত্র-পরিহিত, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ কায়স্থ কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে তখন বের হ'লো না।

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর পণ্ডিত মহাশয়কে একটা দোয়াত কলম আনতে বললেন। তাঁর হাতে একখানি বড় বাঁধানো বই ছিল। সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলে কি লিখলেন। তারপর সেই বইখানি আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন "জলধর, আমার কাছে আর বই নেই, তাই এইখানিই তোমাকে দিলাম। আমার আশীর্বাদ।" আমি তখন নতজানু হ'য়ে 'ভূদেব' ভূদেববাবুর পায়ের ধুলা নিলাম। তার পরই তিনি সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া আর দেখতে পেলাম না—আমরা তখন স্কুল ঘরের মধ্যে আটক।

ভূদেববাবু আমাকে আশীর্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি

ইংরাজি বই। তার নাম "Spectator" তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—

কল্যাণবর

শ্রীমান্ জলধর সেনকে

স্নেহাশীর্বাদ

শ্রীভূদেব দেবশর্ম্মণঃ

সে বইখানি আমি কৃপণের অমূল্য রত্নের মত বহুদিন রক্ষা করেছিলাম, গর্বভরে কতজনকে সে বই দেখিয়েছি। তারপর যখন আমি হিমালয়ে চ'লে যাই, তখন একখানি নেকড়ায় বেঁধে আমার জ্যেঠাইমার পুরে, কাঠের সিন্দুকে সেখানি রেখে যাই। অনেকদিন পরে ফিরে এসে বইখানি বার করে দেখি, বই আর নেই—পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে। বইখানি থাকলে আজ আমি পরম গর্বভরে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম। আমার দুরদৃষ্ট!

তাব কয়েক বৎসর পবে আমি পূজনীয় ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করতে হুগলীতে তাঁর আবাসে গিয়েছিলাম। সে কথাটাও এখানে বলি।

আমি যখন জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময় হুগলীর একটি ছেলে আমাদের সহপাঠি ছিলেন। তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি; তিনি যে চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী, তা আমার মনে আছে। তিনি প্রতিদিন বাড়ী থেকে এসে কলেজ করতেন;

একদিন কলেজে বসে কথাপ্রসঙ্গে ভূদেববাবুর নাম তিনি করলেন, বল্লেন হুগলীতে তাঁদের বাড়ীর অনতিদূরেই ভূদেববাবুর বাড়ী; তাঁর সঙ্গে ভূদেববাবুর বাড়ীর সকলেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁর কথা শুনে আমার ইচ্ছা হোলো, তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করে আসি। বন্ধুকে বল্লাম, অনেক দিন আগে, যখন আমি দেশে বাঙ্গালা স্কুলে পড়তাম, তখন ভূদেববাবুকে দেখেছিলাম, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, হয় ত চিন্‌তেও পারবেন। কি উপলক্ষে ভূদেববাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে কথা আর বন্ধুকে বললাম না। তিনি বল্লেন "বেশ ত, এই শনিবারেই দুইটার পর আমার সঙ্গে হুগলী চল না। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমি তোমার সাথে গঙ্গাপার হয়ে নৈহাটীতে তোমাকে রেলে তুলে দেব।"

আমি তাঁর সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই করলাম এবং পরবর্তী শনিবারে কলেজের

ছুটির পর তাঁর সঙ্গে হুগলী গেলাম। নৈহাটীতে গাড়ী থেকে নেমে ঘাটে গিয়ে গঙ্গাপার হয়ে হুগলী উপস্থিত হলাম।

বন্ধু বললেন "চল, আগে ভূদেববাবুর বাড়ীতেই যাই; তারপর আমাদের বাড়ীতে কিছু খেয়ে তোমাকে নৈহাটীতে রেখে আসব।" আমি হুগলী যাবার সময় আমার সেই 'অমূল্য রত্ন', ভূদেববাবুর দেওয়া 'Spectator' খানি একটা কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেইখানিই যে আমার দলিল পত্র।

গঙ্গার উপরেই ভূদেববাবুর বাড়ী। তিনি তখন গঙ্গার দিকে ঘুরে বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসেছিলেন, সামনের টেবিলে কতকগুলি বই ও কাগজপত্র ছিল।

বাটীর সম্মুখে গিয়ে বন্ধুকে বললাম "আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি খবর নিয়ে এসো।"

"না, তার দরকার হবে না, এ বাড়ীতে আমার সব জানা, এ সময় তিনি কোথায় বসেন, তা আমি সব জানি, আমার সঙ্গে এস।"

আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করে গুটি দুই ঘর পার হয়ে গঙ্গার দিকের বারান্দায় গেলাম। ভূদেববাবু ফিরে চাইতেই আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। আমার সঙ্গী বললেন "ইনি আমার সঙ্গে পড়েন। এঁর নাম জলধর সেন। ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

ভূদেববাবু বললেন "বেশ, বেশ, বোসো।"

আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে চিনতে পারেন নাই, পারবার কথাও নয়। কত স্থানে কত লোক, কত স্কুলের ছেলেদের তিনি দেখেন, তাঁর কি আমার মত একটা পাড়াগেঁয়ে ছেলের কথা মনে থাকতে পারে? এই কথা ভেবেই আমি অভিজ্ঞান-স্বরূপ, তাঁর দেওয়া বইখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন মোড়ক খুলে সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা মুক্ত করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেই লেখাটার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, "তুমি সেই জলধর, এত বড় হয়েছ। আমি তোমায় চিনতে পারি নি, মনে কিছু কোরো না বাবা! কলেজে পড়ছ, বেশ, বেশ।"

আমার বন্ধু বললেন "জলধর স্কলারশিপ পেয়েছে।" আমি বললাম "সে আপনারই আশীর্বাদে।" ভূদেববাবু হেসে বললেন "মা সরস্বতীর আশীর্বাদ বাবা!"

তখন তিনি চাকরদের ডেকে জলখাবার আন্‌তে বললেন। আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "জলধর, মনে করে যখন এসেছ তখন আজ এখানেই থাক, কা'ল বিকেলে আমি লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে কলকাতায় পৌছে দেব।"

আমি বল্‌লাম "আমি কলকাতায় এক মহাজনের আড়তে থাকি, তাঁরা দয়া করে দুটো খেতে দেন। তাঁদের না ব'লে এসেছি। সন্ধ্যার পর আড়তে না গেলে তাঁরা ব্যস্ত হবেন।"

ভূদেববাবু বল্‌লেন "বলে এলেই পারতে। তা বেশ, জল খেয়েই আজ যাও। আর একদিন এসো এমনি এক রবিবার স্বমুখে করে বুঝেছ।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তারপর প্রচুর জলযোগ করে, সেই মহাত্মার পদধূলি ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সেই দেব-নিকেতন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেলা শেষ হয়েছিল, বন্ধু-গৃহে আর যাওয়া হোলো না। তিনি গঙ্গা পার হয়ে নৈহাটীতে আমাকে রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।

তারপর আর ভূদেববাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। দেখা করতে যাই নি —পরীক্ষায় ফেল করে কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব।

এতকাল পরে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মার 'স্মৃতি-তর্পণ' করে কৃতার্থ হলাম।

॥ ৪ ॥

এবার যাঁহার স্মৃতি তর্পণ করে ধন্য হব, কৃতার্থ হব, তিনি বাঙ্গালা দেশের নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন, দেশের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। তিনি পরলোকগত মহাত্মা—অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে কে না জানত, কে না চিনত? তিনি ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা; বরিশালের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ধনী নির্ধন সকলের তিনি পরমাত্মীয় ছিলেন,—সমস্ত বরিশাল জেলার লোক অশ্বিনীবাবুর কথায় উঠিত বসিত—তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিত। পূর্ববঙ্গের সে সময়ের যুবক দলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন অশ্বিনীবাবু। বরিশালের যত কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকলের অগ্রণী ছিলেন অশ্বিনীকুমার। অশ্বিনীকুমারই ছিলেন বাঙ্গালার স্বদেশী যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত; তাঁহারই প্রেরণায় বাঙ্গালাদেশে সর্বপ্রথম

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার দেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন, তাঁহার অকপট ধর্মনিষ্ঠা, তাঁহার মহানুভবতা ও কর্তব্যপরায়ণতা সত্যসত্যই তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এতকাল পরে আমার সেই সোদরাধিক প্রীতিভাজন, আদর্শস্থানীয় সুহৃদের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। আমি তখন এল. এ ফেল করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। মাষ্টারী করা ছাড়া যখন আমার উপায়ান্তর ছিল না; একটু রয়ে-বসে চেষ্টা-চরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী অফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষানবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এল. এ ফেল করে তার পরবৎসরই আমাকে চাকুরীতে ভর্তি হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল. এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দুই বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমার ছোট ভাই শশধর খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কেন যে তিনি ভালভাবে পাশ করতে পারলেন না, তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমরা দুই ভাই; শশধর আমার আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় মাস, তখন আমরা পিতৃহীন হই; বড় হয়ে তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলে যে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অবলম্বন বলেই মনে করতেন। তাই, আমি যখন ফেল হলাম, আর তিনি পাশ হলেন, তখন তিনি জেদ করতে লাগলেন যে, আমি আর এক বৎসর পড়ি। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ ক'রে পনর কুড়ি টাকার একটা মাষ্টারী কি অন্য চাকুরী নিয়ে আমার পড়ার খরচ চালাবেন এবং নিজেও ঘরে পড়াশুনা করে মোক্তারী পরীক্ষা দেবেন। পিতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নাই—আমি যে তার দাদা—সে যে আমার বড় আদরের পিতৃহীন ছোট ভাই। আমাদের সংসারের কর্তা, আমাদের বড় দাদা শশধরের এই প্রস্তাব

অনুমোদন করেছিলেন ; কিন্তু আমি আমার পরমপূজনীয় বড় দাদার আদেশ অমান্য করেছিলাম।

তখন বড় দাদা গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেস্কার ছিলেন, পরে হেড ক্লার্ক হন। তিনি চেষ্টা করে আমাকে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। বেতন হোলো নগদ চব্বিশ টাকা পনর আনা— অর্থাৎ বেতন পঁচিশ টাকাই হোলো, তার থেকে মাইনে প্রাপ্তির রসিদ ষ্ট্যাম্পের দাম এক আনা কেটে নিয়ে স্কুলের কর্তারা আমাকে চব্বিশ টাকা পনর আনা দিতেন। কলেজে পড়বার সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণের বক্তৃতা শুনে, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাট্‌সিনি গারিবল্‌ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব বলে আকাশে যে বাড়ী তৈরী করতাম, এক আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার। কি করব, ঐ কয়টি টাকা না হলে যে আমার ছোট ভাইয়ের কলেজে পড়া বন্ধ হয়। তাই, আমি ঐ ready-made চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—অপেক্ষা করবার আমার সময় ছিল না।

আর এই মাষ্টারী চাকুরীটি বেশ! ও-কাজের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করতে হয়না, শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় পাশ বা ফেল হ'লেই মাষ্টারী করবার সনন্দ পাওয়া যায়। অমন সোজা চাকুরী আর নেই ; একদিনের জন্যও মাষ্টারীর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। ছেলে পড়ানো বিদ্যাটা আমরা এতই সহজ করে নিয়েছিলাম! ওর জন্য সাগরেদী করতে হয় না—একেবারে ওস্তাদ শিক্ষক। তা, যাই বলি না কেন, ঐ সহজপ্রাপ্য (এখন কিন্তু দুষ্প্রাপ্য) চাকুরীর পথ খোলা ছিল ব'লে আমাদের মত ফেল করা মুর্খেরাও পার হয়ে গিয়েছিল।

থাকুক সে কথা। ১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম। দাদার কাছে থাকি, কোন ভাবনা নেই। মাইনের টাকা এনে বৌদিদির হাতে দিই ; তিনি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে দেন। খাই দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব সংস্কার-বশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি। গোয়ালন্দের উকিল মোক্তার, বড় বড় কর্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম।

গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থা-বিপর্যয়ে সেই মাইনর স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি। এই জন্যই আমি সকলের কাছে আবদার করতে পারতাম এবং তাঁরা সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন।

সেই যে ৮১ অব্দে ২৫্ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫্ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার সে কথা মনে করবেন না বন্ধু! পাড়াগাঁয়ের স্কুল মাষ্টারদের যোগ্যতার পুরস্কার তখনও কেউ দেয়নি; এখনও দেয় না। আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটি লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটির খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫্ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নয়—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।

এইবার আসল কথা বলি। ১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কংগ্রেস হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) সেই কংগ্রেসে সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেস কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও আমার প্রবাস-স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে কলিকাতার কার্যনির্বাহক সমিতি মনে করেছিলেন নানাস্থানের প্রতিনিধি ও দর্শকে এত অধিক লোক হবে যাদের স্থান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে হতে পারে।

কোন প্রকারে প্রথম দিনের কার্য শেষ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি ও মূল সভাপতি তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে হল। সেইদিনের সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথ জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন যে পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়ের পূর্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তারি জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে টাউন হলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখাশোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্বেই দেখতে পেলাম একটি গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারিপাশে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটি দেখতে যেমন সুন্দর, তাঁর পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটি ; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোনার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো —সেই আলোয়ানের উপর দু-দুটো ব্যাজ—একটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটি প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় রথীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। আমার পার্শ্বে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক্ হয়ে বললেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না। উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বললাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

অনেকের স্বভাব আছে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে। আমার সে স্বভাব মোটেই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি কারও সঙ্গে আপনা হ'তে আলাপ করতে পারিনে, এখন তো মোটেই পারিনে,—যৌবন কালেও পারতাম না। কাজেই দেশমান্য অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হোলো না। আমি সেই সৌম্যমূর্তি যুবককে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি লাভ করলাম।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সেইদিনের দুইটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তার মধ্যে একটি—উত্তরপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সভায় আগমন। দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর দিয়ে মুখোপাধ্যায়

মহাশয় যখন মঞ্চের উপর এলেন তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না—তবুও সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—ইনিই সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ হ'তে যে বাণী প্রদত্ত হোলো, তার একটি কথা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারছিনে। অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধ বললেন—It is no wonder that objects such as these should have drawn distinguished gentlemen from all parts of the country when you find a blind old man like myself of 79 years of age bending under the infirmities of age, taking a part in the deliberations.

আর একটি যুবক সেদিন সত্যসত্যই আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। একটি প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী অবাক হয়ে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব-দর্শন-মূর্তি। তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটিকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বললেন—চিনিনে মশায়, বোধ হয় পাঞ্জাবী কেউ হবে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলাম না। যুবকটি গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর!—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি তখন আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারাজীবী।

কংগ্রেসের কথা এইখানেই শেষ করি।—ভারত উদ্ধার করে যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। আবার সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর। রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চলতে লাগলো।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটী প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন

যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাতুল বা কেউ গোয়ালন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, পঞ্চানন সেইখানে থেকে আমাদের স্কুলে পড়তো। তারি কাছেই ইতঃপূর্বে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে একটা ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনীবাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন সেখানকারই আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান পঞ্চাননও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান আচার্য, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এখনও কলিকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাননের গুণগান করেন। আর তার চরিত্র-মাধুর্য যে আমিই বিকশিত করে দিয়েছিলাম এ-কথা বলে আমাকে লজ্জিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের জীবন অশ্বিনীবাবুর আদর্শেই গঠিত হয়েছিল।

যাক সে কথা। পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনীবাবু কংগ্রেসের মত প্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে কংগ্রেসের বার্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন? আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন এবং এক দিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন। এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার সাহায্য চান এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক।

অশ্বিনীকুমারের নির্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দে সভার ব্যবস্থা আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু তাঁর মত বড় মানুষের ছেলেকে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একদিনের জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করবার অনুরোধ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'ল। তখন পঞ্চাননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আমি বাড়ীর

ভিতর বড়দাদার কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বল্লেন—তাই তো—কি করা যায়! আমাদের এই ছোট চালা ঘর—খড়ের চাল—দরমার বেড়া। এ কুঁড়ে ঘরে তাঁর মত মহামান্য অতিথিকে ডেকে আনি কি করে?

বড়বৌদিদি বল্লেন—তাতে কি হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন। ঠাকুরপো, তাঁকে আসতে লিখে দাও। আমরা প্রাণপণে তাঁর অভ্যর্থনা করব। কি বলিস সেজো। এই বলে তিনি পশ্চাতে দণ্ডায়মান আমার স্ত্রীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বড়দাদার সম্মুখে যে তিনি আর কথা বলতে পারেন না- ঘাড় নেড়ে বৌদিদির প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। আমি উৎফুল্লচিত্তে বাইরে এসে পঞ্চাননকে বললাম – দেখ পঞ্চানন, অশ্বিনীবাবু হয়ত মনে করেছেন—আমি গোয়ালন্দের অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। তুমি তাঁর সে ভ্রম ঘুচিয়ে দাও। তাঁকে লেখ, আমি ২৫ টাকা মাইনের গরীব স্কুল-মাষ্টার। আমার ঘর সত্যসত্যই কুটীর। তিনি এই সব শুনে যদি আমার বাড়ীতে পদধূলি দেন—আমি ধন্য হয়ে যাব—কৃতার্থ হয়ে যাব। তুমি তাঁকে চিঠি লেখ—আমিও কাল তাঁকে চিঠি লিখবো।

পঞ্চানন অশ্বিনীবাবুকে কি লিখেছিল জানিনে—খুব সম্ভব আমি যা বলেছিলাম তাই লিখেছিল। আমিও ঐভাবেই বরিশালে অশ্বিনীবাবুকে পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তর তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন—সে কথাগুলি ঠিক ঠিক বলতে পারব না—তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে তিনি আমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে, গোয়ালন্দে যদি ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুরের রাজ প্রাসাদ থাকতো—আর সেখান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতো, তা হলেও তিনি সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসতেন।

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্নে দেখা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

যথানির্দিষ্ট শনিবারের প্রত্যুষে মেল গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পৌছিলেন। একটি চাকর ব্যতীত সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাঁর আসবার দুইদিন আগে থেকেই আমরা সভার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ-পত্র সকলকেই দিয়ে-

ছিলাম। বাজারের নিকট প্রশস্ত ময়দানে সভার স্থান করা হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম উন্মুক্ত আকাশতলেই সভা হবে, কিন্তু বাজারের আড়তদার ও দোকানদারগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরাই সভা-মণ্ডপ প্রস্তুত করার ভার নিলেন, আর আমার প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট স্কুলের ছাত্ররা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার স্কুলের ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিলেন।

গোয়ালন্দের সর্বপ্রধান উকিল যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ও শনিবার প্রত্যূষেই ষ্টেশনে গিয়ে তিনিই সর্ব-প্রথম অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করবেন এ কথাও স্থির হয়েছিল। আমাদের আরও একটা সুবিধা হয়েছিল। শনিবার কি উপলক্ষে অফিস আদালত স্কুল সমস্তই বন্ধ ছিল। তার জন্য আমাদের লোক-বলও বেড়েছিল এবং ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজনও আমরা করতে পেরেছিলাম।

শনিবার প্রত্যূষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই ভোরেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার, দোকানদার মুটে মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে নিশান হাতে করে ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামবার পূর্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে প্লাটফরমে নামালেন। তখনও বন্দে-মাতরম্ দেশে আসেনি, কাযেই সমবেত জনমণ্ডলী করতালি দিয়েই এই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে, সুমুখে যাঁরা ছিলেন যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর অশ্বিনী-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কই, জলধর কই? এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোন-দিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনো দাঁড়াতাম না, এখনও না। আমি সে সময় কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন যে আমি পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—এই নিন আপনার জলধর।

অশ্বিনীবাবু সহাস্যমুখে বললেন—কথাটা ঠিক হোলো না—বলুন, এই

নিন আমাদের জলধর। সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিতে গেলাম। তিনি হো হো করে হেসে বললেন—পায়ে কি আর এখন ধূলো আছে ভাই—এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন—প্রণাম আর করা হোলো না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে কে একজন বললেন, আপনার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সদা-প্রফুল্ল-বদন অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—জলধরের বাড়ী এখান থেকে ক' ক্রোশ?

যাদববাবুই জবাব দিলেন—ক্রোশ তো নয়—আধ মাইলেরও কম।

অশ্বিনীবাবু বললেন—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আমি বরিশালের বাঙ্গাল অশ্বিনী দত্ত। এখনও প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তিন চার ক্রোশ হাঁটি। তখন সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতেই আমার বাসায় এলেন। আমার বড় দাদা ষ্টেশনে যান নি, বাড়ীর ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বাসার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সকলে নিকটস্থ হলে যাদববাবু দাদাকে দেখিয়ে বললেন—ইনিই জলধরের দাদা দ্বারিকবাবু—আজ আপনি এঁরই অতিথি। বড়দাদা নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতেই অশ্বিনীবাবু নতজানু হয়ে পদধূলি গ্রহণ করলেন। তার পরই দাদা অতি মৃদু স্বরে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

সে কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তা তাঁর মত সদাশয় মহৎ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন—আমি কি আপনার বাড়ী এসেছি। আমি আমার বাড়ীতেই এলাম—কোন শিষ্টাচার দেখাবেন না দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই অশ্বিনী।

এমন করে কেউ যে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে একান্ত আপনার জন করে নিতে পারে, এ আমি পূর্বে কখনো দেখি নি। অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আমার বড়দাদাও উপযুক্ত দাদা—তিনি বললেন, আমার একটু ভুল হয়েছিল অশ্বিনীকুমার—যাও তোমার বাড়ী ঘর তুমি দেখে নাও।

তার পর আমাদের বাইরের যে ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক একবার চেয়ে দেখে বললেন—এ কি করেছেন দাদা—এ যে রাজ-অভ্যর্থনা।

করা হয়েছিল তো ভারী! একখানা চৌকির উপর বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল—আর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ধার করে খানকতক চেয়ার, দুখানা টেবিল ও একটা আলনা আনা হয়েছিল। এই হোলো তাঁর রাজ-অভ্যর্থনা!

দাদা বললেন, আমি ওর কিছুই করিনি। যাঁরা করেছেন, যাও তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করো গিয়ে।

তাই যাচ্ছি বলেই কাপড়-চোপড় না ছেড়েই অশ্বিনীবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে বল্লেন—চল জলধর—গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসি। বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, সে সব খবর আমি পঞ্চাননের চিঠিতে জানতে পেরেছি।

আমি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলাম। বড়বৌদিদি তখন বারান্দায় জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁর সুমুখে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—আপনি যে বড়বৌদিদি তা আমি বুঝতে পেরেছি। কথা বলে আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বড়বৌদিদি বুঝলেন—আচ্ছা লোকের হাতে পড়েছেন। কথা না বলে পারলেন না, বললেন—আশীর্বাদ করি—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। অশ্বিনী-বাবুর সেই হাসি, বললেন—ওর একটাও আমি চাই নে। যাক, সে কথা পরে হবে। কই আর এক লক্ষ্মী কই।

বৌদি বললেন—আপনার আসবার সাড়া পেয়েই সে ঐ ঘরে পালিয়েছে।

অশ্বিনীকুমারের কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নেই—আমার শয়ন ঘরের ভিতর প্রবেশ করে আমার স্ত্রীর হাত ধরে টেনে এনে বললেন—আমি ও লজ্জা টজ্জা মানব না। এ জীবটিকে কোথায় পেয়েছেন বৌদিদি?

বড়বৌদিদি বললেন—শিবনিবাসের কাছে দাওয়ানের বেড়েয়।

ওরে বাবা! শিবনিবাস! এই বলেই ছড়া কাটলেন—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী—
ধন্য নদী কঙ্কনা"।

বৌদিদি, আমি দাওয়ানের বেড়ের ইতিহাসও পড়েছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দাওয়ান রঘুনন্দনের স্থাপিত এ দাওয়ানের বেড়। বড়বৌদিদি বললেন—এতও আপনি জানেন।—এ সেই দাওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী। এখন এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।

আচ্ছা! সে পরিচয় পরে করা যাবে, এখন যাই, গিয়ে হাত পা ধুইগে।

বাইরে এসে সভার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাঁকে বললাম, আজই সাড়ে তিনটেয় সভা হবে বাজারের কাছে। সবই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আপনি জলটল খেয়ে বিশ্রাম করুন—আমি একবার দেখে আসি সব ঠিক হচ্ছে কি না। এই বলে আমি চলে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় একটা।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি দাদার ঘরের বারান্দায় অশ্বিনীবাবু আহার করতে বসেছেন। তিনি তখন নিরামিষাশী ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—দেখ জলধর, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতেই চেয়েছিলাম। তা তোমার ঐ লক্ষ্মীটি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তুমি হয় তো এ বেলা আসবেই না, একেবারে সভা শেষ করে আসবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ফেলেই খেতে বসেছি। দাদাকে বাইরের ঘরে নির্বাসিত করে ওরা দুইজনে আমাকে নিয়ে পড়েছে। বড় শক্ত বাঁধনেই ভাই ফেললে আমাকে। তারপর যে কত কথা—কত হাসি তামাসা—সে সব কথা মনে হলেও এখন আমার চোখে জল আসে।

তারপর যথানির্দিষ্ট সময়ে অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় সভার অধিবেশন হ'ল। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনা করলেন। অশ্বিনীবাবু আমাদের দেশের শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্বন্ধে একঘণ্টার উপর বক্তৃতা করলেন। সকলের শেষে আমি ধন্যবাদ করলাম। সভার কার্য শেষ হ'ল। অশ্বিনীকুমার এই অনুষ্ঠান দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। অশ্বিনীবাবু বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খানিকটা দুধ ব্যতীত আর কিছুই খেলেন না। গরীবের যা কিছু আয়োজন হয়েছিল আমরাই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

শয়নের কিছু পূর্বে অশ্বিনীকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমারই সম্মুখে বড়বৌদিদিকে বললেন—বৌদি, যা মনে করেছেন—তা নয়। অশ্বিনীকুমার কাল সকালে যাচ্ছেন না।

একথার জবাব আমার স্ত্রী দিলেন—কে আপনাকে যেতে বলছে মশায়! থাকুন না দশ পনর দিন আমাদের এখানে। সত্যসত্যই তাই ইচ্ছে করছে, এই বলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশ্বিনীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর চাকরটিকে বাড়ীতে রেখে আমাদের চাকরকে সঙ্গে

নিয়ে অশ্বিনীবাবু বেড়াতে বেরুলেন। বেলা প্রায় আটটার সময় যখন ফিরলেন—তখন তাঁর পেছনে আমাদের চাকরের মাথায় একটা ঝাঁকা, আর একটা নগদা কুলীর মাথায় একটা ঝুড়ি। এই দৃশ্য দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কি দাদা। অশ্বিনীকুমার হিন্দি বাত্ আওড়ালেন—তফাৎ যাও। কোহি বাত্ মাত্ বোলো। এই বলে লোক দুটোকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন—আমি আর তাঁর অনুসরণ করলাম না, কারণ জানতাম তখন বড়দাদা বাড়ীর ভেতর আছেন। দাদা একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—দেখ গিয়ে জলধর তোমার পাগলের কাণ্ড। বাজারের আর কিছু বাকী রাখেনি।

তার খানিকটা পরেই বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি—উঠানের দড়ীর ওপর তাঁর গরম কোট ও শাল ঝুলছে; পায়ের জুতো মোজা খুলে উঠানে ফেলে দিয়ে—মহাপুরুষ বসে কুটনো কুটছেন। পাশে আর একখানা বঁটি নিয়ে আমার স্ত্রীও তাঁর সাহায্য করছেন।

আমি বললাম, দাদা ও কি, হাত কাটবেন যে?

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন—ভগবান, তাই যেন হয়—যতদিন কাটা-ঘা না শুকোবে ততদিন তো আমাদের কথা মনে থাকবে।

অশ্বিনীকুমার বললেন—জলধর তোর এই গৃহিণীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এর কথারও অন্ত নেই—হাসিরও অন্ত নেই।

তারপর অশ্বিনীকুমার একবার রান্নায় যোগ দিচ্ছেন, আর একবার বা বাইরে এসে যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের বলছেন—আমি কালকের অশ্বিনীকুমার নেই মশায়—আমি আজ এ বাড়ীর রাঁধুনী।

এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনের ভোরের ষ্টিমারে তিনি যখন ঢাকা রওনা হন, তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন, আমার বৌদিদি ও আমার গৃহিণীও চোখের জল ফেলেন। কথা আর কেউ বলতে পারলেন না, উভয়পক্ষের চোখের জলেই বিদায় অভিনন্দন হয়ে গেল।

তারপর। তার পরের কথাও কি বলতে হবে? যখন অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি তখন আর একটি দৃশ্যের কথা অতি সংক্ষেপে বলি।

পূর্ববর্তী ঘটনার নয় মাস পরে একদিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।

অশ্বিনীকুমার সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিরস্কার করে বললেন, হ্যাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,—এই ন'মাসের মধ্যে একটা খবর দিলিনে। আমি শুষ্ক মুখে বললাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমি যে বুঝতে পারছিনে। আমি বললাম—শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে আমার একটি কন্যা-সন্তান হয়। বারদিন পরেই সেটি মারা যায়। তার বারদিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয় যাত্রী।

এঁ্যা—কি বলিস্! এই বলে সেই মানব শ্রেষ্ঠ গোলদীঘির পার্শ্বের রেলিং-এ ভরদিয়ে নতমুখে দাঁড়ালেন। দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আমি চুপ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই তিন মিনিট পরেই আত্মসংবরণ করে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বললেন —জলধর—এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশীদিন টি ঁকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।

॥ ৫ ॥

আজ যাঁর স্মৃতি তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্বজন পরিচিত ছিলেন, এবং এখনও অসংখ্য জনগণের শ্রদ্ধা গ্রহণ করছেন।—তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব ( superman ), ভারতের উজ্জ্বলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—ভারতশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারতগগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগত যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতির তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে

অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন।—তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ্ (অধুনা স্কটিশ চার্চেস) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর এক জনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েক মাস হল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লীজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ্. এ পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের পর-বৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়; তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ"-দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম

তখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর কলিকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ঐ ধর্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম—কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয় নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারি নি। কথাবার্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয় নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত-চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত-স্থায়ী গভীর মর্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দের সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে?

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু' একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম।

কোন দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কি না সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধু-বান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয় নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি •স্বামী বিবেকানন্দের ( নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে ) দর্শন লাভ করি। দর্শন লাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, আর তখন পরিচয় করার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি যখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন সেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার। যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন!

ওরে বাবা!—সেই মাষ্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা-টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে যে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত! কি করি—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অংকশাস্ত্রে গাধা বানাব।

অবান্তর হলেও, সেই সময়ে ডেরাডুনের করণপুরে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল—সেই উপনিবেশের কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করছি। পাঁচ সাত দিন এই উপনিবেশের বাঙ্গালীদের গৃহে যাতায়াত করে আমি একটি জিনিষ

দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হিমালয়ের বক্ষ ডেরাডুনের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে এতগুলি "কালী"র সমাবেশ আমার কাছে আশ্চর্য ঠেকেছিল।

সর্বপ্রথম নাম করতে হয়—কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের। ইনি জি টি সার্ভে অফিসের প্রধান কম্‌পিউটার ছিলেন এবং আমি যতদূর জানি, গণিতে অত বড বিশেষজ্ঞ সেই সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিলেন না। পারি তো তাঁর কথা অন্য সময়ে বলব।

দ্বিতীয় "কালী"—কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি কালীমোহনবাবুব সহকারী ছিলেন। আর এক "কালী"—কালীকান্ত কর। ইনি ফবেষ্ট অফিসেব "বডবাবু" ছিলেন। আর "কালী"—আমার মাষ্টারজী—কালীকান্ত সেন। পঞ্চম "কালী" ছিলেন কালীপদবাবু। ইনি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

এই পাঁচ "কালী"তেই পর্যাপ্ত হয় নি—সেই সময়ে যিনি বৎসরে ছয় মাসেব অধিক ডেরাডুনে থাকতেন—তিনি কলিকাতার প্রথিতনামা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়।

এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদেব নাম করতে গেলে তালিকা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দুইটি নাম বিশেষভাবে আমার মনে পডছে—শশিভূষণ সোম মহাশয় ও রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব। সেই সময়ের একজন মাত্র এখনও বেঁচে আছেন।* তিনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম। আমাদের সময়ের তিনিই এখন বেঁচে আছেন এবং তিনি সেখানকারই অধিবাসী হয়েছেন। এখন ডেরাডুনে যাঁরা বেড়াতে যান বন্ধুবর বিমলাচরণ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সাহায্য করেন।

ও কথায় আর কাজ নেই। আমি মাষ্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ন দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাষ্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম। দুই তিন দিন বন জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমাল্‌টেনিয়াস্‌ ইকোয়েশন্‌ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল— হৃষীকেশ।

---

* অর্থাৎ জলধরের সময়ে।—সম্পাদক।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি হাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে সন্ধ্যার পূর্বেই হৃষীকেশে পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাজেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানি নে। সেই সদাব্রতের লোকরা হৃষীকেশের গঙ্গার চড়ার ওপর ঘাস পাতা বাঁশ খড় দিয়ে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে রাখতো। সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব কুটীরে বাস করতেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করতে হ'ত না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীরা সদাব্রতের সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সদাব্রতের লোকরা দুখানি মোটা রুটী, আর খোসা সুদ্ধ কলায়ের ডাল—আর কখন কখন বা তার সঙ্গে একটু নুণ আর লঙ্কাও দিতেন। সন্ন্যাসীরা তাই নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে আহার করতেন, তারপর অঞ্জলিপুরে জল পান করতেন। রুটি দুই খানিই বটে—কিন্তু সেই দুই খানিই তৈরী করতে আধ সের তিন পোয়া আটা লাগতো। সুতরাং সদাব্রতওয়ালাদের আর সন্ধ্যাবেলার আহার জোগাতে হ'ত না, আর তার প্রয়োজনও হ'ত না।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ী, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি নি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাজেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বললেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক জন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধূনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনালভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বললেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। আমি মরব না—আমার অনেক কাজ আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয়, ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তাঁর খুল্লতাত সার্ভে অফিসের একজন প্রধান কর্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিনজন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাজেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—দ্বিতীয় তিথি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যূষে

তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এই বার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে একদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে। গভীর ধর্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম না। স্বধু গান, স্বধু আনন্দ, স্বধু স্ফূর্তি, স্বধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিন ও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করি নি। স্বামিজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত। সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোক-সভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।

॥ ৬ ॥

এবার যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করব, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহেন; —উচ্চ উপাধি দূরে থাকুক—ইংরাজী বর্ণমালার সহিতও কোনদিন তাঁহার পরিচয় হয় নি। কিন্তু তিনি বিশ্বের মহাবিদ্যালয়ে—বিশ্বনাথের কাছে উচ্চ—বহু উচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি আমার গ্রামবাসী, আজীবন সুহৃদ ও সখা, আমরণ বন্ধু; এই জন্যই যে এত কথা বললাম তা নয়—সত্যসত্যই তিনি বাংলাদেশের একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনন্যসাধারণ বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সিদ্ধ-সাধক ছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনামাত্রই করেন নাই, তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীশ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।*

* জন্ম কুমারখালিতে ১৮৬০, মৃত্যু ১৯১৩।—সম্পাদক।

পূর্বেই বলেছি, শিবচন্দ্র আমার গ্রামবাসী ছিলেন। গ্রামের এক প্রান্তে আমার বাড়ী ও অপর প্রান্তে শিবচন্দ্রের বাড়ী ছিল না। তিনি আমার নিকট প্রতিবেশী ছিলেন—তাঁদের বাড়ী ও আমার বাড়ীর মাঝখানে একখানি মাত্র বাড়ী; সুতরাং বলতে গেলে আমরা এক বাড়ীরই ছেলে ছিলাম।

বাংলাদেশের তুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং নিতান্ত অখ্যাত-নামা আমি, এই তিনজন একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করি। আমি জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র, শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের—২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।*

তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শিবচন্দ্র আমার ঠিক তু'মাসের ছোট, অক্ষয় আমার ছ' মাসের ছোট ছিলেন। তাই আমি শিবচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারেব দাদা ছিলাম।

এখন যেমন সকলে আমাকে সুধু "দাদা" বলে ডাকেন—শিব-অক্ষয় আমাকে তা বলে ডাকতেন না। তাঁরা ডাকতেন 'জল-দা' বলে

শিবচন্দ্রের পিতৃদেব চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ মহাশয় আমাদের অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁকে কাকা বলে ডাকতাম। তিনি গল্প করতেন যে, নবদ্বীপে তিনি আঠার বৎসর সুধু কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন—আর কিছু পড়েন নি। কিন্তু এই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন উপলক্ষে তাঁর অধ্যাপকেরা তাঁকে সর্বশাস্ত্র-বিশারদ করে দিয়েছিলেন। কি সুন্দর ছিল তখনকার শিক্ষা-পদ্ধতি! আর অধ্যাপকগণের ছিল কি অপূর্ব মনীষা!

শিবচন্দ্র আর আমি, একসঙ্গেই খেলাধূলা করতাম—আমাদের বাড়ী যে পাশাপাশি। অক্ষয়কুমারকে আমরা এক আধ-মাসের জন্য বছরে সঙ্গী পেতাম। তাঁর পিতৃদেব পূজনীয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয় রাজসাহীতে চাকুরি করতেন, অক্ষয়কে সেইখানেই থাকতে হোত।

সেকালের পদ্ধতি অনুসারে নানা অনুষ্ঠান করে পুরোহিত মহাশয় আমাদের হাতে-খড়ি দেন নি। আমারও নয়—শিবচন্দ্রেরও নয়। শুনেছি অনুষ্ঠান সবই হয়েছিল, পুরোহিত মহাশয়ও পূজা-অর্চনা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরমপূজনীয় পরমারাধ্য কাঙাল হরিনাথ। তিনিই তুই মাস আগে-পিছে আমাদের তুই জনের বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। আর সেই

* তারিখটি ভুল, জন্ম তারিখ ১ মার্চ ১৮৬১।

সাধকপ্রবরের শুভ সূচনার ফলে একজন হলেন সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, আর একজন হলেন—অ-সিদ্ধ অ-পক আমি ;—এক ঝাড়ের বাঁশেই দেবপূজার পুষ্পপাত্রও হোল এবং হাড়ীর ঝাঁটাও হোল।

কোন্ বছরে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে আমরা কুমারখালি বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশলাভ করেছিলাম তা আমার মনে নেই। মনে থাকবারও কথা নয়। পাড়াগাঁয়ের গরীবের ছেলে, তুবেলা যার অন্ন জোটেনি তার সম্বন্ধে এ-সব কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্য কারও মাথা-ব্যথা হতে পারে না। শুনেছি, আমাদের যখন চার পাঁচ বছর বয়স, তখন শিবচন্দ্র ও আমি বাংলা স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের তুজনের কেউই গুরুমশায়ের পাঠশালায় প্রথম শিক্ষা লাভ করি নি—একেবারে সোজা 'বর্ণপরিচয়' হাতে করে বাংলা স্কুলের ছাত্র হয়েছিলাম। কাঙাল হরিনাথের কাছে শুনেছিলাম—আমিই আগে স্কুলে যাই, তার মাস তুই তিন পরে শিবচন্দ্র স্কুলে ভর্তি হন।

তুই বছর কি আড়াই বছর আমরা একসঙ্গেই পড়েছিলাম। তারপরে এক আশ্চর্য ঘটনায় শিবচন্দ্রকে বাংলা স্কুল ত্যাগ করতে হয়েছিল। শিবচন্দ্রের পিতা—আমাদের চন্দ্রকাকা অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন। সেই সময় একদিন চন্দ্রকাকা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি পড়ছিস রে শিব?

শিবচন্দ্র বললেন, "ডুবালের গল্প।"

"ডুবালের গল্প। সে আবার কি রে? দেখি।" এই বলে তিনি বইখানি হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে বইখানি দূরে নিক্ষেপ করে বল্লেন—"এই সব বুঝি পড়া হয়? দেশে আর মানুষই নেই, মহাপুরুষও নেই, পড়িস কি না ডুবালের গল্প। যাঃ, কাল থেকে তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না, এই ডুবালেই দেখছি দেশ ডুবালে।"

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কায। পরদিন থেকেই শিবচন্দ্র আর বাংলা স্কুলে গেলেন না। পরবর্তী জীবনে অনেক স্থানে অনেক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র তাঁর পিতার সেই কথা কয়টি ভোলেন নি। যখন তখনই বলতেন—এই ডুবালেই দেশটা ডুবালে।

দেশ ডুবেছে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু এই ঘটনা থেকেই আমরা ভবিষ্যতের অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্রকে পেয়েছিলাম। তা না হলে হয়ত আর দশজনের মত শিবচন্দ্রও হয় আমাদের মত তু-কড়ি

সাতের মানুষ হতেন, নয় তো কিঞ্চিৎ স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে বসতেন, আর শ্রাদ্ধ-সভায় গিয়ে অপবের দুর্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক মাথা নেড়ে আবৃত্তি করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জাহির করতেন।

স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে শিবচন্দ্র বাড়ীতে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্যেব কাছে ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাপ বা পিতামহের কাছে পড়া তাঁর হয়ে উঠল না। এই যে ভট্চাষ্যি বংশ—এর একটা সুখ্যাতি আছে। এ বংশের লোক যেমন তেজস্বী তেমনি দুর্দমনীয়। শিবচন্দ্রের পিতা এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। শিবচন্দ্রও ছেলেবেলা থেকে পিতার এই গুণ লাভ করেছিলেন। বাল্যকালে তিনি যেমন দুর্দান্ত তেমনি একগুঁয়ে ছিলেন। কোন কার্যে একবার 'না' বললে এই ভট্চায-নন্দনকে কেউ 'হাঁ' বলাতে পারতেন না,—এমন কি স্বয়ং কাঙাল হরিনাথও না। এমন দুর্দমনীয় একগুঁয়ে ছেলের পাঠ পিতার কাছে বেশী দিন চল্‌ল না।

চন্দ্রকাকা তাকে নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্র শিবোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দিলেন। অপূর্ব মেধাবী শিবচন্দ্র অল্প কয়েক বৎসবের মধ্যেই ব্যাকবণ, স্মৃতি ও দর্শনে বিশেষ অধিকার লাভ করলেন। কিশোর শিবচন্দ্রের এই অনন্য সাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁর অধ্যাপকেরা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি হবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। শিব-চন্দ্রেব কাছেই শুনেছি—তিনি যখন নবদ্বীপের টোলে অধ্যয়ন করতেন, তখন তাঁর সতীর্থগণের মধ্যে কেউই তাঁকে তর্কে পরাস্ত করতে পারত না। সেই সময়েই তিনি সংস্কৃতে ও সুললিত সাধু বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শিক্ষা করেন।

নবদ্বীপের পাঠ শেষ করে শিবচন্দ্র কাশীতে বেদান্ত পড়তে যান, কিন্তু সেখানে আর তাঁর বেদান্ত পড়া হোল না। যে তন্ত্রশাস্ত্র পুরুষানুক্রমে তাঁদের বংশে অল্পবিস্তর অধীত হয়ে আসছিল, সেই তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের সুপ্ত স্পৃহা শিবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগরূক হোল। চন্দ্রকাকার মুখেও শুনেছি তাঁদের পূর্ব-পুরুষের কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন হয়েছিলেন। যুবক শিবচন্দ্রের হৃদয়ে তন্ত্রালোচনার বাসনা বলবতী হোল। পূর্বপুরুষগণের সাধন-মার্গ অনুসরণ করবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন। কাশীতে সে সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রের যাঁরা অধ্যাপক ছিলেন, যাঁরা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করতেন, শিবচন্দ্র তাঁদের

সঙ্গে মিশে গেলেন। অপূর্ব প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই কাশীতে তাঁর সুনাম প্রচারিত হোল, সু-বক্তা বলে তাঁর প্রতিষ্ঠা হোল। তার পরই কাশী ত্যাগ করে তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র ঘরে ফিরে এলেন এবং পরম উৎসাহে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করলেন, তন্ত্র-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব নিতে আরম্ভ করল। তিনি সেই শিষ্যদের নিয়ে পঞ্চমকার সাধন আরম্ভ করলেন।

শিবচন্দ্রের সঙ্গে এই সময়ে আমার ধর্মমতের পার্থক্য উপস্থিত হোল। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্নই রয়ে যায়। আমি তন্ত্র-শাস্ত্র পড়ি নি, এখনও তার কিছুই জানি নে; কিন্তু তা হলেও আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছিনে যে আমি তন্ত্র-শাস্ত্রের বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমি তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের সাধন কি, তা জানিনে। কিন্তু পাঁচটি ম-আদি নাম শুনে তখনও শিউরে উঠতাম—এখনও উঠি। রক্তবস্ত্র-পরিহিত সিন্দুর চর্চিত-ললাট হাতে-গলায় একরাশ মালা—এ মানুষ দেখলেই আমি দশ গজ দূরে সরে দাঁড়াতাম, এখনও দাঁড়াই। ও মূর্তি আমার মনে ভক্তির সঞ্চার তো করেই না, ত্রাসের সঞ্চার করে। আমি চোখ বুঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা স্মরণ করে কেঁপে উঠি।

শিবচন্দ্র তন্ত্রের কথা আমাকে বোঝাবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা আমাকে কত পড়তে দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সেই তন্ত্র-মন্ত্র আমার মাথার ভিতর ঢোকাতে পারেন নি। •

শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও আমি—এই তিনজন এক সঙ্গেই সেই কাঙালের চরণ-প্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলাম। শিবচন্দ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের ক্রিয়া-কলাপে সিদ্ধি-লাভ করলেন। অক্ষয়কুমার তন্ত্র-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের পাশ দিয়েও গেলেন না। আর আমি যা হলাম তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বড় হবেই এক সময় কাঙাল হরিনাথ বলেছিলেন—এই বচনটিকে মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার আর রকম দেখছিনে। তিনটি তিন রকম হোল। একজন হোল ফিকির, আর একজন হোল ফকির, আর একজন হোল মুসাফির। তাঁর কথার তাৎপর্য এই যে—অক্ষয়কুমার উকিল হয়ে ফিকিরবাজ হলেন, তান্ত্রিক শিবচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন—ফকির হলেন; আর আমি মুসাফির হয়ে হিমালয়ে চলে গেলাম। কিন্তু

কাঙাল হরিনাথের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অক্ষয়কুমার ও শিবচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্বের গৌরব ষোল আনা রক্ষা করে অমর-ধামে চলে গিয়েছেন।

পূর্বেই বলেছি—আমার সঙ্গে ধর্মমতের ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শিবচন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিগূঢ়তর হয়ে পড়েছিল। তাঁর সেই রক্তবস্ত্র ভেদ করে এক পবিত্র মন্দাকিনীর প্রবাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হোত। তখন আমি ভুলে যেতাম যে শিবচন্দ্র তান্ত্রিক, আর আমি কিছুই না। শিবচন্দ্র যখন তাঁর গৃহে মাতা সর্বমঙ্গলার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, আমি তখন তার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম, কায়-মনোবাক্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলাম। এই যে পরস্পরে মতান্তর—এতে কখন মনান্তর হয় নি।

কলিকাতা হাইকোর্টের সেই সময়ের প্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন উডরফ শিবচন্দ্রের কাছেই তন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি শিবচন্দ্রের তন্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে এবং অপূর্ব প্রতিভা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন তিনি এ-দেশে ছিলেন নানা ভাবে শিবচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। শিবচন্দ্রের তন্ত্র-তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ সার জন উডরফ ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এ-দেশে থাকতেই শিবচন্দ্র সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। এই সংবাদ শুনে মহামতি উডরফ তাঁর সংস্কৃতের অধ্যাপক অধুনা পরলোকগত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে শিবচন্দ্রের বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কুমারখালিতে পাঠিয়ে দেন। অবসর গ্রহণ করে বিলাতে গিয়েও তান্ত্রিক-শ্রেষ্ঠ মহামতি উডরফ শিবচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রের কথা বিস্মৃত হন-নি। সর্বদাই তাঁদের সংবাদ নিতেন এবং সাময়িক সাহায্যও করতেন।

শিবচন্দ্র যে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এ কথা পূর্বেই বলেছি। সাধু ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার শক্তি সত্য সত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল; তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটি পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলতি ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধু ভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সে কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করবেন। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শিবচন্দ্র ও

পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি বাংলাদেশে সনাতন হিন্দুধর্মের বান ডাকিয়ে এনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব ( culture ) সেই সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর গীতা ও কৃষ্ণচরিত্র সেই সময়েই প্রকাশিত হয়। সে যুগ যেন বাংলা ভাষার একটা প্লাবনের যুগ—সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের একটা প্রবল প্রচেষ্টা।

শিবচন্দ্র অনেক বক্তৃতা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন—সে সকলই পরম উপাদেয়; কিন্তু তাঁর তন্ত্র-তত্ত্বই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি যে কত গান লিখেছেন তার সংখ্যা করা যায় না। সেগুলি সাধকের অমূল্য রত্ন। এখনও আমাদের দেশের বহু লোক কাঙাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীত ও শিবচন্দ্রের মাতৃমহিমা গান করে থাকেন। এখনও শিবচন্দ্রের গৃহে মা সর্বমঙ্গলার পূজা হয়। এখনও বাড়ী গেলে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মাতা সর্বমঙ্গলাকে দর্শন করে আসি। মন্দিরের পার্শ্বে যে বিল্বমূলে শিবচন্দ্রের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়েছিল, সেইখানে বসে তাঁর কথা স্মরণ করে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করি।

এইবার শেষ কথা।—শিবচন্দ্রের দেহাবসানের কথা বলেই আমার এই স্মৃতি-তর্পণ শেষ করি। মাতা সর্বমঙ্গলার মন্দিরের পাশেই ছোট একখানি বাগান ছিল, এখনও আছে। সেই বাগানের বেড়া বাঁধবার জন্য একদিন মজুররা কতকগুলি বাঁশ কেটে ফেলে রেখেছিল। শিবচন্দ্র সেইখান দিয়ে যেতে তাঁর পায়ে একটা বাঁশের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বিঁধে যায়। পরদিনই পা ফুলে ওঠে ও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বলেন ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়েছে। তাঁরা তিন চার দিন ঔষধ ও প্রলেপের দ্বারা ঐ বিষের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ডাক্তারেরা তখন তাঁহার পায়ের কিয়দংশ কেটে বাদ দেবার প্রস্তাব করেন—শিবচন্দ্র তাতে সম্মত হন নি, তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনবার প্রস্তাবও তিনি অস্বীকার করেন; বলেন—মায়ের মন্দির ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। মন্দির পার্শ্বের সেই বিল্বমূলে যেন তাঁর দেহাবসান হয়।

আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। এই সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হই। দশদিন পর্যন্ত গ্রামের নরনারী সকলে মিলে শিবচন্দ্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিটে মন্দির পার্শ্বস্থ বিল্বমূলের

আসনে শিবচন্দ্রের দেহাবসান হইল। তাঁর আজীবন সঙ্গী আমি তাঁর শেষ নিশ্বাস বের হতে দেখলাম।

রাত্রি কেটে গেল। প্রত্যুষে গ্রামের সকলে শিবচন্দ্রের নশ্বর দেহ গৌরী নদীর তীরে চিরদিনের জন্য চিতাভস্মে পরিণত করে ফিরে এলাম। আজ ২৩ বৎসর পরে আমার চির-সুহৃদ সিদ্ধ সাধক আবাল্য-বন্ধু শিবচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ করলাম। শিবচন্দ্রের প্রতিকৃতি এই মাসেব প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইল।*

॥ ৭ ॥

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করবার প্রয়াসী হয়েছি, তিনি কোন ধনী বা জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই—নদীয়া জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি ছিলেন। তিনি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াও স্পর্শ করেন নাই—বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েও তিনি প্রবেশ লাভ করেন নাই। আর সেকালে এখনকার মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ও ছিল না। যে গ্রামে দুচার ঘর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের বাস ছিল, সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বস্‌ত, গ্রামের ও নিকটবর্তী স্থানের ছেলেরা সেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে গুরুমশাইয়ের কাছে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষালাভ করতেন, সে শিক্ষার সঙ্গে ছাপা-বই পড়ার বড় একটা সংশ্রব ছিল না। ছাত্রেরা বর্ণ ও বানান শিক্ষা করত। শুভঙ্করী, বাজার হিসাব, জমিদারী ও মহাজনী সেরেস্তার কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও জমা-ওয়াশীল-বাকী পাঠশালায় শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আর গুরুমশাই ও ছাত্রদের অভিভাবকগণের প্রধান দৃষ্টি ছিল হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার দিকে। এই বিদ্যা শিক্ষা করেই সেকালের লোকে জীবিকার্জন করতেন এবং এই বিদ্যার জোরেই সে সময় অনেকে তালুক মুলুক, বিষয়-বিভব করে গিয়েছেন। আমি যাঁর স্মৃতি-তর্পণের প্রয়াসী হয়েছি, তিনি এই রকম একটা পাঠশালায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

যাঁরা বিগত ৭০/৮০ বৎসরের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, অন্তত যাঁরা দুচারখানি বাঙ্গালা ছাপা বইও নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই সেই সকল বইয়ের অনেক গুলিরই প্রচ্ছদপটে দুইটি নাম ছাপা দেখেছেন—একটি শ্রীগুরু-দাস চট্টোপাধ্যায়, আর একটি বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। আজ আমি

* ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২।—সম্পাদক

আমার সেই শুভানুধ্যায়ী পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করব।

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলাম, পাড়াগাঁয়েই আমার শিক্ষা দীক্ষা। তা হ'লেও সে সময় কল্‌কাতার দু-চারটে খবর আমরা পেতাম। আমার বেশ মনে পড়ে, সে সময় আমরা কলিকাতার তিনটে বড় পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকের নাম শুন্‌তে পেতাম—এক যোগেশবাবুর ক্যানিং লাইব্রেরী, আর গুরুদাসবাবুর বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, তৃতীয় চিনেবাজারের পদ্মচন্দ্র নাথের বইয়ের দোকান। এই তিনটি ছাড়া বটতলায় অনেক পুঁথির দোকান ছিল; তাদের নাম বড়-একটা জানতাম না।

স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে যখন কলিকাতার কলেজে পড়তে এলাম, তখন দুই-চার বার গুরুদাসবাবুর দোকানে বই কিন্‌তে গিয়েছি। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আমাদের আদব-কায়দা শিক্ষা অন্য রকম ছিল। আমি দোকানে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র উপবীতধারী, সৌম্যমূর্তি মানুষটি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিই দোকানের কর্তা গুরুদাসবাবু। তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে বইয়ের কথা বল্‌তাম। তিনি অদূরে উপবিষ্ট কর্মচারীকে বলতেন "অনন্ত, দেখ ত ছেলেটি কি বই চান।" এই অনন্তবাবুই তাঁর প্রধান কর্মচারী ছিলেন এবং আজীবন গুরুদাসবাবুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনন্তবাবু আমাকে বই দিতেন, তাঁরই হাতে মূল্য দিতাম এবং আস্‌বার সময় পুনরায় গুরুদাসবাবুকে প্রণাম করে চ'লে আসতাম। এই আমার প্রথম গুরুদাসবাবুর দর্শন লাভ—পরিচয় লাভ নয়। প্রতিদিন আমার মত কত ছেলে তাঁর দোকানে বই কিন্‌তে আস্‌ত; তাদের সকলকে চিনে রাখা কি সম্ভব? গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় এ সময়ের অনেক পরে হয়েছিল। সে কথা পরে বল্‌ছি।

আমি পূজনীয় গুরুদাসবাবুর পবিত্র জীবন-কথা লিখতে বসি নাই, সে স্পর্ধাও আমার নাই—আমি স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি। তা হোলেও, আমার স্মৃতি-চর্চা করবার পূর্বে গুরুদাসবাবুর মহীমুভবতা, তাঁর ঔদার্য, তাঁর কর্ম নিষ্ঠা, সর্বোপরি তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বল্‌তে চাই এবং সে কথাও অন্যের বিবৃত কথা—আমার কথা নয়।

কিছুদিন পূর্বে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পড়েছিলাম, সেই পুস্তকের কোন কোন প্রস্তাব 'ভারতবর্ষে'ও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকখানির নাম

'দাদার কথা'। লেখক সুরেশচন্দ্র ঘোষ। এ 'দাদা' আর কেহই নহেন, ভারত-বিখ্যাত অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীবী দানবীর পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়; সুরেশবাবু তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সার রাসবিহারী পঠদ্দশায় কলিকাতায় হিন্দু হোটেলে থাকতেন। সেই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে একদিন তিনি সুরেশবাবুকে যাহা বলেছিলেন, সেই কথা কয়টিই নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"হোষ্টেলের আর একটি লোকের কথা বলি শোন—এখন তাঁর অনেক পয়সা হয়েছে, কলকাতায় বাড়ীঘর করেছেন, তাঁর বইএর দোকান আছে, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বোধহয় নাম শুনেছ? এমন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ লোক বাঙ্গালীর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিশেষত তাঁর তখনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামান্যই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তাঁর টানাটানি ছিল বুঝতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার-সরকারের কাজে তিনি অনেক পয়সা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট সবাতে পারতেন! কিন্তু তাঁর পরম শত্রুও কখন বলতে পারে নাই—'গুরুদাসবাবু একটা পয়সা চুরি করেছেন!' আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাজার সরকারের এ সুখ্যাতি পৃথিবীতে কেউ করতে সাহস পাবে না!"

"তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের জন্য দু'টা আলমারিতে সামান্য ডাক্তারি বইও রাখ্‌তেন। ছেলেরা বই কিন্‌বার সময় বই-এর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন—'এটা এত টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পড়েছে।' ছেলেরা কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—'যা হোক্ দাও।' 'যা হোক্ দাও।' আমি একদিন তাঁকে বল্‌লাম—'গুরুদাসবাবু, বেশ ব্যবসা করছেন? বইটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক্ দাও, যা হোক্ দাও! তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, সিকাটা দিতে চাবে? দুচার পয়সা দিয়ে সেরে দেবে।' তাতে তিনি হেসে বল্‌তেন—'তাই ঢের, তাই ঢের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব?' অথচ দেখ, তাঁর তখন কত টানাটানি ছিল! একটা কথা আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'; কিন্তু গুরুদাসবাবুর সম্বন্ধে এটা কখনও খাটে নাই। অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করতে পারে নাই।"

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহুবাজার কি ঐ দিকে কোথা একটা বইএর দোকান করবেন স্থির করেন। হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বল্‌লেন—'আপনার মূলধন বেশী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না,

ঠক্‌বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন! হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দেখ্‌চ তো? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা ব্যবসা কর্‌তে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

"বি-এ পাশ করবার পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদা বলিয়াছিলেন—"খ্রীষ্টান হবার দিন গোপনে হোষ্টেল হইতে বেরিয়ে গেলাম। গীর্জার কাছাকাছি গেছি, তখন এমন একটা বিঘ্ন ঘট্‌লো যে, আমার আর খ্রীষ্টান হওয়া হ'ল না।"

"বিঘ্নটি এই—আমি গীর্জায় ঢুকছি, এমন সময় বাবা গিয়ে আমার হাত চেপে ধর্‌লেন। সে সময়ে সহসা সেখানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে ফেল্‌তে দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, কেমন করে বাবা আমার খ্রীষ্টান হবার কথা জান্‌তে পেরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।"

"বাবাকে বল্‌লাম—'থাক্, আপনি যখন এসে পড়েছেন, তখন আর খ্রীষ্টান হ'ব না।' তারপর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম।"

"এই গুরুদাসবাবুই—আমি খ্রীষ্টান হব সন্দেহ ক'রে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তখন খ্রীষ্টান হবার জন্য হোষ্টেল্ থেকে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গীর্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। গুরুদাসবাবু সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমার খ্রীষ্টান হওয়ায় বাধা দিয়েছেন, এ আমি জান্‌তে পেরেছি শুনে গুরুদাসবাবু ভয় পেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।"

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাসবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বল্‌লাম—'বেশ করেছেন!' এই বলেই সেখান থেকে চলে গেলাম।"

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর জীবন-চরিত সার রাসবিহারীর এই কয়টি কথাতেই

সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছে। সত্য-সত্যই গুরুদাসবাবু মহার্ঘ সম্পদের, অতুলনীয় অগাধ মূলধনের অধিকারী ছিলেন; সে মূলধন, সার রাসবিহারীর কথায় তাঁহার Honesty। এই মূলধনই সংসার-সংগ্রামে তাঁকে জয়যুক্ত করেছিল, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছিলেন, অতুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন; এই Honesty মূলধনই তাঁকে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় করেছিল, পুস্তক-ব্যবসায়ীসমাজে তাঁকে বরেণ্য করেছিল। তাঁকে পুস্তক-ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের সভাপতি পদে বরণ করে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি সত্য-সত্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে কত দুস্থ সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোতো! কিন্তু সে কথা বল্‌তে আমি বসি নাই, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই মহৎ কর্তব্যভার গ্রহণ করবেন, আমি স্মৃতি-তর্পণই করব।

এইস্থানে আর একটি কথা বলবার প্রলোভন আমি কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিনে। সে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বের কথা। গুরুদাসবাবু প্রথম বইয়ের দোকান করেন ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীটের একটি ছোট ঘরে এবং সেই ঘরের পাশ দিয়ে যে ছোট একটা গলি ছিল, সেই গলিতে ছোট একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। সে বাড়ী ও সে গলি এখন মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দোকানের প্রসার যখন বৃদ্ধি হোল এবং কিছু অর্থও সঞ্চিত হোল, তখন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের তেতালা বাড়ী কিনে সেখানেই নিচের তলায় দোকান করেন এবং দোতালা তেতালায় পরিবারসহ বাস করেন। কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীর সম্পূর্ণ অংশেও দোকান বিস্তৃত করেন।

তিনি যখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২০১ নম্বরের বাড়ীতে বাস করতে আসেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পরলোকগত মনোমোহন বসু মহাশয় ২০২ নম্বর বাড়ীতে বাস করতেন। গুরুদাস বাবুকে নিকট প্রতিবেশী পেয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি যে গানটি রচনা করেন, 'মনোমোহন গীতাবলী' হতে সেই গানটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

"চাঁদের হাট পেতেছেন্ পাড়ায় গুরুদাস্।
সোনার ছেলে-মেয়ে আপনি গিন্নী, তেম্নি শ্বশুর
তেমনি শ্যাস্।
কিবা শান্ত ছেলে হরি, মরি মরি কি মাধুরী,
ও তায় দেখলে সাধ যায় কোলে করি,
কথা শুনলে হয় উল্লাস (১)

নন্দিনী তাঁর নন্দরাণী, ফুল্ল কমল বদনখানি,
যেন আনন্দময়ী ঠাকুরাণী এসেছেন ছেড়ে কৈলাস (২)
সুবালা মেয়েটি হায়, যেন কলের পুতুল নেচে বেড়ায়,
ও তার ফুট্‌ফুটে রং পুট্‌পুটে ঢং, বিধুমুখে মধুর হাস (৩)

গুরুদাসবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এইবার গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। আমি তখন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজস্কুলে মাষ্টারী করি। সে সময় 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রে আমার কতকগুলি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তখন 'সাহিত্য'-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার ব্যবস্থা হয়। সোদরপ্রতিম সুরেশচন্দ্র তখন বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে একটা বাড়ীতে বাস করতেন। সেই বাড়ীর নিম্নতলে তাঁর একটি ছাপাখানাও ছিল। সেই ছাপাখানাতেই 'প্রবাস-চিত্র' প্রথম ছাপার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় সুরেশচন্দ্র আমাকে লিখ্‌লেন যে, 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্য আমার একবার কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। তাঁর পত্র পেয়েই আমি কলিকাতায় এলাম এবং তাঁরই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। তিনি বল্‌লেন যে, গুরুদাসবাবুকে 'প্রবাস-চিত্রে'র প্রকাশক করা তাঁরা স্থির করেছেন এবং সেই দিনই অপরাহ্ণকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত স্থির করতে হবে, সে সময় আমার উপস্থিত থাকা দরকার; অন্য কারণে না হোক, গুরুদাসবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সেই দিনই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। সেই সময় পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আমরা তিনজনে যখন গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ের সম্মুখে গেলাম, তখন দেখ্‌লাম তিনি ফুটপাথের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপর বসে আছেন এবং তাঁর পাশে বসে আছেন 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গুরুদাসবাবুকে ঐ স্থানে ঐ ভাবে বসে থাক্‌তে অনেকদিন দেখেছি কিন্তু কোনদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুঃসাহস আমার হয় নাই।

আমরা গুরুদাসবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হ'লে গুরুদাসবাবু সহাস্যমুখে বল্‌লেন "কি হে সুরেশচন্দ্র, হেমেন্দ্র বাবাজী, কি মনে করে?"

সুরেশচন্দ্র বল্লেন "আমাদের জলধরদাদার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।"

আমি তখন অগ্রসর হয়ে গুরুদাসবাবুকে যথারীতি প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠ্লেন "আহা, থাক থাক।" সুরেশকে বল্লেন "ওঁর লেখার ত খুব প্রশংসা শুনতে পাই। বেশ, বেশ।"

সুরেশচন্দ্র তখন বল্লেন যে, তিনি আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে ছাপতে আরম্ভ করেছেন। ছাপার খরচা তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু দেবেন। গুরুদাসবাবুকে ঐ বইয়ের প্রকাশক হ'তে হবে।

গুরুদাসবাবু বল্লেন, "বেশ, তাতে আর আমার আপত্তি কি। আমিই সব খরচ দিতাম। তা তোমরা যখন সে ব্যবস্থা করেছ, ভালই করেছ। এরপর জলধরবাবুর যে বই ছাপা হবে, আমি তার সব ভার নেব।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বল্লেন 'এই বইখানি কেমন চলে, তাই দেখে পরে এঁর হিমালয়-ভ্রমণও ছাপবার ইচ্ছা আছে।'

গুরুদাসবাবু বল্লেন "আমিই সে ভার নেব।" তখন সুরেশবাবু আমার অন্য পরিচয় দিলেন। গুরুদাসবাবু বল্লেন "যখনই কলিকাতায় আসবেন, আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে তাঁকে প্রণাম করে সুরেশ ও হেমেন্দ্রের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলাম। গুরুদাসবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ইহার তিন-চার মাস পরে মহিষাদলের মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসি। যেদিন কলিকাতায় আসি সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্বে গুরুদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁকে যখন বল্লাম, আমি মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে এলাম, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লেন "ছেড়ে ত এলেন। তারপর কি করবেন?"

আমি বল্লাম "আপনার আশীর্বাদে কিছু করবার পথও হয়েছে। পাঁচকড়িবাবু ও সুরেশবাবু 'বঙ্গবাসীর' অধিনায়ক যোগেন্দ্রবাবুকে বলে আমার জন্য 'বঙ্গবাসী' আফিসে একটা চাকুরী স্থির করেছেন। আজ সন্ধ্যার পর যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলে কথা পাকা হবে।"

গুরুদাসবাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, বল্লেন, "তবুও ভাল। আমি ভাবলাম এ কি করলেন, কাচ্চাবাচ্ছা-পোষা মানুষ—কিসে চল্বে। তা কি জানেন, খবরের কাগজে কাজ ত কখন করেন নি। যোগেন্দ্রবাবু প্রথম

শিক্ষানবীশকে কি আর বেশী মাইনে দেবেন, তাই ভাবছি। যাক্, তবুও ত একটা কিছু হোল। যোগেন্দ্রবাবু কি বলেন, সে কথা কা'ল আমাকে বলে যাবেন, বুঝলেন।"

বুঝলাম অনেক কথা। আমার মত একদিনের পরিচিত লোকের উপর যে মানুষের এত স্নেহ আগ্রহ হয়, এ ত জানতাম না, সে দিন তা বুঝলাম। আর বুঝলাম কোন্ গুণে গুরুদাসবাবু এমন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, মা লক্ষ্মী তাঁর উপর কেন এমন সদয় হয়েছেন।

পরদিন বঙ্গবাসী আফিসে যাবার সময় গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে বল্লাম "আজই কাজে যাচ্ছি। যোগেন্দ্রবাবু আপাতত মাসে ত্রিশটাকা দেবেন, কাজকর্ম শিখলে বাড়িয়ে দেবেন।"

গুরুদাসবাবু বল্লেন "আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা হোক ত্রিশ টাকা, কোন ভাবনা করবেন না, যখন যা অভাব হয় আমাকে জানাতে লজ্জা করবেন না।" কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেই সংবাদপত্রসেবার প্রথম যাত্রাকালে যা দেখেছিলাম, আজ বহুকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সেও তা আমার মনে আছে, আর তারই জন্য এই সুদীর্ঘ কাল পরে সেই দয়ার সাগর মহাত্মার স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি।

এর পরের তের চৌদ্দ বৎসরের ঘটনা আমার জীবনের এক সুদীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাস। কত বিপদআপদ, কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত শোকতাপ যে এই চৌদ্দ বৎসর আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তা আমি জানি, আর জান্তেন গুরুদাসবাবু। আমি এই কয় বৎসর প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশ নিয়েছি, তিনি যা আদেশ করেছেন তাই করেছি, তাঁরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি। অবশেষে আজ পূর্ণ তেইশ বৎসর হোল, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও তাঁরই আদেশে 'ভারতবর্ষে'র ভার গ্রহণ করে নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় লাভ করেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই ১৩২৫ সালের এই বৈশাখ মাসের ১২ই তারিখে আমার সেই আশ্রয়দাতা, আমার অভিভাবক গুরুদাসবাবু উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে আমার অভিভাবকত্ব-ভার নিশ্চিন্ত মনে অর্পণ করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন—আমি এখনও সে ভার বহন করছি—আর কতদিন করব তা তিনিই জানেন।

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর স্মৃতি-তর্পণ এখানেই শেষ করতে পারছিনে; আমার

প্রতি তাঁর যে কত স্নেহ, কত ভালবাসা ছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারটি ঘটনার উল্লেখ না করলে এ স্মৃতি-তর্পণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পরলোকগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে গুরুদাসবাবুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়েছিল, তিনি আর দোকানে আসতে পারতেন না; তাঁর দুই পুত্রই সমস্ত কাজকর্ম করতেন। তিনি সে সময় পুত্রদের এই উপদেশই দিতেন, কারও একটি পয়সা, পাওনা হ'লেই চাইবামাত্র দিতে হবে। কোন পাওনাদার কখনও এ কথা বল্‌তে পারেন নি এবং এখনও পারেন না যে, গুরুদাসবাবুর দোকানে প্রাপ্য টাকা আন্‌তে গিয়ে কেউ কখন ফিরে এসেছেন। ইহাই গুরুদাসবাবুর মূল মন্ত্র ছিল এবং ইহারই জন্য গুরুদাস লাইব্রেরীর এমন প্রতিষ্ঠা। আমি প্রায়ই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে যেতাম। সে সময় শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু কি সুধাংশুবাবু যদি উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে আমার সম্মুখেই তাঁদের বলতেন "দেখ, জলধরবাবু যখন যা চাইবেন তাই দিও, হিসাব দেখো না। নিতান্ত দরকার না হলে উনি কখন কিছু চান না।"

অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি। তখন গুরুদাসবাবুর পুত্রেরা দোকানের ভার গ্রহণ করেন নাই। পূজার কিছুদিন পূর্বে আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে দোকানে গিয়েছি। গুরুদাসবাবু আমাকে দেখে বল্‌লেন "কৈ জলধরবাবু, পূজার হিসাবের টাকা নিলেন না।"

আমি বল্‌লাম "ভারি তিন টাকা তের আনা পাব, তা আবার এত আগে নিতে আসব। ছুটির আগের দিন এসে নিয়ে যাব।"

গুরুদাসবাবু হেসে বল্‌লেন "বেশ তাই আস্‌বেন।"

গুরুদাসবাবু আগে থাক্‌তেই অনন্তবাবুকে শিখিয়ে রেখেছিলেন। ছুটির দুই-এক দিন পূর্বে আমি যখন দোকানে গেলাম, তিনি অনন্তবাবুকে ডেকে বল্‌লেন "অনন্ত, জলধরবাবুর হিসাবের পাওনা তিন টাকা তের আনা দাও।" অনন্তবাবু আমাকে তিন টাকা তের আনা দিলে গুরুদাসবাবু বল্‌লেন "হিসাবে আরও কিছু পাওনা হয়েছে, নিয়ে যান।"

আমি বল্‌লাম—"পাওনাটা দেনায় দাঁড়াতে দশদিনও লাগে না। আমার এখন দরকার নেই।" গুরুদাসবাবু হাসতে লাগলেন।

একটু পরেই আমি যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লাম, তখন গুরুদাসবাবু বল্‌লেন—"একটু দাঁড়ান জলধরবাবু।" এই ব'লে অনন্তবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন। অনন্তবাবু সবুজ কাগজে মোড়া কি একটা গুরুদাসবাবুর হাতে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে সেই মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন

"আপনি ত কিছুই করবেন না, টাকা পেলেই একে ওকে দিয়ে বসবেন। তাই বৌমার জন্য এই হারটা গড়িয়ে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দেবেন।"

আমি ত অবাক্! মোড়ক খুলে দেখি একটা সোনার হার। আমি বল্‌লাম "এ কি করেছেন?"

গুরুদাসবাবু হেসে বল্‌লেন "আপনার পাওনা তিন টাকা তের আনা ত বুঝে পেয়েছেন, এখন বাড়ী যান। ওটা আপনার বই বিক্রীর টাকা থেকেই আমি গড়িয়েছি।" এই আমার পূজনীয় অভিভাবক গুরুদাসবাবু!

আর একবার রাণাঘাটের ষ্টেসনের কাছে একটা বাগানওয়ালা পাকাবাড়ী খুব সস্তায় বিক্রী হচ্চে সংবাদ পেয়ে গুরুদাসবাবুর কাছে গিয়ে সেইটে কিনবার কথা বল্‌তে তিনি চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"সে কিছুতেই হবে না। রাণাঘাটে বাড়ী কিনবেন? বিনা পয়সায় দিলেও আমি আপনাকে সেখানে যেতে দেব না; সেখানে যে ম্যালেরিয়া। তার থেকে এক কাজ করুন। দেশে গিয়ে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটু জমি কিনে ছোটখাটো একটা বাড়ী করুন। যে টাকা লাগে আমি দেব। বই বিক্রীর টাকা থেকে শোধ না হ'লেও আমি বাকী টাকা চাইব না।" এই থেকেই আমি আমার গ্রামের বাইরে নদীর তীরে ছোট একটা বাড়ী করবার প্রেরণা পাই এবং গুরুদাসবাবুর জীবদ্দশাতেই সেই বাড়ীর অনেকটা তৈরী হ'য়েছিল। এ সংবাদ শুনে তাঁর যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা কেমন করে বর্ণনা করব।

এমন কত ঘটনার কথা এই বৃদ্ধের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে সব কথা আর বলা হোল না। আজ এতকাল পরে সেই দয়ালু, মহানুভব, পর-দুঃখকাতর ব্রাহ্মণ-প্রবরের সামান্য স্মৃতি-তর্পণ করে কৃতার্থ হলাম, ধন্য হলাম, পবিত্র হলাম।

॥ ৮ ॥

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, তাঁর অনুগ্রহেই আমি কলিকাতায় বাংলা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ করি। 'কলিকাতা' কথাটা না বললে আমার সংবাদপত্র-সেবার কথায় একটু ভুল থেকে যায়। আমি সংবাদপত্র-সেবায় প্রথম শিক্ষানবিশী করি—কাঙাল হরিনাথের "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকায়।"

কাঙাল হরিনাথ—আমরা যখন ছেলেমানুষ, তখন থেকেই "গ্রামবার্ত্তা-

প্রকাশিকা" সম্পাদন করতেন। প্রথমে কিছুদিন কলিকাতার আপার সার-কুলার রোডে গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' ছাপা হোতো। তার পর আমাদের গ্রাম কুমারখালিতে তিনি একটি প্রেস্ স্থাপন করেন। সে প্রেস্ এখনও আছে। সেই চিল-মার্কা একটা মেশিন এখনও কাঙালের কাঙাল সন্তানগণের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করছে।

সে কাহিনী এখন থাক। কাঙাল যখন গ্রামে ছাপাখানা করলেন, তখন আমরা বাংলা স্কুলে পড়ি। আমার তখন থেকেই কি একটা ঝোঁক হয়েছিল —বলতে গেলে স্কুলের কয় ঘণ্টা সময় ছাড়া, অবশিষ্ট সময় কাঙালের ছাপাখানাতেই বসে থাকতাম। সেই মুদ্রাযন্ত্র, সেই 'গ্রামবার্ত্তা', আর সেই মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ, চুম্বকের মত আমাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

তার পর, একটু বড় হয়েই সেই আকর্ষণ এমন প্রবল হয়েছিল যে, আমার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন আমি চুপে চুপে ঘরে বসে একখানি ছোট খাটো উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলাম। সে পাণ্ডুলিপি কিন্তু আর কাউকে দেখাই নি। বলতে গেলে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কুড়ি পঁচিশ বছর পরে আমি যখন 'বসুমতী'র সম্পাদক, সেই সময় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা পরলোকগত শ্রীমান্ শশধর আমাদের বাড়ীর পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই অমূল্য রত্ন বের করেন এবং আগাগোড়া পড়ে বলেন—"দাদা, এর একবর্ণও সংশোধন করতে পারবেন না—যেমন আছে তেমনি ছাপা হবে।" ছাপা হয়েছিল, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের বিশেষ তাড়নায়; কিন্তু শশধর সে ছাপা-বই দেখে যেতে পারেন নি, অকালে কাল বসন্ত রোগে তিনি দেহত্যাগ করেন। বইখানির ছাপা আজ হবে কাল হবে করে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

এ কয়টি কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, এখনকার ছেলেরাই এঁচোড়ে পাকে না—সেকালেও এঁচোড়ে পাকা ছেলে জন্মাতো—এই আমিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং সেই সময় থেকেই আমি 'গ্রামবার্ত্তা'য় হাত মক্স করতাম। তার পর কাঙাল হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা'র জন্য ঋণ-জালে জড়িত হয়ে পত্রিকা ছাপা বন্ধ করতে চান; সে সময় আমরা কয়েকজন 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশের ভার গ্রহণ করি এবং আমিই তখন 'গ্রামবার্ত্তা'র সম্পাদক হই। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারী করতাম।

পূর্ণ এক বৎসর 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদন করে কাঙালের ঋণ-ভার আরও কিছু বাড়িয়ে দিয়ে আমরাই 'গ্রামবার্ত্তা'র অস্তিত্ব লোপ করি—এডিটার হরিনাথ ষোল আনা 'কাঙাল হরিনাথ' হয়ে বসলেন। তা হলেই বলতে হবে যে, সংবাদপত্রের

হাতে খড়ি আমার শৈশবাবস্থাতেই হয়েছিল। তবে সে হ'ল গ্রামের কাগজ; গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দশার কথাই 'গ্রামবার্ত্তা'র বক্তব্যের বিষয় ছিল। উচ্চ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। আমরাও সেই ভাবে গঠিত হয়েছিলাম। 'গ্রামবার্ত্তা'র সে শিক্ষানবিশী ভবিষ্যতে সংবাদপত্রসেবায় আমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করে নি। এ একেবারে নূতন ক্ষেত্র। তাই বলছিলাম—কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রবেশকে আমি নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ বলেই মনে করেছিলাম।

২

আমি তখন মহিষাদলে মাষ্টারী করি। হিমালয়-ফেরত মুসাফির তখন আবার নূতন করে ঘর বেঁধেছে। মহিষাদলে কয়েক বৎসর আমার বেশ কেটেছিল। তার পর নানা কারণে সেখানে মাষ্টারী করা এবং নাবালক রাজকুমারদের অভিভাবকত্ব করা আমার পুষিয়ে উঠ্‌ল না। তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সে স্থান ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচি। আমার মনের এই অবস্থার কথা আমি 'সাহিত্য'-সম্পাদক পরলোকগত শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে জানাই। তিনি তখন শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে ধরেন। পাঁচকড়িবাবু তখন 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক। খুব নাম-ডাক, খ্যাতনামা লিখিয়ে। 'বঙ্গবাসী' আফিসে এবং 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপর তাঁর একাধিপত্য ছিল। 'বঙ্গবাসীর'ও তখন খুব প্রভাব। পাঁচকড়ি-বাবুর প্রতিপত্তির আরও একটা কারণ ছিল। স্বর্গীয় রসিকপ্রবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচকড়িবাবুকে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক করে দেন এবং যোগেন্দ্রবাবু কাগজের স্বত্বাধিকারী হলেও 'ইন্দির' দাদাই সর্বেসর্বা ছিলেন। তিনি বর্ধমান থেকেই—'বঙ্গবাসী'র পরিচালনা করতেন।

সুরেশ ও হেমেন্দ্রের কাছে আমার কথা শুনে পাঁচকড়িবাবু সেই দিনই যোগেনবাবুকে বলেন। যোগেনবাবুও তখন আমার লেখার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে মাষ্টারী ছেড়ে কলিকাতায় আসবার কথা বললেন। সুরেশের চিঠি পেয়ে আমি মহিষাদলের মাষ্টারী ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে সুরেশের স্কন্ধে ভর করলাম। সেই দিনই সুরেশ, পাঁচ-

কড়িবাবু ও হেমেন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে যোগেন্দ্রবাবুকে অভিবাদন করলাম। তিনি আমাকে মাসিক ৩০্ বেতনে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত করলেন। যোগেন্দ্রবাবুই আমাকে কলিকাতার সংবাদপত্রক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশাধিকার দেন। আজ আমি তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব।

৩

আমাদের দেশে একটা প্রথা ছিল—কোন কার্যে প্রথম যোগদান করতে হলে শুভদিন দেখে যেতে হোতো। এখন আর সে সব দিন-ক্ষণ বাছলে চলে না—কে বা জানে অশ্লেষা, কে বা জানে মঘা। আমিও শুভদিনের জন্য অপেক্ষা না করে পরের দিন বেলা ১২ টার সময় 'বঙ্গবাসী' আপিসে গেলাম। সাল তারিখ বার কিছুই মনে নেই, মনে রাখবারও প্রয়োজন তখন অনুভব করি নি। এমন করে এই বৃদ্ধ বয়সে যে স্মৃতি-তর্পণ করতে হবে এ কথা যদি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা বলে দিতেন, তা হলে না হয় একখানি ডায়েরী রাখতাম। যাক্ সে কথা।

'বঙ্গবাসী' অফিস তখন কলুটোলা স্ট্রীটে। সে আফিসের অনতিদূরেই 'হিতবাদী' আফিস। আমি যখন সম্পাদকগণের আফিস-ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বয়সে আমার ছোট ছিলেন। ভগবানের কৃপায় 'বঙ্গবাসী' থেকে অবসর-বৃত্তি লাভ করে এখন স্ব-গ্রামে বসে 'সাধন ভজন নিয়ে আছেন। আমি অফিস-গৃহে প্রবেশ করতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন—বললেন—"আসুন জলধরবাবু, কাল সন্ধ্যার পর যোগেনবাবুর বাড়ীতে আপনাকে দেখেছি। তখন আর পরিচয় করবার অবকাশ হয় নি। মনে করলাম—কাল তো আসছেনই, তখনই পরিচয় করব।" আমি তাঁকে নমস্কার করে তাঁরই বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করলাম।

প্রকাণ্ড ২।৩ খানি টেবিল জোড়া দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর আপিস বা আসর। তারি চারিপাশে খান ১০।১৫ চেয়ার। তখন আর কেউ ছিলেন না, তাই বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গে হরিমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাকে কি কাজের ভার দেবেন?" তিনি হেসে বল্লেন—"আমাদের এখানে কারো উপর কোন ভার নেই। বড় বড় কর্তারা যাকে যা করতে বলেন তাকে সেই

হুকুমই তামিল করতে হয়। তবে ওরই মধ্যে আমার উপর একটা নির্দিষ্ট কাযের ভার আছে। আমাকে প্রতি শনিবারে বর্ধমানে ইন্দ্রবাবুর কাছে যেতে হয়। তিনি সেখানকার বড় উকীল, অবসর অত্যন্ত কম। আমাকে বর্ধমানে গিয়ে তাঁর বাসায় ধরণা দিতে হয়। শনিবার, রবিবার, সোমবার, এমন কি মঙ্গলবারেও যখন তাঁর অবসর হয় এবং শরীর মন ভাল থাকে তখন তিনি বলতে থাকেন, আর আমি লিখি। তার পরই আমি কলকাতায় চলে আসি। প্রতি সপ্তাহেই এই আমার নির্দিষ্ট কায। কাযেই আপনার সঙ্গে হপ্তায় ২।৩ দিনের বেশী আমার দেখা হবে না। তা হোক্, আপনাকে সকলেই জানেন। সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু আপনাকে নিয়ে এসেছেন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আর, আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে এত লোক যে কাউকে হপ্তায় ২।৪ দিন কিছুই করতে হয় না।"

হরিমোহনবাবুর কাছে মোটামুটি এই সংবাদ পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। ভয় ছিল কি জানি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য হয়তো সেইদিনই এমন একটা কিছু লিখতে দেবেন যা আমার বিদ্যাবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাহিরে। সে আশঙ্কা আমার দূর হল।

ক্রমেই যখন বেলা অবসন্ন হতে লাগলো তখন একে একে সম্পাদকীয় বিভাগের ধুরন্ধরগণের আগমন হতে লাগলো। সে কি একজন দুজন? একেবারে ডজন খানেক বললেই হয়। সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু এলেন। আমাকে দেখেই বল্লেন—জলধর এসেছ? বেশ বেশ। দেখ হে হরিমোহন, ওকে কাযকর্ম দেখিয়ে দিও। তার পরই একে একে এলেন—বিহারীলাল সরকার মহাশয় (পরে রায় সাহেব), প্রবীণ সাহিত্য-রথী ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত দাদা মহাশয়, হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় (পরে রায় সাহেব), দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, আরও কে কে মনে নেই। এঁদের মধ্যে কে কে যে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মচারী এবং কে কে বেড়াতে এসেছেন—তা প্রথম দিনে আমি ঠিক করতে পারলাম না। এঁদের মধ্যে আমার পূর্ব-পরিচিত ছিলেন—হারাণ বাবু। তিনি আমার কাছে এসে মুরুব্বির মত আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন—যাক্, বেশ ভাল হয়েছে—আপনাকে পেয়ে আমরা খুব খুসী হয়েছি। হরিমোহনবাবুর কাছেই শুনলাম এই কয়জন ছাড়া আরও কয়েকজন নিয়মিত লেখক আছেন। তাঁরা আপিসে বড়-একটা আসেন না। যোগেনবাবুর বাড়ীতেই সন্ধ্যার পর কেউ বা নিজে এসে, কেউ বা লোক মারফত—'বঙ্গবাসী'র

কপি পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হর-প্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তা' হলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বঙ্গবাসীর তখন এত অধিক লেখক ও সম্পাদকীয় বিভাগে এত অধিক কর্মচারী যে আমার মত দুই একজনকে যোগেন্দ্রবাবু নিতান্তই দয়া করে নিয়েছেন। কায করবার লোক অনেক আছেন।

৪

প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে যোগেন্দ্রবাবু আপিসে আসতেন। তিনি প্রথমেই ম্যানেজারবাবুদের ঘরে গিয়ে বসতেন এবং সেখানকার কাযকর্ম হিসাবপত্র দেখতেন। তাঁর আগমন-সংবাদ পেলেই সম্পাদকীয় বিভাগের মহারথিগণ কেহ বা কার্যোপলক্ষে—কেহ বা অভিবাদন করবার উদ্দেশ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরে যেতেন। দুই তিন জন আপিসেই বসে থাকতেন, কারণ তাঁরা জানতেন যোগেন্দ্রবাবু একবার সম্পাদকীয় বিভাগে আসবেনই। আমি যে দিন প্রথম গিয়েছিলাম সেদিনও তিনি ম্যানেজারবাবুর ঘরে অনেকক্ষণ বসে থেকে সম্পাদকীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হলেন। আমি দাঁড়িয়ে যথারীতি অভিবাদন করতেই তিনি বললেন—আপনি আজই এসেছেন, আমি মনে করেছিলাম দুই চার দিন বিলম্ব হবে—তা বেশ করেছেন। আপনার এখন ডিউটি হচ্ছে কি জানেন?—কিছুদিন পর্যন্ত 'বঙ্গবাসী'র পুরোনো ফাইল আপনাকে পড়তে হবে, তা হলে আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের policy, আমাদের লিখবার ঢং প্রভৃতি আয়ত্ত করতে পারবেন। জানেন তো 'বঙ্গবাসী' সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রচারক। সেই প্রচারই আমাদের মূলমন্ত্র! আপনি এখন তা হলে ঐ ফাইলই পড়তে থাকুন—তার পর কায করতে আরম্ভ করবেন, তখন আর বাধবে না। আমার মনে হোলো, বলে ফেলি যে 'বঙ্গবাসী'র উদ্দেশ্যও জানি, policy-ও জানি। লেখার ঢংও আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রথম দিনেই মনিবের মুখের উপর এমন করে কথা বলা সঙ্গত হবে না মনে করে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব, এই কথা কয়টী বলেই বক্তব্য শেষ করলাম। তিনি তখন

আরও দুই চার জনের সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন। অর্থাৎ এখন কিছুদিন আমাকে বঙ্গবাসীর ফাইল উল্‌টাতে হবে। তাঁদের লিখ্‌বার ঢং শিখতে হবে। তাঁদের বলবার ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে এবং আরও নানা বিষয় শিখতে হবে। আমি তখন সতের আঠারো বছরের যুবক নই, আমার বয়স তখন ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে। একটু আধটু লিখতেও পারি বলে মনে গর্বের সঞ্চারও হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি বাংলা সংবাদপত্রের অ, আ, ক, খ—এমন করে শিখতে হয় তা হলে মনটা একটু দমে যায় কি না তা সকলেই বিচার করতে পারেন।

কিন্তু উপায় ছিল না। ত্রিশ টাকা বেতনে নিজেকে শিক্ষানবিশীতে ভর্তি করে, আমার যা একটু দর ছিল, তাও কমিয়ে ফেলেছি। এখন মন ভার করলে চলবে কেন? তখন মনে মনে আবৃত্তি করলাম—যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।

বঙ্গবাসীর লেখক হতে গেলে যে আমাকে বহুদিন তপস্যা করতে হবে, তা আমি প্রথম দিনে অসংখ্য সাহিত্যরথী দেখেই এবং আরও অনেকের নাম শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। সত্য কথা বলতে কি, ওঁদের কারো সম্মুখে কলম ধরবার সাহস বা স্পর্ধা আমার ছিল না। কাযেই আপিসে যাই, বঙ্গবাসীর পুরাতন ফাইল নাড়াচাড়া করি। পড়তে বড় একটা ইচ্ছাও করে না, প'ড়ও না। পাতা উল্টে সময় কাটিয়ে দিই।

রঙ্গমঞ্চের ভাষায় বলতে গেলে—তখন বঙ্গবাসীতে হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। যোগেন্দ্র বসু এবং তাঁর সহযোগী ও সহায়কগণ বঙ্গবাসীর ধর্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীরা তো আছেনই, সম্পাদকীয় বিভাগের পাঁচকড়িবাবু, হারাণবাবু, দুর্গাদাসবাবু প্রভৃতি সকলে ধর্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য একেবারে উন্মত্ত। তাঁরা আপিসে ঘণ্টাখানেকের বেশী কেউই বসেন না। সহরে ও সহরের উপকণ্ঠবাসী সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোক-দিগের কাছ থেকে ধর্মভবনের জন্য চাঁদা আদায়েই তাঁরা ব্যস্ত।

যোগেন্দ্র বসু নিজে কোথাও যেতে পারতেন না। তাঁহার সেই স্থূল দেহে ঘোরাফেরা করা এক-রকম অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি ঘরে বসেই যা করতেন, তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হত। সে সময়ে যাঁরা 'বঙ্গবাসী' পড়েছেন এবং যাঁরা এখনও পুরাতন 'বঙ্গবাসী'র ফাইল উলটিয়ে পড়বেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যোগেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময় সত্যসত্যই

পড়বার মত ছিল। বল্‌বার কি অপূর্ব ভঙ্গী, ভাষার কি ওজস্বিনী শক্তি, শব্দ-চয়নের কি অপূর্ব প্রতিভা তখন যোগেন্দ্রবাবুর লেখায় দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর যে রকম শরীরের অবস্থা ছিল তাতে তিনি নিজে কলম ধরে লিখতে পারতেন না। প্রায়ই সন্ধ্যার পর তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে ঝিমুতেন, আর হারাণবাবু প্রমুখ লেখকগণ কলম হাতে করে সম্মুখে বসে থাকতেন। যোগেনবাবু ঝিমুতে ঝিমুতেই বলতেন, হারানবাবুও কমা, ড্যাস্ অর্থাৎ তিনি খেই হারান নি, যতটুকু বলে শেষ করেছিলেন তা তাঁর বেশ মনে থাকতো; এবং তার পর যে কমা এবং ড্যাশ দিতে হবে তাও তিনি ভুলে যেতেন না। এমনি করে 'বঙ্গবাসী'র প্রবন্ধ লেখা হোতো এবং সেই ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শত শত বঙ্গবাসী তাঁর ধর্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন, সাহায্যও প্রেরণ করতেন।

যোগেন্দ্রবাবুর লেখার আর একটী গুণ ছিল। তিনি একই সময়ে দুইজন লেখককে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় বলে যেতে পারতেন। আমি নিজে দেখেছি যে, তিনি একজনকে খানিকটা বলে লিখিয়ে—ঝিমুতে আরম্ভ করলেন, তার পর আর একজনকে বললেন, আপনি লিখুন। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। আমাকে তিনি কোনদিনই তাঁর সহকারী হতে ডাকেন নি, কারণ তাঁর ঐভাবে প্রবন্ধ লিখবার উপযুক্ত ব্যক্তিই ছিলেন—হারাণবাবু। তিনি কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন সব ঠিক ঠিক চালিয়ে যেতে পারতেন এবং যোগেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে অপেক্ষা করতেও পারতেন। থাক্ সে কথা। এখন আপিসের কথা বলি।

'বঙ্গবাসী'র পাতা উলটিয়েই প্রায় সাত আট দিন কেটে গেল—কেউ কিছু লিখতেও বসে না, আমিও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নে। আপনারাই বলুন—সাত আট দিন এই ভাবে বসে থেকে সুস্থ সবল মানুষের কি অবস্থা হয়। আরও বিপদ হ'লো এই যে আপিসের সকলেই আমার উপর মুরুব্বিয়ানা করেন এবং আমাকে নিতান্তই কৃপাপাত্র বলে মনে করেন। অবশ্য যোগেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি নে। তিনি প্রতিদিনই আপিসে বা তাঁর বাড়ীতে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং কোনদিনই মুরুব্বিগিরি করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

আমার বেশ মনে আছে আমার চাকরি আরম্ভের দশবারো দিন পরে

বেহারীদাদা খান দুই ইংরেজী কাগজের কয়েকটী সংবাদ দাগ দিয়ে আমাকে অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসীতে' এই আমার প্রথম লেখা।

৫

সত্যসত্যই 'বঙ্গবাসী' আপিসে আমি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁদের policyর সঙ্গে আমার মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তাঁরা যাঁদের এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতেন, আমি সে সকল ব্যক্তিকে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতাম, সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করতাম। আমি তখন কংগ্রেসকে দেশের মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতাম। আর আমি যে কাগজে কায করতাম সেই কাগজ কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিলেন, যা তা বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। আমার তা সহ্য হোত না, আমি সত্যসত্যই ব্যথা অনুভব করতাম। তার পর ধর্ম-ভবন—'বঙ্গবাসী'র কর্তা থেকে দ্বারবান পর্যন্ত ধর্মভবনের নামে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। আমি কিন্তু কিছুতেই তাঁদের এই উন্মাদনায় যোগ দিতে পারতাম না। এই ধর্মভবনের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি ছিল না। এ অবস্থায় আমাকে যে কিরূপ বিব্রত হতে হয়েছিল, ভুক্তভোগী ব্যতীত কেউ তা বুঝতে পারবেন না।

তবুও চাকরিটি ছেড়ে দিতে পারি নি। শ্রীমান সুরেশচন্দ্রের গৃহে থাকি। সুরেশের মা আমাকে ছেলের মত ভালবাসেন। কিন্তু আমারও যে স্ত্রী পুত্র আছে, তাদেরও যে ভরণপোষণ করতে হবে—কাযেই যা হয় হবে বলে দিনগত পাপক্ষয় করতে লাগলাম।

৬

মাসখানেক যেতেই একদিন যথাসময়ে আপিসে গিয়ে শুনলাম যে, যোগেন্দ্র-বাবু ও পাঁচকড়িবাবু সেইদিন বর্ধমানে চলে গিয়েছেন। যোগেন্দ্রবাবু আদেশ করে গিয়েছেন যে সেই রাত্রেই তাঁরা ফিরে আসবেন। যদি না আসতে পারেন তা হলে সংবাদ পাঠাবেন। যতক্ষণ তাঁরা না আসেন বা সংবাদ না

পাঠান, ততক্ষণ 'বঙ্গবাসী' ছাপা বন্ধ থাকবে। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় 'বঙ্গবাসী' ছাপা হবার কথা, কারণ পরদিন প্রাতঃকালে কাগজ বাজারে বেরুবে।

হঠাৎ তাঁরা বর্দ্ধমানে গেলেনই বা কেন এবং কাগজ ছাপা বন্ধ রাখবার আদেশই বা করে গেলেন কেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হরিমোহনবাবুও নেই যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব; তিনি সেই যে বর্ধমানে গিয়েছেন তখনও ফেরেন নি। অথচ ব্যাপার যে কি তা জানবার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। আমি নিতান্ত নির্বোধের মত মুরুব্বি-স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা কবলাম—ব্যাপার কি মশায়? তিনি নিতান্ত কর্কশ স্বরে এবং আঠারো-আনা মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা এখনও আমার মনে আছে। তিনি বল্লেন—'তাতে তোমার দরকার কিহে বাপু।' সত্যসত্যই আমার ঘটে ঐটুকু বুদ্ধি যোগায় নি। আমি সামান্য কর্মচারী—আদার ব্যাপারী—আমার জাহাজের খবর নেবার স্পর্ধা হওয়াই অন্যায়। সুতরাং মুরুব্বি মশায়ের এই কর্কশ ও অভদ্রোচিত উত্তর ম্লানমুখে গলাধঃকরণ করতে হোলো। মনে মনে সুধু বললাম—ভগবান, আর একটু বেশী করে বিষয়বুদ্ধি দাও নি কেন প্রভু!

সকলেই বসে আছি। মুরুব্বিরা কেউ কেউ বারান্দায় গিয়ে দুই তিন জন মিলে কি আলোচনা করতে লাগলেন। কেহ বা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখনও প্রভুদের দেখা নেই বা সংবাদও এল না; সেই সময় ম্যানেজারবাবু এসে বল্লেন—তাইতো, আপনাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে তা তো বুঝতে পারছিনে—একটু জলযোগের আয়োজন করি। তাই হোলো। ঘণ্টাখানেক পরেই পূর্বের অপমান ভুলে গিয়ে অম্লান বদনে জলযোগ করা গেল।

রাত্রি যখন সাড়ে এগারটা, তখন বিহারীবাবুর নামে এক জরুরী তার এল। তার মর্ম এই যে 'বঙ্গবাসী'তে লিখে দিতে হবে—আগামী কল্য হইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত 'বঙ্গবাসী'র কোন সম্বন্ধ রহিল না। বিহারীবাবু তাই লিখে দিলেন। সেইটুকু কম্পোজ হয়ে 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হল। রাত্রি ১২ টার সময় মেশিন চল্‌লো। আমাদেরও ছুটী হ'ল। কিসে যে কি হ'লো তা তখনও জানতে পারি নি—আজও জানি নে। সেই দিনের সেই মুরুব্বির কথা—"তাতে তোমার দরকার কি হে বাপু"—সার ভেবেছিলাম।

যিনি আমাকে 'বঙ্গবাসী'তে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁর ভরসায় এই এক মাসকাল নানা তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করেও আপিসে হাজিরা দিতাম, তিনি যখন এমনভাবে চলে গেলেন তখন আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। পূর্বেই বলেছি 'বঙ্গবাসী'র কোন ব্যাপারের সহিত আমি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে পারতাম না। অথচ মাস গেলে মাইনে নেব—এ যেন আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। সুরেশ ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে মন খুলেই এ কথা জানালাম। সুরেশ দুই চার দিন অপেক্ষা করতে বললেন। হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে কি উপায় হবে। তিন চার দিন পরেই পাঁচকড়িবাবু 'বসুমতী'র সম্পাদক হলেন। তিনি সুরেশকে জানালেন যে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী আমার পরম বন্ধু পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ৪০৲ বেতনে 'বসুমতীতে' নিতে সম্মত হয়েছেন।

৭

তখন আর কি। দুই একদিন পরেই যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমি সমস্ত কথা খুলে বললাম। আমি যে 'বঙ্গবাসীর' সেবা করতে পারছি নে অথচ মাসে মাসে বেতন নিচ্ছি—এ কার্যকে আমার অন্তর কিছুতেই অনুমোদন করছে না। সুতরাং আমি 'বঙ্গবাসীর' কার্য ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। গম্ভীরপ্রকৃতি যোগেন্দ্রবাবু স্থিরভাবে আমার কথাগুলি শুনলেন। তারপর বল্লেন—আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে আমি আট্‌কে রাখবো না। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। ব্যস্, দেড়মাস 'বঙ্গবাসী'র সেবা করবার ভান করে অবশেষে অব্যাহতি লাভ করলাম। যোগেন্দ্র-বাবুকে নমস্কার করে চলে এলাম।

যোগেন্দ্রবাবুর যে রকম শরীরের অবস্থা ছিল তাতে কোন সভাসমিতিতে যাওয়া তো দূরের কথা—অনেক সামাজিক নিমন্ত্রণেও তিনি উপস্থিত হতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। 'বঙ্গবাসী' থেকে চলে আসবার পর কিছুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কেমন বাধো বাধো ঠেকতো, লজ্জাবোধও হোত, সঙ্কোচও হোত। তারপর অনেকের মুখে শুনতে পেতাম—তাঁর মজলিসে কোনদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার নাম উল্লেখ হলে যোগেনবাবু আমার সম্বন্ধে খুব

অনুকূল মন্তব্যই প্রকাশ করতেন। সে প্রশংসা-বাদ আর দাখিল করে কায নেই। দুইবার দুইটি বিশেষ ব্যাপারে আমাকে তাঁর সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। সেই দুইটি ঘটনার কথা বলেই আমি আমার স্মৃতি-তর্পণ শেষ করব।

৮

'বঙ্গবাসী'র সংশ্রব ত্যাগের তিন চার বৎসর পরের কথা বল্‌ছি। আমি তখন 'বসুমতী'র সম্পাদক। আমাদের যে দিন কাগজ ছাপা হ'তো, 'বঙ্গবাসী'ও সেইদিনই ছাপা হ'তো। একবার আমাদের কাগজের কায বিকেলবেলাই শেষ হয়েছে, মেশিনে ফর্মা আঁটা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই ছাপা আরম্ভ হবে। মেঘাড়ম্বর দেখে আপিসের অনেকেই বাড়ী চলে গেলেন, থাকলাম আমি, উপেনবাবু, আর প্রিণ্টার পটোলবাবু (পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। জমাদার মেশিনে ফর্মা তুলে দিল, ছাপাও আরম্ভ হ'লো। তখন একটু একটু বৃষ্টি নেমেছে। এই বৃষ্টি থামলেই আমরা বাসায় চলে যাবো স্থির করলাম। বৃষ্টি ক্রমেই এল আমরা বসেই আছি। রাত যখন ৮টা—২।৩ হাজার কাগজও ছাপা হয়ে গিয়েছে, সেই সময় ভীষণ একটা শব্দ করে মেশিন বন্ধ হয়ে গেল। উল্লম্ফৎ জমাদার উপরে আপিস ঘরে এসে বল্‌ল—মেশিন ভেঙ্গে গিয়েছে। কিছুতেই আর চলবার উপায় হোল না। আমরা তখন তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে বুঝতে পারলাম মেশিনের যে অংশটা ভেঙ্গে গিয়েছে সেটার আর মেরামত চলবে না। নূতন করে গড়ে এনে লাগিয়ে দিতে হবে। সে তো তিন চার দিনের ব্যাপার। এখন কাগজ ছাপা হয় কি করে? পরদিন সকালে 'বসুমতী' বাজারে বের করতেই হবে। এখন উপায়? উপেনবাবু, পটোলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন। আমার অবস্থাও ততোধিক। উপেনবাবু নিরাশভাবে বললেন, কি আর করা যাবে—এ হপ্তায় কাগজ বেরুবার কোন সম্ভাবনাই দেখছি নে।

আমি সহজে দম্‌বার পাত্র ছিলাম না। বললাম—দেখি আর কোন প্রেসে ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারি কি না। উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবেন? আমি উত্তর করলাম—'হিতবাদী'তে যাবো না। দেখি যদি 'বঙ্গবাসী'র কর্তা যোগেনবাবু এই বিপদে সাহায্য করেন।

উপেনবাবু বললেন—বৃথা চেষ্টা। 'বঙ্গবাসী'র মতের প্রতিবাদ কম করেন

নি, অল্প-বিস্তর ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছেন। এ অবস্থায় যোগেনবাবুর কাছে যাবেন কোন্ মুখে। আমি বললাম, যে মুখেই হ'ক একবার চেষ্টা দেখ্‌বই। তিনি যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেন, তাও আমি সহ্য করব।

এই বলেই উল্‌ফৎ জমাদারকে বললাম—একখানা গাড়ী আনো—হ্যারিসন রোডে যোগেনবাবুর বাড়ী যেতে হবে। পটোলবাবু বললেন—এই বৃষ্টির ভেতরে কি করে যাবেন? আমি বল্লাম, যে করে হ'ক যেতেই হবে। তখনই সেই মুষল ধারে বৃষ্টির ভিতর উল্‌ফৎ জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারিসন রোডে যোগেন-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর পুত্র বরদাবাবু নীচের বৈঠকখানায় ছিলেন—আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে আমি বললাম, আমি এখনই একবার যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই—আমার বড় বিপদ। আমার কথা শুনে বরদাবাবু তখনই উপরে চলে গেলেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই নীচে এসে বললেন—চলুন, বাবাকে আপনার কথা বলেছি।

আমি উপরে গিয়ে যোগেনবাবুকে নমস্কার করতেই তিনি বলে উঠলেন—এই প্রবল জলধারার মধ্যে জলধরের আবির্ভাব যে—ব্যাপার কি? আহা, কাপড় চোপড় যে একেবারে ভিজে গিয়েছে। জামা কাপড় খুলে ফেলুন। ওরে, একখানা শুক্‌নো কাপড় এনে দে।

আমি বল্‌লাম—সে সবের কিছুই দরকার হবে না। আমার বিপদের কথা আগে শুনুন।

তখন, আমাদের দুই তিন হাজার কাগজ ছাপার পর মেশিন একেবারে ভেঙ্গে যাবার কথা তাঁকে বললাম। আমাদের এই বিপদে তিনি সাহায্য না করলে পরদিন 'বসুমতী' কিছুতেই বেরুতে পারে না।

যোগেন্দ্রবাবু একটু চুপ করে থেকেই বল্লেন—কেন বেরুবে না?—আমি সব ব্যবস্থা করছি।—ওরে কে আছিস্—প্রেস থেকে জমাদার ও প্রেস্‌ম্যানকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়। আমি বললাম—কাউকে যেতে হবে না—আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। গাড়ীতে উল্‌ফৎ জমাদার আছে। সেই গাড়ী নিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে। যোগেনবাবু সে-ই আদেশই করলেন।

একটু পরেই 'বঙ্গবাসী'র জমাদার, প্রেস্‌ম্যান ও আরও দুই একজন এসে উপস্থিত হলেন। যোগেনবাবু জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাগজ কত

ছাপা হয়েছে হে? জমাদার বল্‌ল—হাজার সাত আট হবে। মহাপ্রাণ যোগেনবাবু বলে উঠ্‌লেন, আর ছেপে কায নেই। যাও ফর্মা নামিয়ে ফেল। উফলৎ, তুমি এখ্‌নি গিয়ে তোমার ফর্মা আর কাগজ নিয়ে এস। আগে 'বসুমতী' ছাপা হবে—তারপর কাল যখন হয় বঙ্গবাসীর বাকী কাগজ ছাপা হবে। এঁদের কায আগে করে দিতে হবে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি এখনি গিয়ে সব পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন। লোকজন কাউকে পাঠাতে হবে না। উল্‌ফৎ জমাদার এলেই হবে। আপনাকেও আর আসতে হবে না। আপনার কাগজ ছাপ্‌বার সম্পূর্ণ ভার আমি নিলাম। যতক্ষণ আমার প্রেসে 'বসুমতী' ছাপা আরম্ভ না হচ্ছে ততক্ষণ আমি ঘুমুচ্ছিনে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

আমি অতি ধীরভাবে বললাম—টাকা কড়ি কি পাঠাবো। মহাপুরুষ গর্জন করে উঠলেন—টাকা!—কিসের জন্য টাকা!—এ বিপদ আমার হতে কতক্ষণ? কিছু করতে হবে না। আমার লোকজন 'বসুমতী' ছাপবে। আপনার উলফৎ জমাদার স্রেফ ওয়াচ্‌ করবে।

এমন কথা আর কেউ বলতে পারেন কি না আমি জানি নে। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের মহানুভবতার কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

৯

তারপর, আর একবার যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নিকট প্রতিবেশীদের মত তিন চার দিন বাস করতে হয়েছিল। সে লর্ড কার্জনের দিল্লী দরবারে।

যোগেন্দ্রবাবু যে দরবারে যাবেন—এ আমি মনে করি নি। দিল্লী পৌঁছে দেখি আমার পট্টাবাসের পাশের পট্টাবাস তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। তিনি বড়-একটা বেরুতেন না। আমি চারিদিকে ঘুরে ফিরে যখনই অবকাশ পেতাম তখনই যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর বিছানায় তাঁর পাশে শুয়ে পড়তাম। মহাত্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র বড় ভাইয়ের মতন আমার মাথায় হাত বুলোতেন। আর নানা রকমের খাবার খাওয়াতেন। কত যে গল্প তিনি করতেন, তা আর বলতে পারি নে। ঐ গম্ভীরপ্রকৃতি স্থূলদেহ হিমালয় পর্বতের মত মানুষের ভিতর যে এত রহস্য, এত বিদ্রূপ, এত আজগুবী গল্প ছিল—তা কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আজ এই এতকাল পরে কলিকাতার বাংলা সংবাদপত্র ক্ষেত্রে আমার

প্রথম আশ্রয়দাতা মহানুভব অগ্রজপ্রতিম যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম।

॥ ৯ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের স্মৃতি-তর্পণে বলেছি কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা পরলোকগত বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। আজ তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব।

"বঙ্গবাসী"র কার্য ত্যাগের দুইদিন পরেই উপেন্দ্রবাবু আমাকে আশ্রয় দান করেন। এতদিন স্মৃতি-তর্পণ লিখছি, কিন্তু সময়ের কথা মোটেই বলতে পারি নি, কারণ সাল তারিখ বার কিছুই আমার মনে নেই, সুধু ঘটনাগুলিই মনে আছে, আর কয়েক দিন পরে তাও মনে থাকবে না। এবার তাই মনে করেছিলাম এই স্মৃতি-তর্পণে একটু সময়-নির্দেশের চেষ্টা করব। সেই জন্য 'বসুমতী'র বর্তমান স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর উপেন্দ্রবাবুর সুযোগ্য পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবাজীকে কয়েকটী ঘটনার সময় নির্দেশ করে দিবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি সানন্দে সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন। কিন্তু অনেকগুলি ঘটনার সময় নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি "সম্ভবতঃ" বলেছেন। কাযেই পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দুই চাবিটি ব্যাপারের সম্ভবপর সময় নির্দেশ করতে হয়েছে।

এই অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারলাম যে, আমি ১৩০৪ সালের শেষে অথবা ১৩০৫ সালের শেষে অথবা ১৩০৫ সালের প্রথমে 'বসুমতী' আফিসে প্রবেশ করি। এই সময় নির্দেশে আমার প্রধান সহায় হয়েছেন 'প্লেগের' প্রথম আগমন।

১৩০৪ সালে 'প্লেগ' মহাশয় জাহাজ থেকে বোম্বাই সহরে প্রথম নামেন। গবর্ণমেণ্ট প্লেগ দমনের জন্য সেখানে বিপুল আয়োজন করেন। সেই আয়োজনের ভয়ে বোম্বাই অঞ্চলের লোক কোথায় পলায়ন করবে তাই ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিল। অনেকে সহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। প্লেগ মহাশয় যখন বোম্বাইয়ে আগমন করেছেন, তখন রেলমাশুল না দিয়েই অতি সত্বরেই যে বাংলা দেশে তাঁর আবির্ভাব হবে—এই ভেবে কলিকাতা সহরবাসী নরনারী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় আমি প্রথম 'বসুমতী' পত্রিকার পাঁচকড়িবাবুর সহকারী হয়ে প্রবেশ করি।

'বসুমতী'র আফিস তখন বিডন ষ্ট্রীটে—বিডন বাগানের সম্মুখে একটা বাড়ীতে ছিল! সহকারী সম্পাদক আর একজন ছিলেন—তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত। সংবাদপত্রের সহকারী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি খুব লিখতে পারতেন। 'বসুমতী'র অর্ধেক কায পূর্ণবাবুই করতেন, আর অর্ধেক পাঁচকড়িবাবু ও আমি করতাম। এ ছাড়া ব্যোমকেশ মুস্তফি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেকে সম্পাদকীয় কার্যে আমাদের সহায়তা করতেন। 'বসুমতী' তখন সাপ্তাহিক; তার সম্পাদনার জন্য আমরা তিনজনই যথেষ্ট। বিশেষতঃ, পাঁচকড়িবাবুর মত ব্যক্তি একদিনেই একখানি 'বসুমতী' লিখে ফেলতে পারতেন।

বন্ধুবর উপেন্দ্রবাবুর জীবন-কথা লিখতে আমি বসি নি। তাই এই স্মৃতি-তর্পণে তাঁর পূর্ব-জীবনের কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে। 'বসুমতী'র কার্য উপলক্ষে আমি যখন তাঁর সংসর্গে এলাম তখন থেকেই আমার স্মৃতির আরম্ভ। আমি দেখতাম এক অমিত-শক্তিশালী, উৎসাহের অবতার, কার্যকুশল যুবক বারংবার সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। বটতলার পুঁথিপত্তর ও সেকেলে ছাপাখানার ভিতর থেকে এমন প্রতিভাশালী ও অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তির আবির্ভাব কেমন করে হোলো, তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। আমি হিন্দুব ছেলে। পূর্বজন্ম মানি। আমার মনে হয় এ শক্তি উপেন্দ্রবাবুর পূর্বজন্মের কর্মফলে অর্জিত। নইলে আহারীটোলার যদু পণ্ডিতের বাংলা স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শেখা, নিমু গোস্বামীর লেনে মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত, বটতলার সংসর্গে লিপ্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী' সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা হবেন কি করে? থাক সে কথা। আমি উপেন্দ্রবাবুর স্মৃতি-তর্পণই করি।

পূর্বেই বলেছি, বাংলা দেশে প্লেগের আগমনের কিছুদিন আগেই আমি 'বসুমতী'তে প্রবেশ করি। দেখতে দেখতে প্লেগের আগমন ঘোষিত হোলো। বোম্বাইয়ের মত কোয়ারান্টাইন্ কলকাতা সহরেও হবে—এই আতঙ্কে কলিকাতা সহরবাসীগণ মহা ভাবনায় পড়লেন। মফঃস্বলে যাঁর যেখানে আত্মীয়স্বজন কুটুম্ব ছিলেন, অনেকেই সপরিবারে সেই সব স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলেন। যাঁরা তিন পুরুষ মফঃস্বলের বাড়ী-ঘর ছেড়ে কলিকাতায় আস্তানা করেছিলেন, তাঁরা সেই সকল জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তুভিটা পরিষ্কার করে খড়ের চালা তুলে পরিবার-বর্গের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হলেন। প্লেগের ভয়ে কলিকাতার অর্ধেক না হোক, ছয় আনা রকম লোক সহর ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমরা

খবরের কাগজওয়ালা—আমাদের মরশুম পড়ে গেল। শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশন হতে লোক পালাবার বিবরণ, কলকাতার কোন্ পাড়ার, কোন্ বস্তিতে, কার বাড়ীতে প্লেগ হোলো,—আমাদের রিপোর্টারেরা সেই সব সংবাদ সংগ্রহ করতে গলদ্ঘর্ম হয়ে পড়লেন। আমরা 'বসুমতী'র আকার ও পত্র সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েও সব সংবাদ দিয়ে উঠতে পারতাম না।

সেই সময় আমরা 'বসুমতী' আফিসে এক বিরাট বিপুল আয়োজন আরম্ভ করে দিলাম। প্রস্তাবটা কে প্রথম করেছিলেন তা মনে নেই, কিন্তু আমরা সকলেই সেই প্রস্তাবানুসারে কায করবার জন্য মেতে উঠলাম। আমাদের মনে হোলো প্লেগ নিবারণের ঔষধি আমরা আবিষ্কার করেছি। উৎসাহের অবতার উপেন্দ্রবাবু সর্বান্তঃকরণে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। আমরা কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় হরিসঙ্কীর্তনের দল গড়তে আরম্ভ করলাম। সহর ও সহরের উপকণ্ঠে নানা স্থানে গিয়ে আমরা হরিনামের দল গঠন করতে লাগলাম। সমস্ত দলের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ করলাম। প্রতিদিন কোন পাড়ায় না কোন পাড়ায় আমাদের সমস্ত দলের সঙ্কীর্তনের আয়োজন হতে লাগল। যেখানে যে দল গঠিত হয়েছিল সকলকেই 'বসুমতী' আফিসের সন্মুখস্থ বিডন উদ্যানের সামনে সমবেত হবার জন্য আমরা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতাম। সেখান থেকে সমস্ত দল শোভাযাত্রা করে যেদিন যে পাড়ায় যেতে হবে সেইদিন সেই পাড়ায় যেতাম। সত্যসত্যই আমরা কলিকাতা সহরে একটা বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলাম। দুই তিন মাস এই হরিনামে সহরের গগন পবন মুখর হয়ে উঠেছিল। হরিনামের গুণে এই ধর্মোন্মাদে লোকের মন থেকে প্লেগের ভয় অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তার সুফলও হয়েছিল। কলিকাতা সহরেও ও উপকণ্ঠে প্লেগের আমক্রণ তেমন ভীষণ হতে পারেনি। বলা বাহুল্য যে এই প্লেগ উপলক্ষে 'বসুমতী'র প্রচার এত বেড়ে গেল যে বিডন ষ্ট্রীটের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আর আমরা স্থান সংকুলান করতে পারলাম না। সেই পুরাতন ছাপার কল আর আমাদের চাহিদার যোগান দিতে পারল না। আমরা তখন চিৎপুর রোড ও গ্রে ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের নিকট গ্রে ষ্ট্রীটেরই উপর প্রকাণ্ড একটা বাড়ী ভাড়া করলাম, নূতন মেশিন এলো। কায কর্মের নূতন ব্যবস্থা হোলো। আমাদের আর আনন্দ ধরে না। উপেন্দ্রবাবুর উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে উঠলো। সত্যসত্যই গ্রে ষ্ট্রীটে গিয়েই 'বসুমতী' বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

যাঁর কায তিনি করলেন—আমরা নিমিত্ত মাত্র, কেবল পরমোৎসাহে কায করতে লাগলাম।

১৩০৬ সালের প্রথমেই গ্রে ষ্ট্রীটে 'বসুমতী' আফিস বসিয়ে আমাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য কায হোলো 'বসুমতী'র পুরাতন ও নূতন গ্রাহকদিগের মধ্যে উপহার বিতরণ করা। 'বসুমতী' এই প্রথম উপহার বিতরণের কার্যে অগ্রসর হলেন। আমরা সেবার পূজার প্রায় ২০ দিন পূর্ব হতে মাইকেলের গ্রন্থাবলী উপহার দিবার ব্যবস্থা করলাম। নামমাত্র মূল্য নিয়ে দুই হাতে মাইকেলের গ্রন্থাবলী বিতরণ আরম্ভ করা গেল। আমবা মনেও করিনি যে, আমাদের এই উপহার বিতরণ এমন সফলতা লাভ করবে। প্রতিদিন গড়ে ৪।৫ শত নূতন গ্রাহক আসতে লাগলো। সারাদিনই গ্রাহককের সমাগম, বিশেষতঃ অপরাহ্ন পাঁচটার পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত নূতন গ্রাহক আসতে লাগলেন। এত সাফল্য আমরা মোটেই আশা করি নি।

পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কাযে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিতভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তিব ব্যাঘাত উপস্থিত হোলো, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুব সংঘর্ষ উপস্থিত হোলো। উপেন্দ্রবাবুর স্বভাব এক দিকে যেমন শান্ত, শিষ্ট ও বিনয়পূর্ণ ছিল, অপর দিকে কর্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়তাও অপরিসীম ছিল।

পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গে উপেন্দ্রবাবুর মনোমালিন্যের সমস্ত সংবাদই আমি জানি, কিন্তু এতকাল পরে সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করা আমি অশোভন বলে মনে করি। এইমাত্র বলতে পারি—এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়িবাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক নিযুক্ত হলাম।

সে সময়ে 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে পাঁচকড়িবাবু ও আমি ছিলাম। গ্রে ষ্ট্রীটে আস্‌বার আগেই পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় চলে যান। এখন পাঁচকড়িবাবুও গেলেন। অত বড় একখানা কাগজ আমি একলা কি করে চালাই।

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক পরলোকগত পূজনীয় ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি 'বসুমতী'তে চাকরি করতে সম্মত হলেন না, তবে প্রতি সপ্তাহে যথাযোগ্য পারিশ্রমিক নিয়ে কিছু কিছু লেখা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। এইটুকু ব্যবস্থাতেই তো অত বড় একখানা কাগজ চলে না! আমার তখন মনে হোলো সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুইজন ব্যতীত

সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাযকর্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এ কথা আমি জানতাম। আমি তখন উপেন্দ্র-বাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে, কলিকাতায় এসে আমার পাশে বসে তিনিও হাঁপ ছাড়লেন—আমিও হাঁপ ছাড়লাম।

আমি তখন বাগবাজার মদনমোহন তলার সম্মুখস্থ শক্ ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা মেসে থাকতাম। এই মেসে আমাদের গ্রামেরই কয়েকজন। বাইরের লোকের মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর ভাই জিতেন্দ্রনাথ থাকতেন। মহেন্দ্রবাবু তখন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের হিসাব আপিসে চাকরি করেন এবং জিতেন্দ্রনাথ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের ওভারসিয়ার ছিলেন। এই মহেন্দ্রবাবুই পরে আমার বৈবাহিক হন।

দীনেন্দ্রবাবুকে আমাদের এই মেসে স্থান করে দিলাম। আমার আর কোন ভাবনা রইল না। এক দিকে দীনেন্দ্রবাবুর মত অবিশ্রান্ত লিখিয়ে, আর এক দিকে ক্ষেত্র দাদা মহাশয়ের মত বিশ্বকোষ। 'বসুমতী' সগর্বের গন্তব্য পথে অগ্রসর হতে লাগলো। তার গতি প্রতিহত করবার অনেক হীন চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় সবই বিফল হয়।

এইখানে একটা অবান্তর কথার অবতারণা করতে হচ্ছে। এই বৃদ্ধ দাদার প্রসিদ্ধ চুরুট-খোর বলে যে একটা সুনাম বা বদনাম রটে গিয়েছে, সেই চুরুট ধরিয়েছিলেন কে জানেন?—'বসুমতী'র মালিক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 'বসুমতী' আফিসে প্রবেশ করবার দুইতিন মাসের মধ্যেই তিনি প্রথম আমার হাতে চুরুট তুলে দেন। এ নেশার তিনিই আমার গুরু। কিন্তু চার-পাঁচ মাস যেতে না যেতেই শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। গুরুর যদি ছয়টা চুরুটে দিন-রাত চলতো—শিষ্যের বারটা লাগতো। সুখের কথা এই যে যতদিন 'বসুমতী'তে কায করেছি, এই চুরুট কিনবার জন্য একটি পয়সাও আমাকে ব্যয় করতে হয় নি, উপেন্দ্রবাবু সমভাবে এই দীর্ঘকাল চুরুট জুগিয়ে এসেছেন। তাই এখনও যেদিন 'বসুমতী' আফিসে গিয়ে শ্রীমান সতীশচন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করি, তখন তিনি মামুলী অভ্যর্থনা 'আসুন বসুন' না বলে আমাকে দেখবামাত্রই—'ওরে কে আছিস শীগ্‌গির চুরুট নিয়ে আয়' বলে আমাকে

অভ্যর্থনা করেন। এই প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা তাঁর পূজনীয় পিতৃদেবকেই আমায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাক সে কথা। ১৩০৬ সাল কেটে গেল। ১৩০৭ সালে পূজার সময় আমরা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী উপহার দিলাম। মাইকেলের গ্রন্থাবলীর মত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীও গ্রাহকগণের আগ্রহ উদ্দীপিত করে তুললো।

এইখানে উপেন্দ্রবাবুর একটা খেয়ালের পরিচয় দিই। ১৩০৭ সালে পূজার সময় ষষ্ঠীর দিন বেলা দুইটার মধ্যেই লোকজনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে আফিসের হিসাবপত্র ঠিক করে আমি আর উপেনবাবু হাত-পা ছড়িয়ে বসেছি, দীনেন্দ্রবাবু তার দুই দিন পূর্বেই বাড়ী চলে গিয়েছেন। আমি তখন আর মেসে থাকি নে। আমার ছোট ভাই শশধর তখন কলিকাতায় নর্ম্যাল স্কুলে সরকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে এসেছেন। আমরা দুই ভাই মিলে বাগবাজা'র মদনমোহন তলার অদূরবর্তী রাধামাধব গোস্বামীর লেনে বাস করি।

আমরা দুইজন বিশ্রাম করছিলাম। উপেন্দ্রবাবু সহসা বলে উঠলেন—এই দশ দিনের ছুটিতে কি করা যায় বলুন ত। আমি বললাম—কি আর করা যাবে—হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম।

তিনি বল্লেন—না তা হবে না। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। আমি বললাম কোথায় বেড়াতে যাবো। তিনি বল্লেন—কোথায় আবার—একটু তীর্থ করে আসা যাক। চলুন আজই রাতের মেলে সটান বৃন্দাবন। সেখানে পাঁচ-ছয় দিন থেকে আবার ঘরে ফিরে আসা। আর কোথাও যাওয়া নয়। আপনি উঠুন, বাড়ীতে গিয়ে ছোট একটা বিছানা—আর একটা ব্যাগে খানকয়েক কাপড় নিয়ে আসুন। আমিও বাড়ী যাই—ঐ রকমই কিছু নিয়ে সন্ধ্যার সময় আফিসে আসছি। আর দ্বিরুক্তি নয়, উঠুন, একেবারে স-টান বৃন্দাবন!

তাই করা গেল। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে দুইখানি সেকেণ্ড ক্লাসের রিটার্ণ টিকিট করে বৃন্দাবন যাত্রা করা গেল। তাড়াতাড়িতে এক শত চুরুটের একটা বাক্স না কিনে পঞ্চাশটা চুরুটের একটি বাক্স উপেনবাবু কিনে নিয়েছিলেন। পরদিন আমরা যখন তুণ্ডলায় পৌছলাম তখন উপেনবাবু বাক্সটি উপুড় করে বল্লেন—একটাও নেই অর্থাৎ এই দুইজন নেশাখোর এইটুকু পথ আসতে পঞ্চাশটি চুরুটের শ্রাদ্ধ করেছেন।

আমাদের ব্যবস্থা ছিল যে বৃন্দাবনে কয়েকদিন কাটিয়েই সোজা বাড়ী ফিরে

আসব। কিন্তু বৃন্দাবনে গিয়ে তিন চারটী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁদের অনুরোধে আগ্রায়ও দুদিন কাটাতে হয়েছিল। তার পর ফিরে এসে—সেই শিক, সেই দাঁড়—সেই এক ঘর।

১৩০৭ এর উপহার মিটে গেল। ১৩০৮ এল—কি উপহার দেওয়া যায় আমরা আর ভেবে পাইনে। মাইকেল দীনবন্ধুর পর দিতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্র দিতে হয়। কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হবার সাহস পেলাম না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির তখন বাজারে বেশ কাটৃতি ছিল। এ অবস্থায় তাঁর কন্যা ও দৌহিত্রগণের কাছে এ প্রস্তাব করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করলাম।

দিন কাটতে লাগলো। কোন কিছুই স্থির করতে পারলাম না। মনে হোলো সেবার বুঝি উপহার দেওয়া হয় না। তখন পূজার পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বাকী। এমন সময় গুপ্তচরের কাছে সন্ধান পাওয়া গেল যে 'হিতবাদী'র 'বিশারদ দাদা' বঙ্কিমবাবুর কন্যা ও দৌহিত্রগণের সঙ্গে গ্রন্থাবলী উপহারের কথা চালাচ্ছেন। তাঁরা সম্মতি দানও করেছেন, সুধু দেনা পাওনা নিয়ে গোল চলছে।

যে দিন সংবাদ পাওয়া গেল, সেইদিনই রাত্রি নয়টার পর, প্রতাপ চাটুয্যের ষ্ট্রীটে আমি আর উপেনবাবু গিয়ে হাজির। বৈঠকখানায় তখন আমাদের পরমবন্ধু সু-কবি শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় এলে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতেই থাকতেন, কারণ বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্ররা সকলেই তাঁর ছাত্র ছিলেন।

নবকৃষ্ণবাবুর কাছেই শুনতে পেলাম—দেনা-পাওনার গোলযোগের কথা। নবকৃষ্ণবাবু সংবাদ দিতেই বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্ররা এলেন, তাঁর কন্যাও কপাটের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা যা চেয়েছিলেন এবং বিশারদ যতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন—সে কথা নবকৃষ্ণবাবুর কাছে পূর্বেই আমরা শুনেছিলাম। আমি একেবারে সোজাসুজি বলে বসলাম—আপনারা যা চাইছেন—তা আমরা দেব। তাঁরা সম্মত হলেন। পরদিনই দলীল লেখাপড়া ও সই হয়ে গেল।

এই সংবাদ পেয়ে বিশারদদাদা বলেছিলেন—কারও সাধ্য নেই যে পনের দিনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহৎ গ্রন্থাবলী বের করে। সে চালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছিলাম। গ্রে ষ্ট্রীট অঞ্চলের চার পাঁচটা প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঠিক পনর দিনের দিন—প্রকাণ্ডকায় বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী বের করেছিলাম। সারাদিন তো খাটতামই—এই পনর দিনের দশ রাত্রি ঘরেই যেতে পারি নি। কি

জেদ্‌ই হয়েছিল। যথাসময়ে গ্রন্থাবলী বের হোলো। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আমাদেরই এই সাফল্যের জন্য ভগবানের চরণে প্রণাম করলাম।

'বসুমতী'র কার্যকালের মধ্যে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ১৯০৩ এর লর্ড কার্জনের দিল্লী দরবার। সে দরবারে 'বসুমতী'র পক্ষে আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। রহস্যের ব্যাপার এই যে আমার যিনি মনিব, সেই উপেনবাবু আমার কাগজের রিপোর্টার হয়ে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। কার সাধ্য ধরে যে তিনি আমার মনিব ও আমি তাঁর কর্মচারী। তিনি এমনভাবে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন যে অপরিচিত লোকে দেখে বুঝতেই পারতেন না যে তিনি আমার মনিব। আমি তো তাঁর ব্যবহার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার পর থেকে এমন হোলো যে আমরা মনিব চাকর সম্বন্ধ ভুলে গেলাম। তিনি আমার পরমাত্মীয় হয়ে উঠলেন।

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই আমাদের আত্মীয়তার স্বরূপ সকলে বুঝতে পারবেন। পূর্বেই বলেছি উপেন্দ্রবাবু আহিরীটোলার নিমু গোস্বামীর লেনে তাঁর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। মাতুল নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন। মাতুলানীর সমস্ত স্নেহ উপেনবাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইয়ের উপরেই পতিত হয়। মামী ঠাকুরাণীই গৃহের কর্ত্রী ছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর সহধর্মিণী—শ্রীমান সতীশচন্দ্রের জননী, যতদিন মামীঠাকুরাণী বেঁচে ছিলেন, ততদিন বধূরূপেই জীবন কাটিয়েছেন। উপেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনের পর থেকে তিনি একরকম সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। কাশীতেই থাকেন—আর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক তীর্থভ্রমণ করে বেড়ান। এমন সতী সাধ্বী মহিলা আমি অতি কমই দেখেছি। আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী হলেও আমি তাঁকে প্রণাম করছি।

এখন ঘটনাটা বলি। উপেনবাবুর মামী তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশের নিয়ম ছিল—এখন আর নেই—যে মেয়েরা তীর্থভ্রমণ করে এলে যাঁর যেমন সাধ্য তিনটী, দ্বাদশটী বা ততোধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন করান। উপেনবাবুর মামীঠাকুরাণী তীর্থ থেকে যে ফিরে এসেছেন সে সংবাদ আমি জানতাম না। যেদিন ফিরে এসেছেন সেইদিনই সন্ধ্যার সময় উপেন্দ্রবাবু আমাকে বললেন—কাল দুপুর বেলা আমাদের বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—সে সেখানে গিয়েই হবে। আর এ নিমন্ত্রণও আমার নয়। মামীঠাকুরাণী আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

পরদিন বেলা বারোটার সময় উপেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি—দ্বিতীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কেউ নেই—আমিই একা। উপেনবাবুর মামী এলে—আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন—দেখ বাবা, তীর্থ-ভ্রমণ করে এলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হয়। আমি অনেক ভেবে দেখলাম—তোমাকে ভোজন করালেই আমার শত ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল হবে। তাই তোমাকে কষ্ট দিয়ে এনেছি। আমি তো অবাক্। এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা বলেন কি ?

উপায়ান্তর ছিল না। সে মহাপাপের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হোলো। নব-বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করে ভোজন শেষ করলাম। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা যখন দক্ষিণা দিতে এলেন, তখন আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললাম—আমার অপরাধ যথেষ্ট হয়েছে, আর বাড়াবেন না। ও দক্ষিণার টাকা গরীব দুঃখীকে দিয়ে দেবেন। এই থেকেই সকলে বুঝতে পারবেন—আমি উপেন্দ্রবাবুর সংসারে কি শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিলাম।

এইবার আমার ঘোর বিপদের কথা বলি। ১৩১২ সাল পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনাই ঘটে নি যার কথা লিপিবদ্ধ করতে পারি। 'বসুমতী' সগৌরবে চলে এসেছে। ভেবেছিলাম এমনি আনন্দেই দিন কেটে যাবে। কে জানতো যে নিয়তি আমার জন্য ধীরে ধীরে বজ্র সংগ্রহ করছেন।

১৩১২ সালের শেষ ভাগে ফাল্গুন চৈত্র মাসে কলিকাতায় ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। সহরবাসীদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হোলো। চৈত্র মাসের ৮ই কি ৯ই তারিখে আমার কনিষ্ঠ সহোদর—একমাত্র ভাই—স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে এলেন। আমাদের প্রাণ চমকে উঠল। পরদিন গায়ে আসল বসন্ত দেখা দিল। এ ব্যাধিতে সকলেই সন্ত্রস্ত হন। আত্মীয় বন্ধুরা কেউ বাড়ীতে আসেন না, দূর থেকে সংবাদ নিয়ে যান। স্থির করেছিলাম বাড়ীর মেয়েদের সব সরিয়ে দেব। আমার স্ত্রীকে সন্তানাদি সহ আমার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। শশধরের স্ত্রী অর্থাৎ বউমা কিছুতেই যেতে সম্মত হলেন না। রোগীর ঘরে তাঁর বা ছেলেদের প্রবেশ নিষেধ হোলো। আমি ও আমার দিদি কুড়ি দিন পর্যন্ত যমের সঙ্গে লড়াই করলাম। দিশীমতে চিকিৎসা করালাম। কিছুতেই কিছু হোলো না। ১৩১৩ সালের শুভ ১লা বৈশাখ অশুভ মূর্তিতে দেখা দিল। বেলা ১২টার সময় আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন শশধর চলে গেলেন। উপেনবাবুকে সংবাদ পাঠালাম। তিনি কয়েকজন কম্পোজিটার পাঠিয়ে দিলেন। আমার বাসা থেকে কাশী মিত্রের ঘাট অতি নিকটে।

সন্ধ্যার পর শব শ্মশানে নীত হোলো। রাত্রি দশটার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।

মনে করলাম—এই বুঝি শেষ। আমাব যা ছিল সবই তো কাশী মিত্রের ঘাটে রেখে এলাম। নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে বললেন—আরও আছে।

বাসা ভেঙ্গে দিলাম। ছোট বৌমাকে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। আমার বাড়ীর সম্মুখস্থ মহাত্মা রাধামাধব গোস্বামীর পুত্রপৌত্ররা আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেইখানে বিগ্রহের প্রশাদ দুইবেলা পাই, তাঁদের বৈঠকখানায় রাত কাটাই। কেমন কবে কাটাই ভগবান জানেন। দিনের বেলায় আফিস করি। কাজকর্ম্ম করবার শক্তি সামর্থ্য আমার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি আফিসে গিয়ে চুপ করে বসে থাকি, আর ভাবি—এ কি হোলো। বন্ধুবর দীনেন্দ্রবাবু না থাকলে কায একেবারে অচল হয়ে যেত।

শশধরের পরলোকগমনের পর চোদ্দ দিন যেতে না যেতেই বাড়ী থেকে সংবাদ এল—আমার একমাত্র ভগিনী—যিনি প্রাণপণে শশধরের শুশ্রূষা করেছিলেন, তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হোয়েছেন।

ছুটে গেলাম বাড়ী। দুই দিন পরে তিনিও চলে গেলেন। ভগ্নহৃদয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত যে কি করে কাটলো তা ভগবান জানেন। মনে করলাম পূজার ছুটীর পর এসে সব শোক-তাপ ঝেড়ে ফেলে—পূর্ব্বের মত "বসুমতী" সেবায় একাগ্রচিত্ত হব। নিয়তি অলক্ষ্যে থেকে বললেন, তা আর হয় না।

পূজার পর এসে যথাসময়ে 'বসুমতী' আফিসে উপস্থিত হলাম। দিন দশেক কাজ করবার পর একদিন সন্ধ্যার সময় আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে খবর এলো, আমার একমাত্র কন্যা অচলা কলেরা রোগে আক্রান্ত। সেই রাত্রির গাড়ীতেই ছুটে গেলাম আমার শ্বশুরবাড়ী। যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলাম—১২ শিশির একটা হোমিপপ্যাথিক বাক্স, আর প্রতাপ মজুমদারের একখানা বাংলা বই।

গিয়ে যা দেখলাম—ভীষণ ব্যাপার।

গ্রামের ঘরে ঘরে কলেরা। দুইতিন ঘণ্টা পর পরই সুধু "বল হরি, হরি বোল"। ভয়ে শিউরে উঠলাম। পরদিন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করলাম। আমার স্বগ্রামবাসী পরম হিতৈষী ডাক্তার শ্রীমান দেবপ্রসাদ সান্যাল সংবাদ

পাওয়া মাত্র উপস্থিত হলেন। দুই একটা ওষুধ দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পরেই কলিকাতায় চলে গেলেন, বলে গেলেন রোগিনীর বাঁচবার কোন আশাই নেই।

আমার মেয়েটার যিনি শুশ্রূষা করছিলেন আমার সেই সম্বন্ধী—সেইদিন সকাল থেকেই কলেরায় আক্রান্ত হন। রাত্রি দশটায় মেয়েটী গেলেন, বারটায় আমার সম্বন্ধী গেলেন। সে রাত্রিতে শবদাহের কোন ব্যবস্থাই হোল না। প্রাতঃকালে বহু কষ্টে কয়েকজন লোক সংগ্রহ করে শবদাহ করে এসেই দেখি আমার স্ত্রীও ঐ রোগে আক্রান্ত। বুঝলাম এইবার সব শেষ।

ছেলে তিনটিকে পূর্বেই আমার বড় বৌদিদি সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ী রওনা হয়ে যান, নইলে তাদের বা কি হোতো কে জানে। চিকিৎসার সম্বল আমার সেই ১২ শিশির বাক্স। চিকিৎসার কিছুই জানি নে। মাথার ঠিক নেই, তবুও যা হয় একটা ওষুধ দিলাম। কোন ফলই হোলো না। সন্ধ্যার পর দেখা গেল রোগিনীর সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছে। নাড়ী বসে গিয়েছে। বুঝলাম রাত্রি আর কাটবে না।

সেই উন্মত্ত অবস্থায় আবার বই নিয়ে বসলাম। উপসর্গ মিল্‌লো কি মিল্‌লো না—তা বলতে পারিনে। ভগবানের নাম করে একটা ওষুধ স্থির করে এক ফোঁটা সুগার অব মিল্কের সঙ্গে মিশিয়ে কোন রকমে মুখের ভিতর পুরে দিলাম। ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই সেই এক বিন্দু ঔষধ মন্ত্রৌষধির মত কায করল। মনে হোলো নাড়ী ফিরে এসেছে, মনে হোলো শরীরের নীল বর্ণও কেটে যাচ্ছে।

দুইদিন অনাহারে অর্ধাহারে অনিদ্রায় যমের সঙ্গে লড়াই করে আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুললাম। আরও দুইদিন সেখানে থাকলাম। তার পরই ডায়মণ্ডহার-বারের পথে ছেলে তিনটির আসবার ব্যবস্থা করে আমার রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে দেশে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছে দেখলাম সুরেশ (সমাজ-পতি), নলিনীভূষণ (গুহ) ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা সেই রাত্রের মেলেই আমাদের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

গাড়ীতে উঠলে সুরেশ বললেন—দাদা, আবার কবে আসছেন।

আমি বললাম—ভায়া, এই হয় তো আমার শেষ যাত্রা। শরীর মন অবসন্ন, নিয়তি আমার জন্য হয় কলেরা, না হয় বসন্তের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তা না হলেও কিছুদিন আমি বাড়ী থেকে নড়ছিনে।

এদিকে 'বসুমতী'র কার্য আর অমনভাবে চলতে পারে না। উপেন্দ্রবাবু তাঁর এবং আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দীনেন্দ্রবাবুকেই সম্পাদকের কার্যভার

সমর্পণ করলেন। তিনিও আমাকে জবাব দিলেন না, আমিও তাঁকে জবাব দিলাম না। যেমন বন্ধুভাবে 'বসুমতী'তে প্রবেশ করেছিলাম, তেমনি বন্ধুভাবেই 'বসুমতী'র বন্ধন ছিন্ন করলাম।

কিন্তু উপেন্দ্রবাবুর স্নেহের বন্ধন তাঁর জীবনান্তকাল পর্যন্ত আমি ছিন্ন করতে পারি নি। ১৩২৫ সালের ১৭ই চৈত্র ৫০ বৎসর বয়সে সুধী কর্মবীর উপেন্দ্রনাথ তাঁর নিমু গোস্বামীর লেনের বাড়ীতে যে দিন দেহত্যাগ করলেন সেই দিনই তাঁর স্নেহপাশ ছিন্ন হোলো।

আজ এতকাল পরে আমার সেই পরম বন্ধু কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা উপেন্দ্রনাথের স্মৃতি-তর্পণ করে পরম তৃপ্তিলাভ করলাম।

॥ ১০ ॥

এবার এক সঙ্গে তিন-চারজন আমার পরম শ্রদ্ধেয় খ্যাতনামা মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করব। ধারাবাহিক হিসাবে বলতে গেলে প্রথমেই পণ্ডিত কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদের নাম বলতে হয়। তার পরেই 'হিতবাদী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মৃতি-তর্পণ করতে হয়।

ইঁহাদের মধ্যে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী দিনের। কিন্তু এ সকল কথা বলবার পূর্বেই আর একজনের নাম না করলে এই বিবরণের ধারাবাহিকত্ব রক্ষা পায় না—তিনি, আমার পরম বন্ধু 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়।

এই সকল মহানুভব ব্যক্তির স্মৃতি-তর্পণ করবার পূর্বে আমার নিজের কথা একটু বলতে হচ্ছে।

'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার ত্যাগ করে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সপরিবারে দেশে চলে গেলাম, এ কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু দেশে গিয়ে বসে থাক্‌ব—আর পরিবার প্রতিপালিত হবে, তার সংস্থান যে আমার ছিল না—তখন সে কথা আমার মনেও হয়নি।

জোত-জমা ছিল না, সঞ্চিত অর্থও কিছু ছিল না যে তাই দিয়ে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করব। পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিমাসে পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব থেকে কিছু কিছু পাঠাতেন, আর বড়দাদার পেন্‌সনের টাকা—

এই দিয়ে কোন রকমে তিন-চার মাস চলে গেল। কিন্তু সে ভাবে আর কত দিন চলতে পারে?

বড়দাদা অবসর নিয়ে বাড়ী এসে বসেছেন। আমি তাঁর সেবা করব, সংসারের সমস্ত ভার মাথায় নেব—এই তো আমার কর্তব্য। কিন্তু তা না করে তাঁর শেষ জীবনের অবসর-বৃত্তি আমার জীবন-ধারণের জন্য ব্যয় হবে—তিন-চার মাস বাড়ী বসে থেকে সে ব্যবস্থা আর আমার ভাল লাগল না।

তখন স্থির করলাম—আবার কলকাতায় ফিরে আসব। 'বসুমতী'র কার্যে আর যোগ দেব না কারন তার সু-ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। দেখি এত বড় সহরে আর কোথাও বিধাতা আমার জন্য কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন কি না। সেবার কলকাতার এসে আর সুরেশের আশ্রয়ে গেলাম না অন্য কোন বন্ধুরও গলগ্রহ হলাম না। আমাদের গ্রামের শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল তখন কলিকাতার ছোট আদালতের যথেষ্ট পশারওয়ালা উকিল। তিনি আমার কলকাতায় আসবার কয়েকদিন পূর্বে বাড়ী গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা করে বল্লেন—দাদা, এমন করে বাড়ী বসে থাকলে আপনার শরীর মন কিছুই ভাল হবে না। আপনি কলকাতায় চলুন। আমার বাসায় থাকবেন, আমি আপনার সেবা করব।

রাধিকাপ্রসাদের এই সাগ্রহ অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। কলিকাতায় এসে নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে তাঁর প্রবাস-ভবনে অধিষ্ঠিত হলাম।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন খাই-দাই আর ঘুরে বেড়াই। যাওয়ার স্থান বড় বেশী ছিল না। 'হিতবাদী'র সরকারী সম্পাদক পরলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে অনেকদিন পূর্ব থেকেই আমার পরিচয় ছিল এবং সে পরিচয় বিশেষ অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছিল। কখনও 'হিতবাদী' অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, কখনও বা তাঁর বাড়ীতেও যেতাম।

'হিতবাদী' অফিসে বিশারদ দাদার সঙ্গেও সর্বদা দেখা হোতো। তিনি প্রায়ই বলতেন, ওরে, অমন করে ঘুরে বেড়াসনে। যা হয় একটাতে লেগে যা। আমি বলতাম—দেখি, যা হয় একটা করব। কিন্তু তাঁর সেই কথা অল্পদিন পরেই তাঁরই উপর দিয়ে ফলে যাবে, এ কথা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁর অনুরোধে সে সময় দু' চারটে প্রবন্ধও 'হিতবাদী'তে লিখেছিলাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গেও আমার পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে তাঁর 'সন্ধ্যা' আফিসে আড্ডা দিতে যেতাম। প্রাতঃকালের চা-পান 'সন্ধ্যা' আফিসেই হোতো, আর খুব আড্ডা জমতো।

সেই সময়ে একদিন উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু —আপনার তো এখন কোন কায নেই। প্রত্যহ সকালবেলা 'সন্ধ্যা' আফিসে আসুন না কেন? মুড়ি বেগুনি আর চা খাবেন—আর 'সন্ধ্যা' কাগজের জন্য এক কলম কি দু-কলম যা হয় লিখবেন। বাসায় ফিরে যাবার সময় আমি আপনাকে বেশী দিতে পারব না। 'সন্ধ্যা'র সে শক্তি নেই। নগদ দুটী করে টাকা দেব। আমি ভাবলাম—মন্দ কি? বসেই তো আছি, যেদিন আসবো চা-যোগ তো হবেই, আর 'সন্ধ্যা' কাগজের এক কলম দু-কলম লিখতে আধ ঘণ্টার বেশী সময়ও লাগবে না। দক্ষিণা নগদ দুটী টাকা—যথা লাভ।

একটা মানুষের মতন মানুষ ছিলেন—এই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়— একেবারে খাঁটী সোণা। একটুও খাদ তাতে ছিল না। কবির ভাষায় বলতে গেলে—এমন মানুষ—"লাখে না মিলয় এক।"

উপাধ্যায় মহাশয়ের রাষ্ট্রনীতি এবং স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ থাকলেও আমি এ'কথা স্পষ্ট বাক্যে বলতে পারি—তাঁর মত দর্শন ও বেদান্তে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, তাঁর বালকের ন্যায় সরল স্বভাব, তাঁর ত্যাগ, তাঁর সংযম, তাঁর পরদুঃখকাতরতা, সর্বোপরি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা— আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভক্তি করতাম,—এক কথায় তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম।

উপাধ্যায় মহাশয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে 'সন্ধ্যা' আপিসে আসতেন। প্রত্যহই তাঁকে কিছু লিখতে হত না। পাঁচকড়িবাবু, নরেন শেঠ, "গোবর-গণেশ" হরিদাস হালদার* প্রভৃতি বড় বড় লিখিয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে 'সন্ধ্যা' আপিসে জমায়েৎ হতেন এবং সকলে পরামর্শ করে যাকে যা লিখতে হবে তা ঠিক করা হ'ত। এ লেখার অংশ আমিও পেতাম।

শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (কালা বীরেন) প্রুফ্‌ রিডার ছিলেন এবং দৈনিক সংবাদাদি তিনিও লিখতেন। চা মুড়ি ও বেগুনি খেতে খেতে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঐটুকু 'সন্ধ্যা' কাগজের সব লেখা শেষ হয়ে যেত। এক-একদিন উপাধ্যায় মহাশয় বলতেন—আজ আমি একটু ঝাল-নুন বাড়িয়ে দি। সে যে কি সুন্দর লেখা—অমন সরল সহজ ভাষায়, অমন হাসি তামাসা করতে করতে মর্মভেদী বাণ নিক্ষেপ, ঐ একা ব্রহ্মবান্ধবই পারতেন। যেদিন ঝাল-নুন একটু

---

* 'গোবর গণেশের গবেষণা' নামক গ্রন্থের লেখক।—সম্পাদক

বেশী থাকতো—সেদিন বেলা একটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত 'সন্ধ্যা' ক্রমাগত ছাপা হত। কাগজ বাজারে পড়তে পেত না। যাঁরাই পড়তেন তাঁরাই ভবিষ্যদ্বাণী করতেন—এই দেখ না কাল সকালেই ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে যায়।

অনেকবার এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয়েছিল। অবশেষে একদিন সত্যসত্যই বাঘ আসিল। 'সন্ধ্যা'য় দুইটী প্রবন্ধ বের হয়। সে দুইটীর মধ্যে একটির নাম আমার মনে আছে, সেটি—"এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।" এই দুই প্রবন্ধের* জন্য ব্রহ্মবান্ধব ও মুদ্রাকরকে অভিযুক্ত করা হল। তাঁরা জামিনে খালাস রইলেন। সরকার থেকে আমাকে সাক্ষী মান্য করা হল। উপাধ্যায় মশায়ই যে 'সন্ধ্যা'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সেই কথা প্রমাণ করবার জন্য সরকার পক্ষ আমাকে ডেকেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সকলেই লালবাজার পুলিশ আদালতে হাজির হলুম। মিঃ কিংসফোর্ড তখন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট। কাউকে কোন সাক্ষ্যই দিতে হল না। উপাধ্যায় মহাশয় এক 'ষ্টেট্‌মেণ্ট দাখিল করে বল্লেন, তিনিই 'সন্ধ্যা'র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। যে দুইটী প্রবন্ধের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে—তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করছেন। আদালতে তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থন করবেন না, আর একটি কথাও বলবেন না। আইন-কর্তাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বললেন—এর পর আর সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার নেই। ১০।১৫ দিন পরে রায় দেবার দিন স্থির হল।

উপাধ্যায় মহাশয় অনেক দিন থেকে হার্ণিয়া রোগে ভুগছিলেন। এই সময় সে রোগের যন্ত্রণা এমন বেড়ে গেল যে সত্বরই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হোলো। তিনি দুই একদিনের মধ্যেই ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করালেন এবং সেইখানেই শয্যাগ্রহণ করলেন। আমরা প্রতিদিন অপরাহ্ন-কালে তাঁকে দেখতে যেতাম। শুয়ে শুয়েই কত গল্প কত হাসি-তামাসা করতেন। একদিন দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন—আমাকে আর জেলে দিতে হয় না—আমি এই দেখিয়ে চলে যাবো।

---

* আরও দুটি প্রবন্ধ ছিল—'সিডিশনেব হুড়ুম দুড়ুম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' এবং 'বাছা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন'—সম্পাদক।

এ যে ভবিষ্যদ্বাণী তা আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে আমরা সেদিন চলে এলাম। কিসে কি হোলো ভগবান জানেন— পরদিন বেলা ১০টার সময়েই সংবাদ পাওয়া গেল—উপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নেই। মহাত্মা পূর্বদিনেই সে কথা বলেছিলেন—আমরা বুঝতে পারিনি।

সংবাদ পাওয়া মাত্র সহরের চারিদিক থেকে লোক ছুটলো ক্যাম্বেল হাসপাতালে। সেখান থেকে শবদেহ বহন করে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক একবার 'সন্ধ্যা' আফিসের সম্মুখে শবাধার নামালেন। তার পর নিমতলার শ্মশান ঘাটে আমরা উপাধ্যায় মহাশয়ের নশ্বর দেহ চিতা-ভস্মে পরিণত করে এলাম। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র মুখাগ্নি করলেন।

উপাধ্যায় মহাশয় যে দেশপূজ্য রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র একথা সকলেই জানেন। একাদশ দিনে কালীঘাটে আমরা সকলে মিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করেছিলাম। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। 'সন্ধ্যা'র তহবিলে সেদিন সাত টাকা তের আনা ছিল। তাই নিয়ে আমরা ২৫।৩০ জন কালীঘাটে শ্রাদ্ধ করতে গেলাম। রাস্তার মধ্যে আমরা চার পাঁচ জন নেমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ী যাই। তিনি সাত টাকা তের আনা কথা শুনে তখনই ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিলেন, আর বল্লেন—শ্রাদ্ধ তো হবেই—আর দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে। আমি এখনই আপনাদের সঙ্গে যেতে পারছিনে। হাইকোর্টে আমার একটা জরুরী মোকদ্দমা আছে। আমি সেখানে গিয়ে জজেদের বলে মামলা মুলতুবী নিয়ে কালীঘাটে যাচ্ছি—আপনারা এগোন।

তারপর যে কি হোলো তা বর্ণনার অতীত। চারিদিক থেকে অযাচিত ভাবে দ্রব্যসম্ভার আসতে লাগলো; এমন কি এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণ-সেবার জন্য স্বয়ং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তিনশো কি পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন আমরা তাঁর শেষ কার্য মহা-সমারোহে শেষ করেছিলাম। তাঁর মৃত্যুতে আমি অশৌচ গ্রহণ করেছিলাম। এই একাদশ দিন নগ্নপদে হবিষ্যান্নে কাটিয়েছিলাম—আজ এত কাল পরে তাঁর স্মৃতি-তর্পণ করলাম।

যখন আমি 'সন্ধ্যা' আফিসে আড্ডা দিতাম—সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে দেউস্কর মহাশয় 'সন্ধ্যা' আফিসে উপস্থিত হলেন এবং আমাকে একান্তে ডেকে

নিয়ে বল্লেন্ উপেনবাবু (স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়) আমাকে তলব করেছেন। অকস্মাৎ উপেন-দাদার তলব—আমি কারণ জান্‌তে চাইলাম। সখারাম বল্লেন্, সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে দেখা করলেই কারণ জানতে পার্‌ব; সখারাম আর কিছুই বল্লেন্ না।

সন্ধ্যার পর 'হিতবাদী' আফিসে গেলাম। শ্রীমান মনোরঞ্জন বাবাজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে উপেনদাদার বৈঠকখানায় হাজির করে দিলেন। সেখানে উপেনদাদা ও তাঁহার বড় ভাই দেবেনদাদা বসে ছিলেন। উপেনদাদা কাজের লোক; ভূমিকা বা ভণিতা না করে তিনি সোজা-সুজি বলে বস্‌লেন "দেখ জলধর, তোমাকে হিতবাদীর ভার নিতে হবে।" আমি ত অবাক্—এ কি প্রস্তাব। আমি বল্‌লাম, "আমার দ্বারা হবে না দাদা!" তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হোলো। অবশেষে আমি বল্‌লাম, "আপনারা যদি সখারামের উপর সম্পূর্ণ ভার দেন, তা হ'লে আমি তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।" উপেনদাদা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্‌লেন "ভেবে দেখি। তুমি কাল একবার এসো।" পরের দিন গেলাম। তিনি বল্‌লেন "তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হলাম। আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দাও।" তাঁর আদেশে সেই দিন থেকেই আমি 'হিতবাদী'র সেবক হলাম। সখারাম হলেন কর্ণধার, আর যোগেন্দ্রবাবু, মণীন্দ্রবাবু, পাঁচুবাবু, মনোরঞ্জন, আর আমি হলাম সেবক।

এইস্থানে বিশারদ দাদার কথা একটু বলি। বিশারদ-দাদা বিচিত্র-কর্মী মানুষ ছিলেন। তিনি শুধু সাংবাদিক ছিলেন না, আমাদের দেশের অসংখ্য কাজের বোঝা তিনি তাঁর সুস্থ মস্তকে তুলে নিয়েছিলেন এবং তার কোন একটিকেও তিনি অবহেলা করেন নাই—তাঁর কর্তব্যবোধ এমনই প্রখর ছিল!

কিন্তু মানুষেরই শরীর ত! বিশারদ-দাদা তাঁর শরীরের দিকে মোটেই চান নাই; তার ফল এই হোল, অমন যে স্বাস্থ্য, অমন যে তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অমন যে অতুলনীয় কার্যদক্ষতা—অত্যধিক পরিশ্রমে, অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনায় তিনি অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, এত পরিশ্রম তাঁর, সইল না। বন্ধুবান্ধব-গণের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি বিশ্রামলাভের জন্য সমুদ্র-যাত্রা কর্‌লেন। অমন কর্মী পুরুষ কি বিনাকাজে বেশীদিন চুপ করে থাক্‌তে পারেন—বিশারদ-দাদা গৃহাভিমুখী হলেন। সমুদ্রের মধ্যেই তাঁর চির-বিশ্রাম লাভ হোলো; সাগরের নীলাম্বুতলে আমাদের বিশারদ-দাদার নশ্বর দেহ সমাহিত হোলো। আমরা তাঁর রোগ-শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াতেও পার্‌লাম না। পড়ে রইল তাঁর

'হিতবাদী', পড়ে রইল তাঁর পুত্র মনোরঞ্জন, পড়ে রইল তাঁর অসংখ্য অসমাপ্ত কাজ—বিশারদ-দাদা সাধনোচিত ধামে চ'লে গেলেন।

* * * *

সেবার সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হবার ব্যবস্থা হয়েছিল; সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন, সার রাসবিহারী ঘোষ। কলকাতা থেকে অনেক প্রতিনিধি সুরাটে গিয়েছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যে গিয়েছিলেন, সে কথা না বল্‌লেও চলে; উপেনদাদাও গিয়েছিলেন।

যেদিন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হবার কথা, সেদিন অপরাহ্নে আমরা তাড়িৎবার্তার দিকে চেয়ে ছিলাম। তখন 'দৈনিক হিতবাদী' খুব জোরে চল্‌ছে। সন্ধ্যার একটু পূর্বে তার এলো—কংগ্রেস ভেঙ্গে গিয়েছে, দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হয়েছে, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ একদল এই যজ্ঞভঙ্গের নেতা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আদেশ করা হয়েছে, তিলকের এই কার্যের তীব্র নিন্দা কর্‌তে হবে। এই আদেশ শুনে হিতবাদীর কর্ণধার, মারাঠাসন্তান সখারাম একেবারে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—"আমার উপর যতক্ষণ হিতবাদীর ভার আছে, ততক্ষণ তিলক মহারাজের বিরুদ্ধে এক লাইনও লেখা হবে না, তাতে আমার কার্য ত্যাগ করতে হয় তাও করব!" তিনি তখনই সে কথা তার-যোগে উপেনদাদাকে জানালেন।

সাতটা বাজলো, আট্‌টা, ন'টা হয়ে গেল—সখারামের তারের জবাব আর আসে না। আমরা মহাসঙ্কটে পড়লাম। পরদিন প্রাতঃকালে যথারীতি 'দৈনিক হিতবাদী' বাজারে দিতে হবে ত!

দশটার একটু আগেই তারের জবাব এলো। তার মর্ম এই যে, কার্যত্যাগই মঞ্জুর হোলো; তাঁহাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে কাগজ চালাতে হবে। তাই হোলো। দুই দিন পরে সুরেন্দ্রবাবু, উপেনদাদা প্রভৃতি ফিরে এলেন। নূতন কোন ব্যবস্থাই তাঁরা কর্‌লেন না; সেই তারের খবর "জলধর কাগজ চালক"—ঐখানেই শেষ। কিন্তু তা চল্‌ল না! তখন—

"মরা গাঙে বান ডেকেছে
জয় মা, বলে ভাসাও তরী।"

তখন সুরেন্দ্রনাথের অমর লেখনী 'বেঙ্গলী'র পৃষ্ঠায় অনল-বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার ধাতুতে অনল ত ছিলই না, উত্তাপ হয় ত ছিল না। আমি

এ দামোদরের বানের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব কেন? হিতবাদী বল্‌তে লাগ্‌লেন "ভাসাও তরী—কিন্তু ধীরে!"

সর্বনাশ! হিতবাদীর পরম শুভানুধ্যায়ীরা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, হিতবাদীর সুর নরম হয়ে গিয়েছে। সে কথা শুনেও চুপ করে রইলাম। তার পরে অভিযোগ হতে লাগলো, আমি বিশারদের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ কর্‌ছি। যে বিশারদ দাদাকে আমি গুরুর মত ভক্তি করি, আমার দ্বারা তাঁর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এ অভিযোগ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না—আমি তখন বিশারদ দাদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁহার হিতবাদীব সেবা হ'তে অবসর গ্রহণ কর্‌লাম। এইখানে বলা কর্তব্য যে, আমি যতদিন হিতবাদীর সেবায় নিযুক্ত ছিলাম, ততদিন দেবেনদাদা, উপেনদাদা, তাঁহাদের পুত্রগণ ও শ্রীমান মনোরঞ্জনের নিকট থেকে যে অনুকম্পা লাভ করেছিলাম, সে কথা আমি কোনদিন ভুল্‌ব না।

তার পর যাঁহারা হিতবাদীর ভার নিলেন, তাঁহারা হিতবাদীর বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে গেলেন। তার ফলে হিতবাদীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত হোলো। কে সম্পাদক, তা আদৌ প্রমাণ হোলো না, হাতে-কলমে ধরা পড়্‌লেন নিরীহ মুদ্রাকর—নীরদবাবু। তাঁকে মাস কয়েকের জন্য কারাদণ্ড ভোগ কর্‌তে হোলো। এইবার হিতবাদীর কর্তারা সত্যসত্যই বিশারদ-দাদার বৈশিষ্ট্য রক্ষা কর্‌লেন; তাঁহারা স্পষ্ট বললেন, দৈনিক হিতবাদী বন্ধ কর্‌তে হয় তাও কর্‌ব, জামিন দেব না। তাই হোলো; জামিন দেওয়া হোলো না, দৈনিক হিতবাদী বন্ধ হয়ে গেল। সাপ্তাহিক হিতবাদী এখনও চল্‌ছে।

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রদাদা ও উপেন্দ্রদাদা আমার প্রতি যে কেমন সদয় ছিলেন তার একটা দৃষ্টান্ত না দিয়ে আমি তাঁদের স্মৃতি-তর্পণ শেষ করতে পারছিনে।

আমি প্রতিদিন বেলা একটার সময় 'হিতবাদী' আফিসে যেতাম। আমার ফিরতে রাত ১২।১টা বেজে যেত। আর সকলে সন্ধ্যার পরই চলে যেতেন। আমি একা থাকতাম। আমি তখন শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ সান্যালের বাসা ছেড়ে স্কটীশ চার্চেস কলেজের পেছনে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম। সব দিন রাত্রিতে আমার আহার হোতো না। অত রাত্রে আহার্য দ্রব্য থাকলেও খেতে ইচ্ছা করত না, সুতরাং উপবাসেই কাটতো। পথশ্রম আমি গ্রাহ্য করতাম না, কলুটোলা থেকে হেদুয়া—এমন কিছু দীর্ঘ পথ নয়।

হিতবাদী আফিস যে ফুটপাথে তার অপরদিকেই কবিরাজ সেন মহাশয়দিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ফুটপাথের উপরেই তার বিস্তৃত বারান্দা। সেখান থেকে

আমাদের আফিস বেশ দেখা যায়। একদিন রাত্রি ১০টা ১০॥০টার সময় উপেনদাদা সেই বারান্দায় বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি 'হিতবাদী' আপিসের দিকে পড়লো। তিনি দেখলেন—আমি একলা বসে কি লেখাপড়া করছি। তখনই লোক পাঠিয়ে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। দেবেনদাদা তখন সেই বারান্দায় বসেছিলেন। আমি যেতেই উপেনদাদা বল্লেন—জলধর, তুমি এখনও বাড়ী যাওনি। আমি বললাম—এখনও তো সময় হয়নি, আমি ১২।১টার কমে যাইনে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—রাত ১২।১টা পর্যন্ত না খেয়ে থাক? আর তার পর? এই গ্যাঁড়াতলা দিয়ে বাসায় যাও? ভয় করে না?

আমি বিনীতভাবে বল্লাম, অনেকদিনই রাত্রে অনাহারে থাকতে হয় দাদা। আর, পথের কথা যা বলছেন,— আমি গ্যাঁড়াতলা দিয়ে যাইনে, বরাবর কলুটোলা দিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে কলেজ ষ্ট্রীট ও সেখান থেকে বরাবর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে হেদোয় যাই।

তিনি বল্লেন, না, না! অমন করে একলা যেও না—গাড়ী করে যেও। তোমার সে গাড়ী-ভাড়া আমিই রোজ দেব। আমি হেসে বল্লাম—দাদা, ভুলে যাচ্ছেন—আমি হিমালয়-ফেরত। তিনি আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন—আরে না, না! শেষে গুণ্ডার হাতে পড়ে প্রাণ হারাবে নাকি?

তার পর দেবেনদার দিকে চেয়ে বল্লেন—আচ্ছা দাদা—আমিই না হয় নানান্ ধান্ধায় ঘুরে বেড়াই। তুমি তো বাড়ীতেই থাকো। এই যে ভদ্রলোকের ছেলেটী সেই দুপুর বেলায় আসে, আর রাত ১২টা ১টায় যায়—এর দিকে কি একবারও চেয়ে দেখ না। দেখ, আজ থেকে রোজ রাত্তির ন'টার সময় হিতবাদী অফিসে জলধরের খাবার পাঠিয়ে দেবে। ভুলে যেও না!

দেবেনদা বল্লেন—সত্যিই অন্যায় হয়েছে জলধর। আমার শরীর ভাল নয় তা তো জানো—সব দিক দেখে উঠতে পারিনে।

তারপর যতদিন 'হিতবাদী'তে ছিলাম, রাত ৯টার সময় আমার খাবার আসতো। কিন্তু আমি গাড়ী-ভাড়ার পয়সাও নিইনি, গাড়ী-ভাড়া করেও বাড়ী আসিনি।

কয়েকদিন পরে উপেনদা একদিন আমাকে ডেকে বল্লেন—কই হে জলধর—তুমি তো গাড়ী-ভাড়ার পয়সা নাও না। আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তিনি তখন 'হিতবাদী'র ম্যানেজারকে ডেকে আদেশ দিলেন—এই মাস থেকে জলধরের ২০৲ কুড়ি টাকা মাইনে বাড়ল।

এই অযাচিত স্নেহে সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল—আমি একটি কথাও বলতে পারিনি। আজ এতকাল পরে তাঁদের সেই স্নেহ ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আবার আমার চোখে জল এল। এই চোখের জলেই আজ তাঁদের দুই ভাইয়ের স্মৃতি-তর্পণ করলাম।

॥ ১১ ॥

বাংলা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে যাঁর সঙ্গে শেষ কায করেছি আজ তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব। তিনি স্বনামধন্য "ইণ্ডিয়ান মিরার"-সম্পাদক পরলোকগত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই নরেন্দ্রবাবুকে কত সভা-সমিতেতে দেখেছি। তাঁর সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান মিরার" কাগজ অনেক সময় পড়েছি, ইংরাজী ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি, অমন নির্ভীক সম্পাদক সেকালে অতি কমই ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল তার চার মাস পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন। এই চার মাসের স্মৃতির আলোচনা আজ করব।

রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের পরিচয় সে-কালের বাঙ্গালীর কাছে দেবার আবশ্যক নাই, এ-কালেরও অনেকে এখনও তাঁকে ভোলেন নি।

নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বলবার পূর্বে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব প্রবন্ধে বলেছি—আমি 'হিতবাদী'র সংস্রব ত্যাগ করলাম। এ থেকে অনেকে হয় তো মনে করতে পারেন যে, যেমন অকস্মাৎ এই সঙ্কল্প করি তৎক্ষণাৎ তা কার্যে পরিণত করি। আসল কথা কিন্তু তা নয়।

প্রায় মাসখানেক থেকেই আমি 'হিতবাদী'র সম্পাদনভার ত্যাগ করব কি না সে কথা চিন্তা করছিলাম। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু সহসা কার্য ত্যাগ করে আবার কোথায় দাঁড়াব এই ভাবনা হয়েছিল।

আমি কিন্তু আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে দেখতে পেয়েছি যে, অলক্ষ্যে থেকে কে একজন আমার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন, আমাকে কখনো চাকরির জন্য কারও কাছে উমেদারী করতে হয়নি। স্বয়ং বিশ্ববিধাতা সে ভার নিয়েছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাই হ'ল।

সে সময় ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের খ্যাতনামা কবি জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (এখন স্যার মহারাজা) কলিকাতায় বাস করতেন। তাঁরা তখন তাঁদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। বড় ভাই প্রমথবাবু কবি ও সাহিত্যিক, ছোট ভাই মন্মথ-বাবু তখন সাহিত্যিক এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য।

তাঁদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে এক বৈঠকখানায় সাহিত্যিকদের বৈঠক বসত —সেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার প্রমুখ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক প্রতিদিন আড্ডা দিতেন—নানা বিষয়ের আলোচনা হত। আর সেই প্রশস্ত অট্টালিকার আর এক প্রান্তে মন্মথবাবুর মজলিস্ বসত। সেখানে প্রায় প্রতিদিন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় মহোদয়গণের আগমন হ'ত, রাজনীতি সম্বন্ধে বিপুল আলোচনা হ'ত। আজ যে মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী খ্যাতনামা রাজনীতিক ও সুবক্তা, এর সূচনা সেই বৈঠকেই হয়েছিল। মহারাজা স্যার মন্মথনাথ তখন থেকেই ইংরাজী ভাষায় একজন সুবক্তা বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

আমার এই দুই মজ্‌লিশে মিশবারই ছাড়-পত্র ছিল। সাহিত্যসেবা করতাম বলে প্রমথনাথের আসরে স্থান পেতাম, আবার সংবাদপত্রের সম্পাদক বলে মন্মথনাথের মজ্‌লিসেও আমার প্রবেশাধিকার ছিল; আমি দুই মজলিসেই সমভাবে যোগ দিতাম; দুই-ভাই-ই আমাকে যথেষ্ট স্নেহই বলুন আর অনুগ্রহই বলুন—করতেন। তাতে আমার এই সুবিধা হয়েছিল যে কোন মজ্‌লিসেই চা জলযোগ বা সাময়িক ভোজনে আমাকে বঞ্চিত হতে হোতো না। এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে আমি যে আর 'হিতবাদী'র সঙ্গে পেরে উঠছিনে এ সম্বন্ধে প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে অনেক দিন আমার আলোচনা হয়েছিল। সেই আলোচনার ফল এই হ'ল যে একদিন প্রমথবাবু আমাকে বললেন—দেখুন জলধরবাবু, আমি সুদীর্ঘকালের জন্য কলিকাতা ছেড়ে দেশে যাব। আমি বলি কি—আপনি অবিলম্বে 'হিতবাদী'র কায ছেড়ে দিন—আমার সঙ্গে সন্তোষে চলুন। সেখানে আমার ছেলে ও মেয়ের (ছোট ছেলে তখনো জন্ম গ্রহণ করেন নি) অভিভাবক ও শিক্ষক হবেন। আমার সঙ্গে থাকবেন। আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করব। সন্তোষে আপনার কোন খরচপত্র লাগবে না, সবই আমি বহন করব। আপনি মাসিক দেড়শো

টাকা পাবেন। একে ভগবানের অনুগ্রহ ছাড়া আর কি বলব। মন্মথবাবুও এই কথা শুনে খুব আনন্দিত হলেন। তার দুই-এক দিন পরেই 'হিতবাদী'র কার্য ত্যাগ করলাম এবং তখনই চলে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু 'হিতবাদী'র অন্যতম স্বত্বাধিকারী উপেন দাদা প্রমথবাবুকে চিঠি লিখে আমাকে আরও একমাস আট্‌কে রাখলেন। তার পরেই আমি সন্তোষে চলে গেলাম।

দুই বৎসর আমি সন্তোষে ছিলাম। প্রথম কিছুদিন প্রমথবাবুর ছেলে ও মেয়েটিকে নিয়েই থাকতাম, আর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রমথবাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণীর অনুপম সেতার-বাজনা শুনতাম। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কি যে আনন্দে কেটে যেত তা আর বলতে পারিনে। তার পরই এক বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে পড়া গেল।

এই সময় মন্মথবাবু রাজা উপাধি লাভ করে কলিকাতা থেকে দেশে গেলেন। আমরা মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করলাম। তার পরই বিষয়-কর্ম, দেনা-পাওনা ও জমিদারী নিয়ে দুই ভাইয়েব মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হ'ল। এই মতান্তর যখন মনান্তরের সীমানা স্পর্শ করল তখন আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না। জমিদারী ও বিষয় কর্ম সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমি দুই ভাইয়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। নানা ব্যাপারে দুই ভাইই আমার সততা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। সে সব কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কোন রকমে গোলযোগ মেটাতে পেরেছিলাম। দাঙ্গা হাঙ্গামা, আইন আদালত, বাহিরের মধ্যস্থতা কোন কিছুই করতে হয়নি। এর ফলে এই হ'ল যে আমি বড় তরফের অর্থাৎ প্রমথবাবুর দেওয়ান নিযুক্ত হলাম। গিয়েছিলাম ছেলেদের অভিভাবক হয়ে—শেষে হলাম জমিদারীর অভিভাবক।

কিন্তু এসব হাঙ্গামা আমার শরীর বেশীদিন সহ্য করতে পারল না। টাঙ্গাইল অঞ্চল তখন ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল—এখনও আছে। আমার সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় শরীর ভেঙ্গে পড়ল। আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। দুদিন ভাল থাকি তো পাঁচ দিন জ্বরে ভুগি। কি করব উপায় নাই; এত বড় চাকরিটা ছেড়েই বা দিই কি করে। কিন্তু যে বিধাতা এত কাল আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন—তিনিই তার বিধান করলেন।

একদিন আমার পরম বন্ধু সম্প্রতি পরলোকগত অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভায়ার একখানি পত্র পেলাম। তিনি যা লিখেছেন তার সার মর্ম

এই যে তিনি শুনতে পেয়েছেন যে আমি সন্তোষে ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। কোন সুবিধা পেলেই কলিকাতায় চলে যাবো। তাই তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন যে, আমি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-প্রাপ্ত "সুলভ-সমাচার" পত্রিকায় সহকারী হয়ে কলিকাতায় যাই। সম্পাদক হয়েছেন—রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও বাংলা ভাল জানতেন না, লিখতেও পারতেন না। আমায় সেখানে সহকারী হয়ে কায চালাতে হবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পত্র প্রমথবাবু ও রাজা মন্মথ উভয়কেই দেখালাম। আমার সে সময়ের শরীরের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা আমার কলিকাতা যাওয়াই কর্তব্য বলে মনে করলেন। আমি সন্তোষের দেওয়ানী, ছেলেমেয়েদের অভিভাবকত্ব ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে 'সুলভ সমাচার'-এর সহকারী হলাম। চাকরি ত্যাগ করে এলাম বটে, কিন্তু জমিদার ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহপাশ ছিন্ন করতে পারলাম না। তখনও পারিনি, এখনও পারিনি। এখনও তাঁরা পূর্বের মতই আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করে থাকেন।

তখন 'সুলভ-সমাচার'-এর আফিস ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট ক্রীকরোতে ছিল। আমি এসে দেখলাম রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ভায়া ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয় 'সুলভ সমাচার'-এর কাযকর্ম দেখছেন। তিনকড়ি-দাদাকে পেয়ে আমার খুব ভরসা হোল। পূর্ণ দুই বৎসর সংবাদপত্রের সেবা থেকে দূরে ছিলাম, আবার নূতন করে আরম্ভ করতে হোল। নরেন্দ্রবাবু আমাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। প্রত্যহ আফিসে আসবার সময় ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হোত। তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত চিঠি-পত্র, নোটিস, সারকুলার, সমস্ত আমাকে দিতেন। আর কোন্‌টা সম্বন্ধে কি ভাবে বলতে হবে তাও বলে দিতেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আজীবন নিযুক্ত থাকার অনেক নিদর্শন, তাঁর কথায় ও তাঁর উপদেশে পেতাম। প্রবন্ধাদি নির্বাচন এবং নূতন প্রবন্ধ লেখা সম্বন্ধে তিনি আমাকে অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। আমি তাঁর স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হয়েছিলাম। আমি রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের জীবন-কথা লিখতে বসিনি। তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত, বড়লাটের গৃহে তাঁর তেজস্বিতার বিবরণ এখনও প্রবাদ বাক্য হয়ে আছে। সে সব কথা তাঁর জীবন-চরিতকারের জন্য রেখে দিলাম।

মনে করেছিলাম নরেন্দ্রবাবুর ন্যায় বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে তাঁর নির্দেশ

অনুসারে কায করে যাব, কোন দায়িত্ব আমার থাকবে না। কিন্তু আমি মনে করলে কি হয়? বিধাতার বিধান অন্যরূপ। চার মাস যেতে না যেতেই নরেন্দ্রবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কয়েকদিন পরেই সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।

নরেন্দ্রবাবু যেদিন পরলোকগত হলেন সেই দিনই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বাংলা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে তাঁর পিতৃদেবের পরলোকগমন সংবাদ পাঠালেন এবং 'সুলভ সমাচার' পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

চিঠি পাবার পরদিনও যখন চীফ সেক্রেটারী মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না, তখন সত্যেন্দ্রবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি তাঁকে সে কার্য হতে বিরত হতে বললাম, কারণ সত্যেন্দ্রবাবুর যা কর্তব্য তা তিনি করেছেন। তাঁর অত তাড়াতাড়ি করবার কোন প্রয়োজন নেই। গবর্ণমেণ্টের কাগজ, তাঁরা যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। সত্যেন্দ্রবাবু আর দেখা করতে গেলেন না। তিনদিন পরে চীফ সেক্রেটারী মহাশয় একটা সময় নির্দেশ করে সত্যেন্দ্রবাবুকে ও আমাকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে আদেশ দিলেন।

আমরা দুইজন যথাসময়ে চীফ সেক্রেটারী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তিনি পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রথমেই নরেন্দ্রবাবুর পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করলেন, তারপর সত্যেন্দ্রবাবুকে বললেন—আপনার পত্রের উত্তর দিতে তিন চার দিন বিলম্ব হয়েছে, কারণ যেদিন আপনার পত্র পাই সেই দিনই 'সুলভ সমাচার'-এর সম্পাদক-পদপ্রার্থী হয়ে পাঁচসাত জন আবেদন করেছেন। সেক্রেটারী মহাশয় তাঁদের কয়েকজনের নামও করলেন এবং তাঁদের মধ্যে দুই তিন জন যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে কথাও বললেন। এইখানে বলে রাখি যে আমি কিন্তু কোন আবেদনও করিনি বা তদ্বিরও করিনি; বরং সত্যেন্দ্রবাবুকে এ সম্বন্ধে কিছু করতে বিরত করেছিলাম।

তারপর সেক্রেটারী আমাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে যে রিপোর্ট আছে তা আমি পড়েছি। আপনার যোগ্যতার পরিচয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিনে—সে আমি জানি। সুতরাং আমাকে একটা কথাও বলতে হ'লনা। তারপর সত্যেনবাবুকে বললেন—আমরা স্থির করেছি—মিঃ সেনকেই 'সুলভ সমাচার'-এর সম্পাদক করব। আপনি কি বলেন সত্যেন্দ্রবাবু!

সত্যেনবাবু উত্তর দিলেন—আমারও তাই ইচ্ছা। তবে সে কথা আপনাকে না লিখে আপনার উপরেই ভার দিয়েছিলাম। তখনি আদেশ হ'ল, নরেন্দ্রবাবুর পরলোকগমনের দিন থেকেই আমি সম্পাদক হলাম এবং আমার বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধির অনুরোধ সেক্রেটারী মহাশয় সত্যেনবাবুকে জানালেন।

আমি নিজে কোন চেষ্টা করিনি। কোনও তদ্বিরও করিনি এ কথা পূর্বেই বলেছি। শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রবাবুও কিছু করেন নি। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকেই আমাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হ'ল।

তার পরই আর যাই কোথায়! চারিদিক থেকে আমার উপর তিরস্কার ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতি বর্ষিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। রহস্যের কথা এই যে, যাঁরা এই পদের জন্য আবেদন করে বিফল-মনোরথ হয়েছিলেন, তাঁরাই আমাকে স্বদেশ-দ্রোহী প্রভৃতি সুমিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সে অপ্রীতিকর বিষয় সম্বন্ধে তখনও কিছু বলিনি—এত কাল পরে আজও কিছু বলব না।

বৎসরের অবশিষ্ট কয়মাস যেমন করেই হোক 'সুলভ সমাচার' চালালাম। সেই সময় লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ রদ্ হয়ে গেল। মহামতি ভারত-সম্রাটের আদেশে কার্জন বাহাদুরের সেটেল্‌ড্ ফ্যাক্ট একেবারে আন্ সেটেল্‌ড্ হয়ে গেল। দুই বাংলা জুড়ে গেল। বাংলাদেশ আর লেফেটনাণ্ট গবর্ণরের অধীন থাকল না—একজন গভর্ণর নিযুক্ত হলেন। বিহার ও উড়িষ্যা বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ হ'ল। রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লী চলে গেল। গবর্ণমেণ্ট তরফ থেকে তখন বলা হ'ল—বাংলা দেশে শান্তি এসে গেছে—আর কোন গোলমাল হবে না। সুতরাং বৎসরে একরাশি টাকা ব্যয় করে 'সুলভ-সমাচার' প্রচারের আর প্রয়োজন নেই।

তখন ভারত-সম্রাট দিল্লীতে দরবার করলেন। কলিকাতা টাউনহলের সিঁড়িতেও একটা ছোটখাটো দরবার হ'ল। সেই দরবারে আর দশজনের সঙ্গে আমিও একখানি সার্টিফিকেট-অব্-অনার পেলাম।

এইভাবে বাংলা সংবাদপত্রের সেবার অধ্যায় আমার শেষ হোল। এর পরে আর কোনদিন কোন সংবাদপত্রের সংশ্রবে আমি যাই নি। তাই আজ বাংলা সংবাদ পত্রে আমার শেষ আশ্রয়দাতা পরলোকগত রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে আরও দুই-একটী কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

‘সুলভ সমাচার’-এর চাকরি তো গেল! তারপর কি করা যায়! সার্টিফিকেট-অব্-অনার ধুয়ে জল খেলে তো পেট ভরবে না! ‘সুলভ-সমাচার’ উঠে যাওয়ার সংবাদ পেয়েই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু আমার পূর্ব মনিব সন্তোষের কবি-জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং যতদিন আর কোন সুবিধা না হয় ততদিন তাঁর প্যারাগন প্রেসের ভার নিতে বললেন। এখন যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ আফিস হয়েছে পূর্বে সেখানে ট্রাম কোম্পানীর আস্তাবল ছিল। সেই আস্তাবলের ঘরগুলি ভাড়া নিয়ে প্রমথবাবু প্যারাগন প্রেস করেছিলেন। আমি সেই প্রেসের ম্যানেজার হলাম।

তখন, ‘ভারতবর্ষ’ প্রচারের বিপুল আয়োজন চলছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বললেন যে তিনি প্যারাগন-প্রেসেই ‘ভারতবর্ষ’ ছাপতে চান। আমার আর তাতে আপত্তি কি! অতবড় একখানি কাগজ ছাপবার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করতে হয় আমি তাই করতে লাগলাম। হরিদাসবাবু কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। তখন ‘ভারতবর্ষে’র সঙ্গে আমার ঐ টুকুই সম্বন্ধ ছিল।

আমি চার পাঁচ ফর্মার মত কম্পোজ তুলে দিলাম। প্রথম ফর্মার পেজ্ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম, সেই দিনই সেই ফর্মার প্রুফ্ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।

তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। ‘ভারতবর্ষে’র কর্মকর্তাগণ কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হ’ল। অবশেষে হরিদাস-বাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে জোর করে বসিয়ে দিলেন। আমি এ সৌভাগ্যের আশাও করিনি এবং এজন্য কোন চেষ্টাও করিনি।

প্রথম বৎসর পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আমার সহযোগী ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের আরম্ভে তিনি চলে গেলে, ‘বঙ্গনিবাসী’র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহযোগী হলেন। তৃতীয় বৎসরে তিনিও চলে গেলেন। সেই থেকে এই সুদীর্ঘকাল আমি একাকী ‘ভারতবর্ষ’ নিয়ে বসে আছি।

# পরিশিষ্ট

## ভারতী-স্মৃতি

'ভারতী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা পড়াশুনা করিতাম—সে আজ চল্লিশ বৎসর পূর্বের কথা—সেকালের কথা বলিলেই হয়। তখন আমরা ইংরাজী স্কুলে পড়িলেও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ চর্চা করিতাম; কারণ তখন আমরা কাঙ্গাল হরিনাথের কাছে শিক্ষানবিশী করিতাম। সে সময়ে যে কত আগ্রহে 'ভারতী' পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না; অনেক প্রবন্ধ বুঝিতে পারিতাম না, তবুও পড়িতাম, এখনকার কালের মত শুধু গল্প পড়িয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতাম না, যাহা পড়িতাম তাহার রীতিমত পরীক্ষা দিতে হইত; যাহা বুঝিতাম না, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইত। তখন মাসিকপত্র পাঠ আমাদের সখের ব্যাপার ছিল না, আমরা সখের খাতিরে বাঙ্গালা পড়িতাম না। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, ভারতী এবং তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা আমরা আমাদের সেই পল্লীভবনে বসিয়া যথারীতি পড়িতাম; শব্দের প্রয়োগ শিখিতাম; ভাল ভাল কথা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, কণ্ঠস্থ করিতাম, এবং যখন কিছু লিখিতাম, তখন ঐ সকল কথা, ঐ সকল শব্দ, ঐ সকল ভাব গ্রহণ করিতাম। এই ভাবে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য শিক্ষা করিতাম। মাসিক-পত্রের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, ডাকঘরে আনাগোনা করিতাম; কোন একখানি মাসিকপত্র আসিলে কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইত। আমাদিগের জ্যেষ্ঠেরা প্রথমে পড়িতেন, তাহার পর আমরা পড়িতে পাইতাম; তখন ত আর বাড়ীতে বাড়ীতে কাগজ আসিত না; বিশেষত আমি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলাম, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক কিনিবারই শক্তি আমার ছিল না; কাজেই আমাকে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াই পত্রাদি পড়িতে হইত।

তাহার পর কতদিন চলিয়া গেল; আমার মাথার উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গেল; কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিলাম; কত বিয়োগ-বেদনা বুক পাতিয়া লইলাম; কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিলাম, কত পর্বতে প্রান্তরে অরণ্যে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইলাম। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসিলাম। সে সকল কথা আর বলিব না।

বাঙ্গালা দেশে আসিয়া আমি যখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদলের রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া যাই, সেই সময় আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু সাহিত্য-

ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সেখানে ছিলেন। তিনিই আমাকে মহিষাদলে যাইতে বাধ্য করেন; চাকুরী করা তখন আমার অভিপ্রেতই ছিল না, আমি তখন আর একবার অজ্ঞাতবাসে যাইবার কল্পনা করিতেছিলাম। তাহা হইল না, আমি মহিষাদলেই গেলাম।

যখন আমি হিমালয়ের মধ্যে ছিলাম, সেই সময় আমার আর কিছুই সম্বল ছিল না, সুধু সম্বল ছিল কাঙ্গাল হরিনাথের বাউলের গানের একখানি বই। আমার এক বন্ধু সেইখানির দুরবস্থা দেখিয়া যখন ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দেন, তখন তিনি তাহার সহিত কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার ভ্রমণের কথা একটু আধটুকু লিখিয়া রাখিতাম,—ওটা একটা খেয়ালমাত্র; পরে যে কিছু করিব, এ কথা ভাবিয়া লিখিতাম না; সে অভিপ্রায় থাকিলে যথাযথভাবে অনেক কথা লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। যখন মহিষাদলে গেলাম, তখনও ঐ বইখানি আমার সঙ্গে ছিল—কাঙ্গালের গানগুলি যে আমার নিকট বড়ই বহুমূল্য ছিল—আমি ঐ গানগুলিকেই আমার জপমন্ত্র করিয়াছিলাম—উহারই মধ্যে আমি সব পাইতাম। মহিষাদলে একদিন দীনেন্দ্রবাবু আমার সেই গানের বইখানি দেখিতে পান এবং পেন্সিলে লেখা সেই কথাগুলিও পড়েন। সে সময়ে তিনি 'ভারতী'তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ভারতী'-সম্পাদিকামহাশয়াও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। দীনেন্দ্রবাবু আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণকথা 'ভারতী'তে লিখিতে হইবে। আমি ত কথাটা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। শৈশবকাল হইতে যদিও একটু-আধটুকু লেখাপড়ার চর্চা করিতাম, কাগজপত্রেও সামান্য কিছু লিখিতাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ত্যাগের পর হইতে লেখাটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আর ওদিকে যাইবার ইচ্ছা ছিল না; নিজের শক্তিসামর্থও ছিল না। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একরকম বিদায় গ্রহণই করিয়াছিলাম; অন্ধকারের মধ্যেই জীবন কাটাইব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু দীনেন্দ্রবাবু কিছুতেই ছাড়িলেন না, জোর করিয়া হিমালয়-ভ্রমণের প্রথম প্রস্তাব লিখিয়া লইলেন এবং নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া 'ভারতী' পত্রে প্রেরণ করিলেন। বোধ হয় সে সময় পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া এবং তাঁহার কন্যাদ্বয় ফাইল খুঁজিয়া প্রকাশের মত কিছু পান নাই, অথবা দীনেন্দ্রবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই আমার সেই লেখাটা 'ভারতী'তে প্রকাশিত করিলেন। আমি কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, আমার

নামটা যেন ছাপা না হয়; আমার মত নিতান্ত, অপরিচিত, নিরক্ষর, গ্রাম্য স্কুল মাষ্টারের অতি অকিঞ্চিৎকর লেখার নীচে আমার নিরাকার নাম দিয়া 'ভারতী'র প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া বোধ হয় রহস্য দেখিবার জন্যই আমার আকার-ইকার-উকার-বর্জ্জিত নামটা প্রবন্ধের শেষে ছাপিয়া দিলেন এবং আমাকে আরও লিখিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিলেন। প্রবন্ধ-দৈন্যই যে তখন এই অনুরোধের একমাত্র কারণ হইয়াছিল, তাহা আমি এখনও হলফ্ করিয়া বলিতে পারি; নতুবা 'ভারতী'র ন্যায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হইবে কেন?

কিন্তু সম্পাদিকা মহাশয়া আমাকে জানাইলেন যে, আমার হিমালয়-ভ্রমণ পাঠকগণের ভাল লাগিয়াছে, এ সংবাদ তিনি পাইয়াছেন। ইহা হইতেই বর্তমান পাঠক-পাঠিকাগণ সে সময়ের পাঠক-পাঠিকাগণের সাহিত্য-রস বিচারের ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। সে যাহাই হউক, আমি 'ভারতী'তে লিখিতে লাগিলাম। যে পত্রের সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী পরে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও শ্রীমতী সরলা দেবী, যে পত্রে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য দিগ্‌গজ সাহিত্য-রথী যথানিয়মে লেখেন, সেই পত্রে আমার লেখাও বাহির হইতে লাগিল—পুষ্পের সহিত কীটও দেবতার মাথায় উঠিতে লাগিল। হিমালয়ের কথা তাহার পূর্বে কেহ বাঙ্গালায় হয়ত লেখেন নাই; তাই আমার লেখা যা-তাই সকলে পড়িতে লাগিলেন। তখন আমার সেই প্রবাস-পল্লী হইতেই শুনিতে লাগিলাম যে, 'জলধর সেন' নামে কোন ব্যক্তি নাই, ঠাকুর-বাড়ীর কেহ ছদ্মনামে হিমালয়-কাহিনী লিখিতেছেন। কিন্তু এ কথাটা কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, বাঙ্গালা ভাষায় নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম থাকিতে উক্ত প্রবন্ধাবলীর লেখক দীনবন্ধু বঙ্কিম কর্তৃক লাঞ্ছিত ঐ নামটিই ছদ্মনাম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? আরও একটি কথা আছে, তাহা এখানে বলিতে হইতেছে। আমি যখন 'ভারতী'তে হিমালয় ভ্রমণ লিখিতে আরম্ভ করি, তাহার কিছুদিন পূর্বে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইউরোপ যাত্রীর পত্র' প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমি হিমালয় লিখিবার সময় তাঁহারই অতুলনীয় লিখন-পদ্ধতি (style) অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যে অক্ষম অনুসরণ, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না; কিন্তু সে সময় হয়ত-বা ঐ লিখন-পদ্ধতি দেখিয়াই অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন! আর যাঁহারা আমায়

অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও দোষ দিতে পারি না; কারণ আমার নামটার সহিত পূজনীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু এমনই একটা চিত্র জড়াইয়া দিয়াছেন যে, কোন পিতামাতাই পুত্রের ঐ নামকরণ করিতে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না। আমার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ এই যে, উপরিউক্ত সাহিত্যরথী-দ্বয়ের লেখনীধারণের পূর্বেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব খোসখেয়ালের বশেই আমার ঐ নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি ভবিষ্যৎ জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত এমন কার্য করিতেন না। যাক্ সে কথা। আমি প্রায় দুই বৎসর ক্রমাগত লিখিয়া 'ভারতী'-পত্রে আমার হিমালয়-ভ্রমণের এক অংশ শেষ করিয়াছিলাম; তাহাই একত্র সংগ্রহ করিয়া পরে 'হিমালয়' ছাপাইয়াছিলাম।

যে 'ভারতী'কে অবলম্বন করিয়া আমি বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, সেই 'ভারতী' চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিল, ইহাতে আমার ন্যায় 'ভারতী'র নগণ্য সেবকের যে কি আনন্দ বোধ হইতেছে, তাহা বলিবার ভাষা নাই।

# নির্দেশিকা


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫০, ৫১, ৭৮, ৮৩, ৮৫, ৯০, ৯৩, ৯৫, ১০১, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ৯৭, ১৭০
অঘোরনাথ গুপ্ত ১২
অচলা সেন (কন্যা) ১৮৮
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ১৭০
অনন্তবাবু ১৬৪
অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩৬, ৩৮, ১১১
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ২০৫
অম্বিকাচরণ মিত্র ৪৭, ৫০
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৭৬
অরবিন্দ ঘোষ ১৮২
অশ্বিনীকুমার দত্ত ৫৫, ৫৭-৬০, ৬২-৬৪, ১২৯, ১৩৬-১৪২

আবদুল্লা ১১
'আর্যদর্শন' ২০৭
'ইউরোপ যাত্রীর পত্র' ২০৯
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭, ১৬৯

ঈশানচন্দ্র দেব ১৪৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৯, ৩৯, ১১৪-১৬, ১২১
ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪১

'উদভ্রান্ত প্রেম' ১৬১
'উদাসীন পথিকের মনের কথা, ৯৬
উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ৩৬
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯-৮৭, ১৮৯, ১৯০
উপেন্দ্রনাথ সেন ১৯০, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪, ১৩২
উমেশচন্দ্র সেন ৩১, ৪০, ১১৩
উলফৎ জমাদার ১৭৬, ১৭৭

'কপালকুণ্ডলা' ১৫৩

কাঙ্গাল হরিনাথ [ হরিনাথ মজুমদার, ফিকিরচাঁদ ] ৫, ৬, ১০, ২১-২৪, ২৭, ২৮, ৩০, ৪২, ৪৭, ৫১, ৬৪, ৬৬-৬৯, ৭১, ৭৩-৭৫, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯০-৯৬, ৯৮, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১৫০, ১৬৫-৬৬
কাদম্বিনী বসু ৪২
কার্জন ( লর্ড ) ২০৪
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ৪৮, ১০৮
কালিদাস রায় ৩২
কালীকান্ত কর ১৪৬
কালীকান্ত সেন ১৪৬
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৪৬
কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৪৬
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩, ১৩১, ১৯৪
কালীপ্রসন্ন বসু ৩১

কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ ১৮৫, ১৯০, ১৯৫-৯৬
কালীমোহন ঘোষ ২৯, ১৪৬
কালীশঙ্কর সুকুল ৬৮

কিংসফোর্ড ১৯৩

কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( মহারাজ ) ১৪, ৪৯, ৬১
কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি ১৫২
কৃষ্ণধন মজুমদার ২৫, ২৬, ৩৫, ৩৬
কৃষ্ণনাথ সেন ৪, ৭
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ১৫৪
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩
কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য ১৫২

কে. জে বাদশা ৪৫
কেদারনাথ জোয়ারদার ২৭, ২৮
কেনি (মিঃ) ১৬
কেশবচন্দ্র সেন ১২

'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' ৪৮
ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত ১৬৯, ১৮২, ১৮৩

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০১

গদাধর সেন ১

'গাজী মিয়ার বস্তানী' ৯৬

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৭৬, ৭৮
গিরীন্দ্রনাথ সাহা ১১৮-২০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ১৫৫-৫৯, ১৬১-৬৫, ১৯১

গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় ১২
গৌরশঙ্কর দে ২৯, ৪৩
'গৌরী সেতু' ৯৬
'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ৭৪-৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ১৬৫-৬৭

চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ ১৫০-৫২
চন্দ্রনাথ বসু ১৭০
চন্দ্রশেখর কর ১১০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৬১
চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯৪

জন উভরফ ১৫৪
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫৬, ১৩৩, ১৩৪

জিতেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৩

জ্যাঠামশাই ( রামতনু সেন ) ১, ২, ৫, ৭-৯, ১৪, ২১, ২২, ২৭, ২৯, ৩০
জ্যাঠাইমা ৪, ৩৫, ৩৭, ৫১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৯
'জ্ঞানাঙ্কুর' ২০৭

ঠাকুরদা ১৭

ডালহৌসি ( লর্ড ) ২৬
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ২০৭
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ২০২
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭০

দক্ষিণারঞ্জন সেন ৩১-৩৩, ৪০, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭
দাদাভাই নৌরজী ৫৪, ১৩২
'দাদার কথা' ১৫৮

দিদি ৭০
দীনবন্ধু মিত্র ৬, ২১০
'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী' ১৮৪
দীনেন্দ্রকুমার রায় ১১০, ১৮২-৮৪, ১৮৮-৮৯, ২০৮
দুর্গাদাস কর ১৩
দুর্গাদাস লাহিড়ি ১৬৯, ১৭১
দেবকুমার রায়চৌধুরী ২০০
দেবপ্রসাদ সান্যাল ১৮৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২, ১৪৩
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৯০, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮
দেবেন্দ্রবিজয় বসু ১৭০
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ৪২
দ্বারকানাথ প্রামাণিক ২০
দ্বারকানাথ সেন ১, ৪, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৯, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৭ ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৯, ১০৩, ১১২-১৪, ১৩০, ১৩১ ১৩৬, ১৩৮
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩৬, ১০২, ১০৭-১২, ২০০, ২০৫
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৬, ৯১
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৮৫
নবকৃষ্ণ সাহা ২৯
নবীনচন্দ্র সাহা ৮২
নর্মান সাহেব ১১
নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ১৪২-১৪৫, ১৪৭-৪৯
নরেন্দ্রনাথ দেব রায় ৩২
নরেন্দ্রনাথ বসু ৬, ৭, ১০১
নরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৯, ২০২-২০৪
নলিনীভূষণ গুহ ১৮৯
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১৬৬
নীরদবাবু ১৯৭
নীললোহিত মুখোপাধ্যায় ৩৬, ১০৭
পঞ্চানন তর্করত্ন ১৭০
পঞ্চানন ব্রহ্মচারী ৫৭, ৫৮, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৯
পদ্মচন্দ্র নাথ ১৫৭
পাগলা কানাই ৬৫
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬২, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮২
পাঁচুবাবু ১৯৫
পিসিমা ৩০, ৩৪, ৩৭
পুলিনচন্দ্র সিংহ ১০, ১৪, ২৭, ২৮, ৭৯
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ১৮০, ১৮২
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পটোলবাবু) ১৭৬, ১৭৭
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৯
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮
প্রথমা স্ত্রী ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ১৪১

প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৬৩, ৬৭, ৭২, ৮৮, ৯০-৯৩
'প্রবাস চিত্র. ১৬১, ১৬২
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ২০০-২০২
প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭, ৮৩, ৮৭
প্রসন্নকুমার সান্যাল ৩৫
বঙ্কিম চন্দ্র ২১৫
'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী' ১৮৫
বঙ্কুবিহারী ব্রহ্ম ৪, ৭, ১৪, ১৫, ২৯,
'বঙ্গদর্শন' ২০৭
'বঙ্গবাসী' ১৬২, ১৬৭ ৭৬
বত্তিনাথ ২
'বর্ণ পরিচয়' ১৯, ২২
'বর্ধমেনে মশায়' ২০, ২১
বরদাবাবু ১৭৭
'বসুমতী' ১৭৫, ১৭৬
বাড়ীওয়ালী ১০৫-৮
বানবারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৯১
'বান্ধব' ২০৭
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১২, ৯৪
'বিজয় বসন্ত' ১২৩
বিমলাচরণ সোম ১৪৬
বিশে ডাকাত ২
'বিষাদ সিন্ধু' ৯৬
বিষ্ণু চক্রবর্তী ১২
বিহারীলাল সরকার ১৬৯, ১৭৪
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯২
বেঙ্গলী ১৯৬,
বেরিনি ( ডাঃ ) ১৩
বৌদিদি ৩৫, ৩৭, ৪৫, ৪৭, ৫৮, ৬১, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০
ব্যোমকেশ মুস্তাফি ১৮০
ব্রজনাথ প্রামাণিক ২০
ব্রজনাথ মৈত্রেয় ৩৫, ৩৬
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫, ৮৩
ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ৪৪
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৭
'ভারতবর্ষ' ১১১
'ভারতী' ৬১, ২০৭, ২০৯-১০
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১০, ১২২ ২৮
মণীন্দ্রবাবু ১৯৫
মথুরানাথ কুণ্ডু ২৭, ২৮, ২৭
মথুরানাথ মৈত্রেয় ১৭০
মদনমোহন মালবীয় ৫৮, ১৩৪
মদনমোহন সরকার ৪৪
মধুসূদন আঁচার্য ৫
'মনোমোহন গীতাবলী' ১৩০
মনোমোহন চক্রবর্তী ৫৭, ১৩৫
মনোমোহন বসু ১৬০
মনোরঞ্জন সেন ১৯৫, ১৯৭
মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ২০০-২০২
মহেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৩
মা ৩৭, ৪৭
মাইকেল গ্রন্থাবলী ১৮৪
মাণিকচাঁদ ৪৯

মীর মশাররফ হোসেন ১৬-১৮
মুক্তাসুন্দরী দাদী ৪
মেজ জ্যাঠামশাই ১ ৯
মেজদাদা ১, ১৫, ২৭, ৪৩
মোহিনীমোহন চক্রবর্তী ৩১-৩৪
ম্যাকনামারা ( ডাঃ ) ১৩

যতীন্দ্রকুমার সেন ১
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫৪, ১৩২, ১৯৪
যতীশচন্দ্র সমাজপতি ১৬১
যদুনাথ রায় ১১০
যাদবচন্দ্র সরকার ৫৯, ৬০, ১৩৭, ১৩৮
যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৬২, ১৬৩, ১৬৭-৭২, ১৭৫-৭৮
যোগেন্দ্রবাবু ১৯৫

—

রঘুনন্দন মিত্র ৪৭-৪৯, ৬১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৬, ২০০, ২০৯
রমণীমোহন রায়চৌধুরী ৮২

রাজকুমার বাবু ২১
রাজীবলোচন মজুমদার ৮২
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২০১-২০২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৫৪, ১৩২
রাধাগোবিন্দ মজুমদার ৮১
রাধাবল্লভ দে ৩৬
রাধামাধব গোস্বামী ১৮৮
রাধিকাপ্রসাদ সান্যাল ১১১, ১১৭
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৪০
রামতনু সেন দ্রঃ জ্যাঠামশাই
রামমোহন প্রামাণিক ২, ৩, ২০
রামলাল বসু ৪০
রাসবিহারী ঘোষ ১৫৮, ১৫৯, ১৯৬
রাসবিহারী ব্রহ্ম ৪, ৭
লালন ফকির ১৪
লালমাধব মুখোপাধ্যায় ১২, ১৩
লোকনাথ বিশ্বাস ৪৪
শশধর তর্কচূড়ামণি ১৫৫, ১৭০
শশধর সেন ৪, ৭, ১৫, ৩০, ৪৩-৪৫, ৫২, ৫৩, ১৩০, ১৬৬, ১৮৪, ১৮৭ ১৮৮
শশিভূষণ সোম ১৪৬, ১৪৮
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ৪৯, ১৪৯ ৫৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ৪২
'শিশুবোধক' ২১
শ্যাম মল্লিক ১২
শ্রীনাথ চক্রবর্তী ৩৬
সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০, ১৯৪-৯৫
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭৯, ১৮৩, ১৮৬
সত্যপ্রসন্ন ৬৩
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৯
সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২০৩-২০৪
'সধবার একাদশী' ৬
সরলাদেবী [ ভারতী-সম্পাদিকা ] ২০৮-৯
'সন্ধ্যা' ১৯০, ১৯২-৯৪
'সাহিত্য' ১৬১

'সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা' ৭৫

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ১৬১, ১৬৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩, ১৩৩, ১৯৬, ২০০
সুরেশচন্দ্র ঘোষ ১৫৮
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১০০, ১০১, ১৬১-৬, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৫, ১৮০ ১৮৯
সুলভ সমাচার ২০২-২০৫
সুসার সুন্দরী ৫, ৭, ৮
সূর্যকুমার অধিকারী ১১৫
সূর্যকুমার গুহরায় ৩১
'সোমপ্রকাশ' ৭৫

স্বর্ণকুমারী দেবী ২০৯
স্বর্ণময়ী (মহারানী) ৭৭
'স্বর্ণলতা' ১০৩

'স্পেকটেটর' ১২৭ ২৮

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৭০
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ৩৪, ১৬৪, ২০৫
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৬৮, ১৬৯, ১৭৪
হরিমোহন সরকার ১৬
হরিমোহন সেন ৯
হলধর সেন ১, ২, ৪, ৮
হার্ডিঞ্জ (লর্ড) ২৫, ২৬
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ১৬৯ ১৭১, ১৭২
'হিতবাদী' ১৭৬, ৯৫-২০১
'হিমালয়' ২০৯-১০
হিরন্ময়ী দেবী ২০৯

হৃদয়নাথ সাহা ১১৭-১২০
হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় ১৪৩

হেকিম সাহেব ১৭-১৯
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৬২, ১৬৭-৬৮, ১৮৯
হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ৩৯, ৬৮, ১১২, ১১৪, ১১৫
হেস্টি সাহেব ৪৩, ১২১